সত্যজিৎ রায়

এক ডজন গপ্পো

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক ঃ শ্রীঅরূপকুমার সরকার
আনন্দ প্রিন্টার্স
৪৯ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ শ্রীসত্যজিৎ রায়

প্রথম সংস্করণ ঃ ২৫ বৈশাখ ১৩৭৭

মূল্য ঃ ৬·০০

এক উজন
গপ্পো

সেপ্টোপাসের খিদে

কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে আপনা থেকেই মুখ থেকে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল।

বিকেল থেকে এই নিয়ে চারবার হল; মানুষে কাজ করে কী করে? কার্তিকটাও সেই যে বাজারে গেছে আর ফেরার নামটি নেই।

লেখাটা বন্ধ করে নিজেকেই উঠে যেতে হল।

দরজা খুলে আমি তো অবাক। আরে, এ যে কান্তিবাবু!

বললাম, 'কী আশ্চর্য! আসুন, আসুন...'

'চিনতে পেরেছ?'

'প্রায় চেনা যায় না বললেই চলে।'

ভদ্রলোককে ভেতরের ঘরে এনে বসালাম। সত্যি, দশ বছরে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন হয়েছে কান্তিবাবুর চেহারায়। এঁকেই নাইনটিন ফিফ্‌টিতে আসামের জঙ্গলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখেছি। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তখনই। কিন্তু একটি চুলও পাকেনি। আর ওই বয়সে উৎসাহ ও এনার্জির যা নমুনা দেখেছিলাম, তা সচরাচর আমাদের তরুণদের মধ্যেও দেখা যায় না।

'তোমার অর্কিডের শখ এখনো আছে দেখছি।'

আমার ঘরের জানালায় একটা টবের মধ্যে কান্তিবাবুরই দেওয়া একটা অর্কিড ছিল। শখ এখনো আছে বললে অবিশ্যি ভুল বলা হবে। কান্তিবাবুই গাছপালা সম্পর্কে একটা কৌতূহল আমার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তারপর উনি দেশছাড়া হবার পর থেকে ক্রমে সে-শখটা আপনা থেকেই উবে গেছে— যেমন অন্য শখগুলোও গেছে। এখন লেখা নিয়েই থাকি। ইদানীং দিনকাল বদলেছে। বই লিখেও আজকাল রোজগার হয়। তিনটি বইয়ের বিক্রির টাকাতেই তো প্রায় সংসার চলে যাচ্ছে আমার! অবিশ্যি সংসার বলতে আমি, আমার বিধবা মা, আর চাকর কার্তিক। চাকরি একটা আছে বটে, তবে আশা আছে বই থেকে তেমন-তেমন রোজগার হলে চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে কেবল লিখব, আর লেখার অবসরে দেশভ্রমণ করব।

কান্তিবাবু বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ শিউরে উঠলেন।

বললাম, 'ঠান্ডা লাগছে? জানালাটা বন্ধ করে দেব? এবার কলকাতায় শীতটা...'

'না, না। ওরকম আজকাল মাঝে মাঝে হয়। বয়স হয়েছে তো? তাই নার্ভস্‌গুলো ঠিক...'

অনেক প্রশ্ন মাথায় আসছিল। কার্তিক ফিরেছে। ওকে চা আনতে বললাম।

কান্তিবাবু বললেন, 'বেশিক্ষণ বসব না। তোমার উপন্যাস হাতে এসেছিল একখানা। তোমার প্রকাশকের কাছে থেকেই ঠিকানা সংগ্রহ করে এখানে এলুম। এসেছি একটা বিশেষ দরকারে।'

'বলুন-না। তবে তার আগে—মানে, কবে দেশে ফিরলেন, কোথায় ছিলেন, কোথায় আছেন, এসবগুলো জানতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'ফিরেছি দু' বছর। ছিলুম আমেরিকায়। আছি বারাসাতে।'

'বারাসাত?'

'একটি বাড়ি কিনেছি।'

'বাগান আছে?'

'আছে।'

'আর গ্রীন-হাউস?'

কান্তিবাবুর আগের বাড়ির বাগানে একটি চমৎকার গ্রীন-হাউস বা কাঁচের ঘর ছিল যাতে তিনি তাঁর দুষ্প্রাপ্য গাছপালাগুলিকে তোয়াজে রাখতেন। কতরকম অদ্ভুত গাছ যে দেখেছি সেখানে তার ঠিক নেই। এক অর্কিডই তো প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি রকমের। তার ফুলের বৈচিত্র্য উপভোগ করেই একটা পুরো দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যেত।

কান্তিবাবু একটু ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ। একটা গ্রীন-হাউসও আছে।'

'আপনার গাছপালার শখ তাহলে এই দশ বছরে কিছু কমেনি?'

'না।'

কান্তিবাবু আমার ঘরের উত্তরের দেয়ালের দিকে চেয়ে রয়েছেন দেখে আমারও চোখ সেইদিকে গেল। মাথাসমেত একটি রয়াল বেঙ্গলের ছাল সেখানে ঝোলানো রয়েছে। বললাম, 'চিনতে পারছেন?'

'এটা সেই বাঘটাই তো?'

'হ্যাঁ। ওই দেখুন কানের পাশটায় বুলেটের ফুটোটাও রয়েছে।'

'আশ্চর্য টিপ ছিল তোমার। এখনো চালাতে পার ওরকম অব্যর্থ গুলি?'

'জানি না। অনেকদিন পরীক্ষা করিনি। শিকার ছেড়েছি প্রায় পাঁচ-সাত বছর।'

'কেন?'

'অনেক তো মারলাম। বয়স হয়েছে, তাই আর প্রাণিহত্যা...'

'মাছ-মাংস ছেড়েছ নাকি? নিরামিষ খাচ্ছ?'

'না।'

'তবে? এ তো শুধু হত্যা। বাঘ মারলে, কি কুমির মারলে, কি মোষ মারলে—ছাল ছাড়িয়ে মাথা স্টাফ্ করে, কি শিং মাউন্ট করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলে। ঘরের শোভা বাড়ল, লোকে এসে কেউ আঁতকে উঠল, কেউ বাহাবা দিল, তোমারও জোয়ান বয়সের অ্যাডভেঞ্চারের কথা মনে পড়ে গেল। আর মুরগী ছাগল ইলিশ মাগুর যে নিজে চিবিয়ে খেয়ে ফেলছ হে! শুধু প্রাণী হত্যা নয়, প্রাণী হজম—অ্যাঁ?'

কী আর বলি! অস্বীকার করতে পারলাম না।

কার্তিক চা দিয়ে গেল।

কান্তিবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে হঠাৎ আবার শিউরে উঠে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলেন।

চুমুক দিয়ে বললেন, 'জীবে জীবে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক সে তো সৃষ্টির গোড়ার কথা হে। ওই যে টিকটিকিটা ওত পেতে রয়েছে দেখেছ?'

দেখলাম কিং কোম্পানির ক্যালেন্ডারটার ঠিক উপরেই একটা টিকটিকি তার থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে একটা উচ্চিংড়ের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। তারপর দেখতে দেখতে গুটিগুটি করে অতীব সন্তর্পণে পোকাটার দিকে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ তীরের মত এক ছোবলে সেটাকে মুখে পুরে নিল।

কান্তিবাবু বললেন, 'ব্যস্। চলল ডিনার। খালি খাওয়া আর খাওয়া। খাওয়াটাই সব। বাঘে মানুষ খাচ্ছে, মানুষ ছাগল খাচ্ছে, আর ছাগল কী না খাচ্ছে! ভবতে গেলে কী বন্য, কী আদিম, কী হিংস্র মনে হয় বলো তো! অথচ এই হল নিয়ম। এ ছাড়া গতি নেই। এ না হলে সৃষ্টি অচল হয়ে যাবে।'

'নিরামিষ খাওয়াটা বোধহয় এর চেয়ে অনেক...ইয়ে?'

'কে বললে তোমায়? শাক-সবজি তরি-তরকারি এসবের কি প্রাণ নেই?'

'তা তো আছেই! জগদীশ বোস আর আপনার দৌলতে সে কথা সব সময়ই মনে থাকে। তবে, মানে ঠিক সেরকম প্রাণ নয় তো! গাছপালা আর জীবজন্তু কি এক?'

'তোমার মতে কি দুয়ে অনেক প্রভেদ?'

'প্রভেদ নয়? যেমন ধরুন—গাছ হেঁটে বেড়াতে পারে না, শব্দ করতে পারে না, মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না—এমনকি, মন বলে যে কিছু আছে তাই তো বোধহয় বোঝবার কোন উপায় নেই। তাই নয় কি?'

কান্তিবাবু কী জানি বলতে গিয়েও বললেন না।

চা-টা শেষ করে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থেকে অবশেষে আমার দিকে চোখ তুলে চাইলেন। তাঁর চোখের করুণ সংশয়াকুল দৃষ্টি দেখে আমার মনটা

হঠাৎ কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল। সত্যি, ভদ্রলোকের চেহারায় কী আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে!

কান্তিবাবু ধীরকণ্ঠে বললেন, 'পরিমল, আমার বাড়ি এখান থেকে একুশ মাইল। আটান্ন বছর বয়সে নিজে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করে যখন এখানে এসেছি, তখন নিশ্চয়ই তার একটা গূঢ় কারণ আছে। এটা বুঝতে পারছ তো? নাকি ওইসব আজেবাজে রঙচড়ানো গল্প-গুলো লিখে সে বুদ্ধিটাও হারিয়েছ? ভাবছ—লোকটা একটা টাইপ বটে! একটা গল্পে লাগাতে পারলে বেশ হয়!'

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কান্তিবাবু ভুল বলেননি। তাঁকে একটা গল্পের চরিত্র হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা মনের আনাচে-কানাচে সত্যিই ঘোরাফেরা করছিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'জীবনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হলে যা-ই লেখ না কেন, সব ফাঁকা আর ফাঁকি হয়ে যাবে। আর এটাও মনে রেখো যে তুমি কল্পনায় যতই রং চড়াও না কেন, বাস্তবের চেয়ে কখনই তা বেশি বিস্ময়কর হতে পারবে না।...যাক গে, আমি তোমায় উপদেশ দিতে আসিনি। আমি এসেছি, সত্যি বলতে কি, তোমার সাহায্য ভিক্ষে করতে।'

কান্তিবাবু আবার বাঘটার দিকে চাইলেন। কী সাহায্যের কথা বলছেন ভদ্রলোক?

'তোমার বন্দুকটা আছে, না বিদেয় করে দিয়েছ?'

আমি একটু চমকে গিয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। বন্দুকের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

বললাম, 'আছে। তবে মরচে ধরেছে বোধহয়। কিন্তু কেন?'

'কাল ওটা নিয়ে আমার বাড়িতে একবার আসতে পারবে?'

আমি আবার ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। না, রসিকতার কোন ইঙ্গিত নেই তাঁর দৃষ্টিতে।

'অবিশ্যি কেবল বন্দুক না। টোটাও লাগবে।'

কান্তিবাবুর এ অনুরোধে কী বলব চট করে ভেবে পেলাম না। একবার মনে হল, কথা শুনে হয়তো বুঝতে পারছি না, কিন্তু আসলে হয়তো ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। খামখেয়ালী, সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। নইলে আর জীবন বিপন্ন করে উদ্ভট গাছপালার উদ্দেশে কেউ বনবাদাড়ে ধাওয়া করে?

বললাম, 'বন্দুক নিয়ে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে কারণটা জানার জন্যে বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে। আপনাদের ও অঞ্চলে জন্তু-জানোয়ার কি চোর-ডাকাতের উপদ্রব হচ্ছে নাকি?'

কান্তিবাবু বললেন, 'সেসব তুমি এলে পরে বলব। বন্দুকের প্রয়োজন শেষ পর্যন্ত না-ও হতে পারে। আর যদি-বা হয়ও, এটুকু বলে রাখছি যে তোমায় কোন দণ্ডনীয় অপরাধের দায়ে পড়তে হবে না।'

কান্তিবাবু উঠে পড়লেন। তারপর আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমার কাছেই এসেছি, কারণ শেষ যা দেখেছি তোমায় তাতে মনে হয়েছিল যে আমার মত তোমারও নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। তাছাড়া আমার লোকসমাজে যাতায়াত আগেও কম ছিল, এখন প্রায় নেই বললেই চলে; এবং চেনা-পরিচিতের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে ক'জন আছে, তোমার বিশেষ গুণগুলি তাদের কারোর মধ্যেই নেই।

অতীতে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে যে বিশেষ উত্তেজনাটা শিরায় শিরায় অনুভব করতাম, আজ এই মুহূর্তে আবার যেন তার কিছুটা অনুভব করলাম।

বললাম, 'কোথায় কখন কীভাবে যাব যদি বলে দেন...'

'সে বলে দিচ্ছি। যশোর রোড দিয়ে সোজা গিয়ে বারাসাত স্টেশনে পেঁছে ওখানকার যে-কোন লোককে মধুমুরলীর দীঘির কথা জিগ্যেস করবে। সেটা স্টেশন থেকে মাইল চারেক। সেই দীঘির পাশে একটা পুরনো ভাঙা নীলকুঠি আছে। তার পাশেই আমার বাড়ি। তোমার গাড়ি আছে তো?'

'না। তবে আমার এক বন্ধুর আছে।'

'কে বন্ধু?'

'অভিজিৎ। কলেজে সহপাঠী ছিল।'

'কেমন লোক সে? আমি চিনি?'

'চেনেন না বোধহয়। তবে লোক ভালো। মানে, আপনি যদি বিশ্বস্ততার কথা বলেন, তবে হি ইজ অল রাইট।'

'বেশ তো। তাকে নিয়েই যেও। তবে যেও নিশ্চয়ই। ব্যাপারটা জরুরী সেটা বলা বাহুল্য। বিকেলের মধ্যেই পেঁছে যেতে চেষ্টা করো।'

আমার বাড়িতে টেলিফোন নেই। রাস্তার মোড়ে রিপাবলিক কেমিস্ট থেকে অভিজিতের বাড়িতে ফোন করলাম। বললাম, 'চলে আয় এক্ষুনি। জরুরী কথা আছে।'

'তোর নতুন গল্প পড়ে শোনাবি তো? আবার ঘুমিয়ে পড়ব কিন্তু!'

'আরে না না। অন্য ব্যাপার।'

'কী ব্যাপার? অত আস্তে কথা বলছিস কেন?'

'একটা ভালো ম্যাস্টিফের বাচ্চার সন্ধান আছে। লোক বসে আছে আমার বাড়িতে।'

কুকুরের টোপ না ফেললে আজকাল অভিজিৎকে তার বাড়ি থেকে বের করা খুব শক্ত। পাঁচটি মহাদেশের এগারো জাতের কুকুর আছে অভিজিতের কেনেলে। তার মধ্যে তিনটি প্রাইজ-প্রাপ্ত। পাঁচ বছর আগেও এরকম ছিল না। ইদানীং কুকুরই তার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা।

কুকুরপ্রীতির বাইরে অভিজিতের গুণ হল—আমার বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস। আমার প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকদের মনঃপূত না হওয়ায় শেষটায় অভিজিতের অর্থানুকূল্যে ছাপা হয়। সে বলেছিল, 'আমি কিস্যু বুঝি না। তবে তুই যখন লিখেছিস, তখন একেবারে রাবিশ হতেই পারে না। পাবলিশারগুলো গবেট।' যাই হোক, সে বই পরে ভালোই কেটেছিল; এবং নামটাও কিনেছিল। ফলে আমার প্রতি অভিজিতের আস্থার ভিত আরো দৃঢ় হয়েছিল।

ম্যাস্টিফের বাচ্চার ব্যাপারটা নিছক মিথ্যে হওয়ার দরুন একটা বড় রকম অভিমার্কা রদ্দা আমার পাওনা হল, এবং পেলামও। কিন্তু আসল প্রস্তাবটি সাদরে গৃহীত হওয়ায় রদ্দার চনচনি ভুলে গেলাম।

অভি সোৎসাহে বললে, 'অনেকদিন আউটিং-এ যাইনি। শেষ সেই সোনারপুরের ঝিলে স্নাইপ-সুটিং। কিন্তু লোকটি কে? ব্যাপারটা কী? একটু খুলে বল্ না বাছাধন!'

'খুলে সে নিজেই যখন বললে না, তখন আমি কী করে বলি? একটু রহস্য না-হয় রইলই। জমবে ভালো। কল্পনাশক্তিকে একসারসাইজ করানোর এই তো সুযোগ।'

'আহা, লোকটি কে তাই বল্ না।'

'কান্তিচরণ চ্যাটার্জি। বুঝলে কিছু? এককালে কিছুদিন বটানির প্রোফেসর ছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। প্রোফেসারি ছেড়ে দুষ্প্রাপ্য গাছপালার সন্ধানে ঘুরতেন, সে বিষয়ে রিসার্চ করতেন, প্রবন্ধ লিখতেন। ভালো কালেকশন ছিল গাছপালার—বিশেষত অর্কিডের।'

'তোর সঙ্গে আলাপ কীভাবে?'

'আসামে কাজিরাঙা ফরেস্ট বাংলোতে। আমি বাঘ মারার তাল করছি, আর উনি খুঁজছেন নেপেন্‌থিস্।'

'কী খুঁজছেন?'

'নেপেন্‌থিস্। বটানিক্যাল নাম। সোজা কথায় "পিচার প্লাণ্ট" বা কলসীগাছ। আসামের জঙ্গলে পাওয়া যায়। পোকা ধরে ধরে খায়। আমি নিজে অবিশ্যি দেখিনি। কান্তিবাবুর মুখেই যা শোনা।'

'কীটখোর? পোকা খায়? গাছ পোকা খায়?'

'তোর বটানি ছিল না বোধ হয়?'

'না।'

'বইয়ে ছবি দেখেছি। অবিশ্বাস করার কিছু নেই।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? ভদ্রলোক সে গাছ পেয়েছিলেন কিনা জানি না, কারণ শিকার শেষ করে আমি চলে আসি, উনি থেকে যান। আমার তো ভয় ছিল কোন জন্তু-জানোয়ার কি সাপখোপের হাতে ওঁর প্রাণ যাবে বলে। গাছের নেশায় দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। কলকাতায় ফিরে এসে দু-একবারের বেশি দেখা হয়নি, তবে ওঁর কথা মনে হত প্রায়ই, কারণ সাময়িকভাবে অর্কিডের নেশা আমাকেও ধরেছিল। বলেছিলেন, আমেরিকা থেকে কিছু ভালো অর্কিড আমায় এনে দেবেন।'

'আমেরিকা? ভদ্রলোক আমেরিকা গেছেন নাকি?'

'বিলিতি কোন্‌-এক বটানির জার্নালে উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটা লেখা বেরোনোর পর ওঁর বেশ খ্যাতি হয় ওদেশে। কোন্‌-এক উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কনফারেন্সে ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিল আমেরিকায়। সেও প্রায় ফিফটি-ওয়ান না টু-তে। তারপর এই দেখা।'

'এতদিন কী করেছেন ওখানে?'

'জানি না। তবে কাল জানা যাবে বলে আশা করছি।'

'লোকটার মাথায় ছিট-টিট নেই তো?'

'তোর চেয়ে বেশি নেই এটুকু বলতে পারি। তোর কুকুর পোষা আর ওঁর গাছ পোষা...'

অভিজিতের স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে করে আমরা যশোর রোড দিয়ে বারাসাত অভিমুখে চলেছি।

আমরা বলতে আমি আর অভিজিৎ ছাড়া আরো একটি প্রাণী সঙ্গে রয়েছে, সে হল অভিজিতের কুকুর 'বাদশা'। আমারই ভুল; অভিজিৎকে না বলে দিলে সে যে সঙ্গে করে তার এগারোটি কুকুরের একটিকে নিয়ে আসবেই, এটা আমার বোঝা উচিত ছিল।

বাদশা জাতে রামপুর হাউন্ড। বাদামী রং, বেজায় তেজীয়ান। গাড়ির পুরো পিছনদিকটা একাই দখল করে জাঁকিয়ে বসে জানালা দিয়ে মুখটি বার করে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতের দৃশ্য উপভোগ করছে এবং মাঝে মাঝে এক-একটা গ্রাম্য নেড়ি কুকুরের সাক্ষাৎ পেয়ে মুখ দিয়ে একটা অবজ্ঞাসূচক মৃদু

শব্দ করছে।

বাদশাকে অভিজিতের সঙ্গে দেখে একটা আপত্তির ইঙ্গিত দেওয়ায় অভি বলল, 'তোর বরকন্দাজির উপর আর ভরসা নেই, তাই ওকে আনলাম। এতদিন বন্দুক ধরিসনি। বিপদ যদি আসেই তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো বাদশাই কাজ করবে বেশি। ওর ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ, আর সাহসের তো কথাই নেই।'

কান্তিবাবুর বাড়ি খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হল না। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় আড়াইটে। গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে খানিকটা রাস্তা গিয়ে একতলা বাংলো-ধাঁচের বাড়ি। বাড়ির পিছনদিকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে একটা প্রকান্ড পুরনো শিরীষ গাছ এবং তার পাশেই বেশ বড় একটা কারখানা-গোছের টিনের ছাতওয়ালা ঘর। বাড়ির মুখোমুখি রাস্তার উলটোদিকে বাগান এবং বাগানের পরে একটা লম্বা টিনের ছাউনি দেওয়া জায়গায় চকচক করছে একস্যারি কাঁচের বাক্স।

কান্তিবাবু আমাদের অভ্যর্থনা করে বাদশাকে দেখে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বললেন, 'এ কি শিক্ষিত কুকুর?'

অভি বলল, 'আমার খুব বাধ্য। তবে কাছাকাছি অন্য অশিক্ষিত কুকুর থাকলে কী করবে বলা যায় না। আপনার এখানে কোন কুকুর-টুকুর...?'

'না। কুকুর নেই। তবে ওটাকে আপাতত বসবার ঘরের ওই জানালার গরাদটায় বেঁধে রাখুন।'

অভিজিৎ আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে চোখ টিপে বাধ্য ছেলের মত কুকুরটাকে জানালার সঙ্গে বেঁধে দিল। বাদশা দু-একটা মৃদু আপত্তি জানিয়ে আর কিছু বলল না।

আমরা সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসার পর কান্তিবাবু বললেন, 'আমার চাকর প্রয়াগের ডান হাত জখম, তাই আমি নিজেই সকাল সকাল তোমাদের জন্যে ফ্লাস্কে চা করে রেখেছি। যখন দরকার হয় বলো।'

এই শান্ত নিরিবিলি জায়গায় কী বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা আমার মাথায় আসছিল না। দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর তো কোন শব্দই নেই। বন্দুকটা হাতে নিয়ে কেমন বোকা-বোকা লাগছিল নিজেকে, তাই সেটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে দিলাম।

অভি ছটফটে মানুষ—নেহাতই শহুরে। গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা, অশথপাতায় হাওয়ার ঝিরঝির শব্দ, নাম-না-জানা পাখির ডাক—এসব তার মোটেই ধাতে সয় না। সে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে উসখুস করে বলে উঠল, 'পরিমলের কাছে শুনছিলাম আপনি নাকি আসামের জঙ্গলে কী এক বিদঘুটে গাছ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায় বাঘের খপ্পরে পড়েছিলেন?'

অভির অভ্যাসই হল রং চড়িয়ে নাটকীয়ভাবে কথা বলা। ভয় হল কান্তি-

বাবু বুঝি ফস করে রেগে ওঠেন। কিন্তু ভদ্রলোক কেবল হেসে বললেন, 'বিপদ বলতেই আপনাদের বাঘের কথা মনে হয়, না? সেটা অবিশ্যি আশ্চর্য নয়। অধিকাংশেরই তাই। তবে—না। বাঘের কবলে পড়িনি। জোঁকের হাতে কিছুটা নাকাল হতে হয়েছিল বটে, তাও তেমন কিছু নয়।'

'সে গাছ পেয়েছিলেন?'

এ প্রশ্নটা আমারও মাথায় ঘুরছিল।

কান্তিবাবু বললেন, 'কোন্ গাছ?'

'সেই যে হাঁড়ি না কলসী না কী গাছ জানি...'

'ও। নেপেন্থিস্। হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। এখনও আছে। দেখাচ্ছি আপনাদের। এখন আর অন্য কোন গাছে তেমন ইন্টারেস্ট নেই। কেবল কার্নিভোরাস্ প্লাণ্টস। অর্কিডগুলোও অধিকাংশই বিদেয় করে দিয়েছি।'

কান্তিবাবু উঠে ঘরের ভিতর চলে গেলেন। আমি আর অভি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কার্নিভোরাস প্লাণ্টস—অর্থাৎ মাংসাশী গাছ। পনেরো বচ্ছর আগে পড়া বটানির বইয়ের একটি পাতা ও কয়েকটি ছবি আবছাভাবে মনে পড়ে গেল।

কান্তিবাবু বেরোলেন হাতে একটি বোতল নিয়ে।

বোতলটা আমাদের সামনে ধরতে দেখলাম তাতে উচ্চিংড়ে জাতীয় নানান সাইজের সব পোকা ঘোরাফেরা করছে। বোতলের ঢাকনায় গোলমরিচদানের ঢাকনার মত ছোট ছোট ফুটো।

কান্তিবাবু হেসে বললেন, 'ফীডিং টাইম। এসো আমার সঙ্গে।'

আমরা কান্তিবাবুর পিছন পিছন টিনের ছাউনি দেওয়া লম্বা ঘরটার দিকে গেলাম।

গিয়ে দেখি সারবাঁধা কাঁচের বাক্সগুলোর মধ্যে এক-একটায় এক-একরকম গাছ; তার কোনটাই এর আগে চোখে দেখিনি।

কান্তিবাবু বললেন, 'এর কোনোটাই বাংলা দেশে পাবে না—অবিশ্যি ওই নেপেন্থিস্ ছাড়া। একটা আছে নেপাল থেকে আনানো। একটা আফ্রিকার। অন্য সব-কটাই প্রায় মধ্য আমেরিকার।'

অভিজিৎ বলল, 'এ-সব গাছ এখানে বেঁচে রয়েছে কী করে? এখানকার মাটিতে কি—?'

'মাটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এদের।'

'তবে?'

'এরা মাটি থেকে প্রাণ সঞ্চয় করে না। মানুষ যেমন ঠিকমত খাদ্য পেলে

নিজের দেশের বাইরে অনেক জায়গাতেই স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে—এরাও তেমনি ঠিকমত খেতে পেলেই বেঁচে থাকে, সে যেখানেই হোক।'

কান্তিবাবু একটা কাঁচের বাক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভিতরে এক আশ্চর্য গাছ। ইঞ্চিদুই লম্বা সবুজ পাতাগুলোর দুপাশে সাদা সাদা দাঁতের মত খাঁজ কাটা।

বাক্সটার সামনের দিকের কাঁচের গায়ে একটা ছিটকিনি-দেওয়া বোতলের মুখের সাইজের গোল দরজা। কান্তিবাবু দরজাটা খুললেন। তারপর বোতলের ঢাকনিটা খুলে ক্ষিপ্র হস্তে বোতলের মুখটা দরজার ভিতরে গলিয়ে দিলেন।

একটা উচ্চিংড়ে বোতল থেকে বেরোতেই কান্তিবাবু বোতলটাকে বাইরে এনে চট করে ঢাকনিটা লাগিয়ে দিয়ে বাক্সের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

উচ্চিংড়েটা এদিক-ওদিক লাফিয়ে গাছটার পাতার উপর বসল, এবং বসতেই তৎক্ষণাৎ পাতাটা মাঝখান থেকে ভাঁজ হয়ে গিয়ে পোকাটাকে জাপটে ধরল। অবাক হয়ে দেখলাম যে দুদিকের দাঁত পরস্পরের খাঁজে খাঁজে বসে যাওয়ায় এমন একটি খাঁচার সৃষ্টি হয়েছে যার থেকে উচ্চিংড়ে বাবাজীর আর বেরোবার কোন রাস্তাই নেই।

প্রকৃতির এমন তাজ্জব, এমন বীভৎস ফাঁদ আমি আর কখনো দেখিনি।

অভি ধরা গলায় জিগ্যেস করল, 'পোকাটা যে ওই পাতাটাতেই বসবে তার কোন গ্যারাণ্টি আছে কি?'

কান্তিবাবু বলেন, 'আছে বই কি। গাছগুলো থেকে এমন একটা গন্ধ বেরোয় যেটা পোকা অ্যাট্রাক্ট করে। এটা হল Venu's Fly Trap । মধ্য আমেরিকা থেকে আনা। বটানির বইয়েতে এর কথা পাবে।'

আমি অবাক বিস্ময়ে উচ্চিংড়েটার দশা দেখছিলাম। প্রথমে কিছুক্ষণ ছটফট করেছিল। এখন দেখলাম একেবারে নির্জীব। আর দেখলাম যে পাতার চাপ ক্রমশই বাড়ছে। টিকটিকির চেয়ে এ গাছ কম হিংস্র কিসে?

অভি কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'এঃ—এমন গাছ একটা বাড়িতে থাকলে তো পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যেত। আরসুলার জন্যে আর ডি-ডি-টি পাউডার ছড়াতে হত না।'

কান্তিবাবু বললেন, 'এ গাছ আরসুলা হজম করতে পারবে না। তাছাড়া এর পাতার আয়তনও ছোট। আরসুলার জন্যে অন্য গাছ। এই যে—এদিকে।'

পাশের বাক্সের সামনে গিয়ে দেখি লিলির মত বড় বড় লম্বা পাতাওয়ালা একটা গাছ। প্রত্যেকটা পাতার ডগা থেকে একটি করে ঢাকনা সমেত থলির মত জিনিস ঝুলছে। এটার ছবি মনে ছিল, তাই আর চিনিয়ে দিতে হল না।

কান্তিবাবু বললেন, 'এই হল নেপেনথিস্ বা পিচার প্লাণ্ট। এর খাঁই অনেক বেশি। প্রথম যখন গাছটি পাই তখন ওই একটি থলির মধ্যে একটা ছোট্ট

পাখিকে ছিবড়ে অবস্থায় পেয়েছিলাম।'

'বাপরে বাপ'! অভির তাচ্ছিল্যের ভাব ক্রমশই অন্তর্হিত হচ্ছিল। 'এখন ওটা কী খায়?'

'আরসুলা, প্রজাপতি, শুঁয়োপোকা—এইসব আর কি। মাঝে আমার কলে একটা ইঁদুর ধরা পড়েছিল। সেটাও খাইয়ে দেখেছিলাম, আপত্তি করেনি। তবে গুরুপাকের ফলে এসব গাছ অনেক সময়ে মরে যায়। অত্যন্ত লোভী তো! কোন্ অবধি ভোজন সইবে সেটা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারে না।'

ক্রমবর্ধমান বিস্ময়ে এ-বাক্স থেকে ও-বাক্স ঘুরে গাছগুলো দেখতে লাগলাম। বাটারওয়ার্ট, সানডিউ, ব্ল্যাডারওয়ার্ট, অ্যারজিয়া—এগুলোর ছবি আগে দেখেছি। তাই মোটামুটি চিনতেও পারলাম। কিন্তু অন্যগুলো একেবারে নতুন, একেবারে তাজ্জব, একেবারে অবিশ্বাস্য। প্রায় বিশ রকমের মাংসাশী গাছ কান্তিবাবু সংগ্রহ করেছেন, তার কোন-কোনটা পৃথিবীর অন্য কোন কালেকশনেই নাকি নেই।

এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর গাছ যেটি—সানডিউ—তার ছোট্ট পাতাগুলোর চারপাশে সরু লম্বা লম্বা রোঁয়ার ডগায় জলবিন্দু চকচক করছে।

কান্তিবাবু একটি সুতোর ডগায় এলাচের দানার সাইজের এক-টুকরো মাংস ঝুলিয়ে সুতোটাকে আস্তে আস্তে পাতাটির কাছে নিয়ে যেতে খালি-চোখেই দেখতে পেলাম রোঁয়াগুলো সব একসঙ্গে লুব্ধ ভঙ্গীতে মাংসখণ্ডটার দিকে উঁচিয়ে উঠল।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে কান্তিবাবু বললেন, 'মাংসটা পেলে পাতাটা Fly Trap-এর মতই ওটাকে জাপটে ধরে নিত। তারপর পুষ্টিকর যা-কিছু শুষে নিয়ে অকেজো ছিবড়েটুকু ফেলে দিত। তোমার আমার খাওয়ার সঙ্গে কোন তফাত নেই, কী বল?'

আমরা শেড থেকে বেরিয়ে বাগানে এলাম।

শিরীষ গাছের ছায়াটা লম্বা হয়ে বাগানের উপর পড়েছে। ঘড়িতে দেখলাম চারটে বাজে।

কান্তিবাবু বললেন, 'এর অধিকাংশ গাছের কথাই তোমরা বটানির বইয়ে পাবে। তবে আমার যেটি সবচেয়ে আশ্চর্য সংগ্রহ সেটির কথা এক আমি না লিখলে কোন বইয়ে থাকবে না। সেটার জন্যেই আজ তোমাদের এখানে আসতে বলা। চলো পরিমল। চলুন অভিজিৎবাবু।'

কান্তিবাবুর পিছন পিছন এবার আমরা বড় কারখানা-ঘরটার দিকে এগোলাম।

টিনের দরজাটা তালা দিয়ে বন্ধ। দুদিকে দুটো জানালা রয়েছে। তারই একটা হাত দিয়ে ঠেলে খুলে নিজে উঁকি মেরে দেখে আমাদের বললেন, 'দেখো।'

অভি আর আমি জানালায় মুখ লাগালাম।

ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালের উপর দিকের দুটো কাঁচের জানালা বা স্কাইলাইট দিয়ে রোদ আসায় ভিতরটা কিছুটা আলো হয়েছে।

ঘরের মধ্যে যে জিনিসটা রয়েছে, হঠাৎ দেখলে সেটাকে গাছ বলে মনে হওয়ার কথা নয়। বরং একাধিক শুঁড়বিশিষ্ট কোনো আজব জানোয়ার বলে মনে হতে পারে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে গুঁড়ি একটা আছে। সেটা পাঁচ-ছ হাত উঠে একটা মাথায় শেষ হয়েছে, এবং সেই মাথার হাত খানেক নিচে মাথাটাকে গোল করে ঘিরে কতগুলো শুঁড়ের উৎপত্তি হয়েছে। গুনে দেখি সাতটা শুঁড়।

গাছের গা পাংশুটে মসৃণ, এবং সর্বাঙ্গে ব্রাউন চাকা চাকা দাগ।

শুঁড়গুলো আপাতত মাটিতে নুয়ে পড়ে আছে। কেমন যেন নির্জীব ভাব। কিন্তু তাও গা-টা ছমছম করে উঠল।

অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হলে আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। ঘরের মেঝেতে গাছের চারিদিকে পাখির পালক ছড়িয়ে আছে।

কতক্ষণ চুপ করে ছিলাম জানি না। কান্তিবাবুর গলার স্বরে আবার যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম।

'গাছটা এখন ঘুমোচ্ছে। ওঠবার সময় হল বলে।'

অভি অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'ওটা কি সত্যিই গাছ?'

কান্তিবাবু বললেন, 'মাটি থেকে গজাচ্ছে যখন, তখন গাছ ছাড়া আর কী বলবেন বলুন! হাবভাব অবিশ্যি গাছের মত নয়। অভিধানে এর উপযুক্ত কোন নাম নেই।'

'আপনি কী বলেন?'

'সেপ্টোপাস্। অথবা বাংলায় সপ্তপাশ। পাশ—অর্থাৎ বন্ধন; যেমন নাগপাশ।'

আমরা বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। বললাম, 'এ গাছ পেলেন কোথায়?'

'মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়া হ্রদের কাছেই গভীর জঙ্গল আছে; তার ভেতর।'

'অনেক খুঁজতে হয়েছে বলুন?'

'ওই অঞ্চলেই যে আছে সেটা জানা ছিল। তোমরা বোধহয় প্রোফেসর ডান্স্টান-এর কথা শোননি? উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও পর্যটক ছিলেন। মধ্য আমেরিকায় গাছপালার সন্ধান করতে গিয়ে প্রাণ হারান। ঠিক কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয় কেউ জানতে পারেনি; মৃতদেহ সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়ে যায়। তাঁর তৎকালীন ডায়রির শেষের দিকে এ গাছটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

'আমি তাই প্রথম সুযোগেই নিকারাগুয়ার দিকে চলে যাই। গুয়াটেমেলা থেকেই স্থানীয় লোকের কাছে এ গাছের বর্ণনা শুনতে থাকি। তারা বলে শয়তান গাছ। শেষটায় অবিশ্যি এমন গাছ একাধিক চোখে পড়ে। বাঁদর, আরমাডিলো, অনেক কিছু খেতে দেখেছি এ গাছকে। অনেক খোঁজার পর একটা অল্পবয়স্ক ছোটখাটো চারাগাছ পেয়ে সেটাকে তুলে আনি। দু বছরে গাছের কী সাইজ হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ।'

'এখন কী খায় গাছটা?'

'যা দিই তাই খায়। কলে ইঁদুর ধরে খেতে দিয়েছি। তারপর প্রয়াগকে বলে দিয়েছিলাম—বেড়াল কুকুর চাপা পড়লে ধরে আনতে, তাও দিয়েছি। তারপর তুমি আমি যা খাই তাও দিয়েছি—অর্থাৎ মুরগী, ছাগল। ইদানীং খিদেটা খুব বেড়েছে। খাবার যুগিয়ে উঠতে পারছি না। বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙার পর ভয়ানক ছটফট করে। কাল তো একটা কান্ডই হয়ে গেল। প্রয়াগ গিয়েছিল একটা মুরগী দিতে। হাতিকে যেভাবে খাওয়ায় সেভাবেই খাওয়াতে হয়। প্রথমে গাছটার মাথায় একটা ঢাকনা খুলে যায়। তারপর শুঁড় দিয়ে খাবারটা হাত থেকে নিয়ে মাথার গর্তের মধ্যে পুরে দেয়। একটা যে-কোন খাবার পেটে পুরলে কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তারপর আবার শুঁড়গুলো দোলাতে আরম্ভ করলে বোঝা যায় যে আরো খেতে চাইছে।

'এতদিন দুটো মুরগী অথবা একটা কচি পাঁঠায় একদিনের খাওয়া হয়ে যেত! কাল থেকে তার ব্যতিক্রম হচ্ছে। কাল দ্বিতীয় মুরগীটা দিয়ে প্রয়াগ দরজা বন্ধ করে চলে এসেছিল। অস্থির অবস্থায় শুঁড়গুলো আছড়ালে একটা শব্দ হয়। দ্বিতীয় মুরগীর পরেও হঠাৎ সেই আওয়াজটা পেয়ে প্রয়াগ গিয়েছিল অনুসন্ধান করতে।

'আমি তখন ঘরে বসে ডায়রি লিখছি। হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি সেপ্টোপাস্-এর একটা শুঁড় প্রয়াগের ডান হাতটা আঁকড়ে ধরেছে। প্রয়াগ প্রাণপণে সেটা টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সেপ্টোপাস্-এর আর-একটি শুঁড় লকলক করে প্রয়াগের দিকে এগোচ্ছে।

'আমি দৌড়ে গিয়ে আমার লাঠি দিয়ে শুঁড়টায় এক প্রচন্ড আঘাত করে দু হাত দিয়ে প্রয়াগকে টেনে কোনমতে তাকে উদ্ধার করি। তবে চিন্তার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রয়াগের হাতের খানিকটা মাংস সেপ্টোপাস্ খাবলে নিয়েছিল, এবং সেটাই সে পেটের মধ্যে পুরেছে, এ আমার নিজের চোখে দেখা।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে বারান্দায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। কান্তিবাবু একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'সেপ্টোপাস্-এর যে মানুষের প্রতি লোভ বা আক্রোশ থাকতে পারে তার কোন ইঙ্গিত এতদিন পাইনি। কাল যখন পেলাম, তারপরে

এটাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। কাল একবার খাবারে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু কী আশ্চর্য বুদ্ধি গাছটার—সে-খাবার ও শুঁড়ে নিয়েই ফেলে দিল। একমাত্র উপায় হল গুলি করে মারা। পরিমল, তোমায় কেন ডেকেছি সেটা বুঝতে পারছ তো!'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'গুলি করলে ও মরবে কিনা সেটা আপনি জানেন?'

কান্তিবাবু বললেন, 'মরবে কিনা জানি না। তবে আমার বিশ্বাস ব্রেন বলে ওর একটা জিনিস আছে। ওর চিন্তাশক্তি যে আছে তার তো প্রমাণই পেয়েছি, কারণ আমি তো কতবার ওর কত কাছে গেছি—ও তো আমাকে কোনদিন আক্রমণ করেনি। আমাকে চেনে—যেমন কুকুর তার মনিবকে চেনে। প্রয়াগের উপর আক্রোশের কারণ হচ্ছে যে প্রয়াগ কয়েকবার ওর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করেছে। খাবারের লোভ দেখিয়ে দেয়নি; কিংবা শুঁড়ের ডগার কাছে নিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে নিয়েছে। মস্তিষ্ক ওর আছেই, এবং আমার বিশ্বাস সেটা যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে—অর্থাৎ ওর মাথায়। যেখানটা ঘিরে শুঁড়গুলো বেরিয়েছে সেখানেই তোমায় তাগ করে গুলি ওর মাথাতেই মারতে হবে।'

অভি ফস করে বলল, 'সে আর এমন কী। সে তো এক মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। পরিমল, তোর বন্দুকটা—'

কান্তিবাবু হাত তুলে অভিকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'শিকার যদি ঘুমিয়ে থাকে, তখন কি তাকে মারা চলে? পরিমলের হান্টিং কোড কী বলে?'

আমি বললাম, 'ঘুমন্ত শিকারকে গুলি করা একেবারেই নীতিবিরুদ্ধ। বিশেষত শিকার যেখানে চলেফিরে বেড়াতে পারে না, সেখানে তো এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না।'

কান্তিবাবু ফ্লাস্ক এনে চা পরিবেশন করলেন। চা-পান শেষ হতে না হতে মিনিট পনেরোর মধ্যেই সেপ্টোপাসের ঘুম ভাঙল।

বাদশা পাশের ঘরে কিছুক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। হঠাৎ একটা খচমচ আর গোঙানির শব্দ পেয়ে অভি আর আমি উঠে গিয়ে দেখি বাদশা দাঁত দিয়ে প্রাণপণে তার বক্‌লস্‌টাকে ছেঁড়বার চেষ্টা করছে। অভি ধমক দিয়ে বাদশাকে নিরস্ত করতে গেছে, এমন সময় কারখানা-ঘর থেকে একটা সপাত সপাত শব্দ আর তার সঙ্গে একটা উগ্র গন্ধ পেলাম। গন্ধটা এমন যার তুলনা দেওয়া মুশকিল। ছেলেবেলায় টনসিল অপারেশনের সময় ক্লোরোফর্ম শুঁকতে হয়েছিল, তার সঙ্গে হয়তো কিছুটা মিল আছে।

কান্তিবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'চলো, সময় হয়েছে।'

আমি বললাম, 'গন্ধটা কিসের?'

'সেপ্টোপাস্-এর। এই গন্ধ ছড়িয়েই ওরা শিকার—'

কান্তিবাবুর কথা শেষ হল না। বাদশা প্রচণ্ড এক টানে বক্লস্ ছিঁড়ে ধাক্কার চোটে অভিকে উলটিয়ে ফেলে তীরবেগে পাগলের মত ছুটল ওই গন্ধের উৎসের দিকে।

অভিও কোনমতে উঠে 'সর্বনাশ' বলে ছুটল বাদশার পিছনে।

আমি গুলিভরা বন্দুক নিয়ে কারখানা-ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে দেখি বাদশা এক বিরাট লাফে একমাত্র খোলা জানালার উপর উঠল, এবং অভির বাধা দেবার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে ঘরের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কান্তিবাবু চাবি দিয়ে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম রামপুর হাউন্ডের মর্মান্তিক আর্তনাদ।

ঢুকে দেখি—এক শুঁড়ে শানাচ্ছে না; একের পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শুঁড় দিয়ে সেপ্টোপাস্ বাদশাকে মরণপাশে আবদ্ধ করেছে।

কান্তিবাবু চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'তোমরা আর এগিও না! পরিমল, চালাও গুলি।'

বন্দুক উঁচিয়েছি এমন সময় চীৎকার এল, 'থামো।'

অভিজিতের কাছে তার কুকুরের মূল্য কতখানি তা এবার বুঝতে পারলাম। সে কান্তিবাবুর বারণ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ছুটে গিয়ে সেপ্টোপাস্-এর তিনটে শুঁড়ের একটাকে আঁকড়ে ধরল।

তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

তিনটে শুঁড়ই একসঙ্গে বাদশাকে ছেড়ে দিয়ে অভিকে আক্রমণ করল। আর অন্য চারটে শুঁড় যেন মানুষের রক্তের লোভেই হঠাৎ সজাগ হয়ে লোলুপ জিহ্বার মত লকলক করে উঠল।

কান্তিবাবু আবার বললেন, 'চালাও—চালাও গুলি! ওই যে মাথা!'

সেপ্টোপাস্-এর মাথায় দেখলাম একটা ঢাকনি আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। ঢাকনির নিচে গহ্বর। আর অভিসমেত শুঁড়গুলি শূন্যে উঠে সেই গহ্বরের দিকে চলেছে।

অভির মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে, তার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

চরম সংকটের মুহূর্তে—আমি এর আগেও দেখেছি—আমার স্নায়ুগুলো সব যেন হঠাৎ কেমন ম্যাজিকের মত সংযত, সংহত হয়ে যায়।

আমি নিষ্কম্প হাতে বন্দুক নিয়ে সেপ্টোপাস্-এর মাথার দুটি চক্ষুর মধ্যিখানে অব্যর্থ নিশানায় গুলি ছুঁড়লাম।

ছোঁড়ার পরমুহূর্তেই মনে আছে ফিনকি দিয়ে গাছের মাথা থেকে লাল রক্তের ফোয়ারা। আর মনে আছে, শুঁড়গুলো অভিকে মুক্তি দিয়ে মাটিতে নেতিয়ে পড়ছে, আর সেই সঙ্গে আগের সেই গন্ধটা হঠাৎ তীব্রভাবে বেড়ে উঠে আমার

চেতনাকে আচ্ছন্ন, অবশ করছে।...

*　　　*　　　*

আগের ঘটনার পর চার মাস কেটে গেছে। এতদিনে আবার আমার অসমাপ্ত উপন্যাসটা নিয়ে পড়েছি।

বাদশাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তবে অভি ইতিমধ্যে একটি ম্যাস্টিফ ও একটি তিব্বতী কুকুরের বাচ্চা সংগ্রহ করেছে এবং আরেকটি রামপুর হাউন্ডের সন্ধান করছে। অভির পাঁজরের দুখানা হাড় ভেঙেছিল। দু মাস প্লাস্টারে থাকার পর জোড়া লেগেছে।

কান্তিবাবু কাল এসেছিলেন। বললেন কীটখোর গাছপালা সব বিদেয় করে দেবার কথা ভাবছেন।

'বরং সাধারণ শাকসবজি নিয়ে একটু গবেষণা করলে ভালো হয়। ঝিঙে, উচ্ছে, পটল—এইসব আর কি। যদি বল, তোমায় কিছু গাছ দিতে পারি। তুমি আমার এত উপকার করলে। এই ধরো একটা নেপেন্‌থিস্‌; তোমার ঘরের পোকাগুলোকে অন্তত—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না। ওসব আপনি ফেলে দিতে চান তো ফেলে দিন। পোকা ধরার জন্যে আমার গাছের দরকার নেই।'

কিং কোম্পানির ক্যালেন্ডারের পিছন দিক থেকে শব্দ এল, 'ঠিক ঠিক ঠিক।'

বঙ্কুবাবুর বন্ধু

বঙ্কুবাবুকে কেউ কোনদিন রাগতে দেখে নি। সত্যি বলতে কি, তিনি রাগলে যে কী রকম ব্যাপারটা হবে, কী যে বলবেন বা করবেন তিনি, সেটা আন্দাজ করা ভারি শক্ত।

অথচ রাগবার যে কারণ ঘটে না তা মোটেই নয়। আজ বাইশ বছর তিনি কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল ও বাংলা পড়িয়ে আসছেন; এর মধ্যে কত ছাত্র এল গেল, কিন্তু বঙ্কুবাবুর পিছনে লাগা—ব্ল্যাকবোর্ডে তাঁর ছবি আঁকা, তাঁর বসবার চেয়ারে গাবের আঠা মাখিয়ে রাখা, কালীপুজোর রাত্রে তাঁর পিছনে ছুঁচোবাজি ছেড়ে দেওয়া—এসবই এই বাইশ বছর ধরে ছাত্র-পরম্পরায় চলে আসছে।

বঙ্কুবাবু কিন্তু কক্ষনো রাগেন নি। কেবল মাঝে মাঝে গলা খাঁকরিয়ে বলেছেন—ছিঃ!

এর একটা কারণ অবিশ্যি এই যে তিনি যদি রাগটাগ করে মাস্টারি ছেড়ে দেন তো তাঁর মত গরিব লোকের পক্ষে এই বয়সে আর-একটা মাস্টারি বা চাকরি খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত হবে। আর-একটা কারণ হল, ক্লাসভর্তি দুষ্টু ছেলের মধ্যে দু-একটি করে ভালো ছাত্র প্রতিবারেই থাকে; বঙ্কুবাবু তাদের সঙ্গে ভাব করে তাদের পড়িয়ে এত আনন্দ পান যে তাতেই তাঁর মাস্টারি সার্থক হয়ে যায়। এই সব ছাত্রদের তিনি কখনো কখনো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর বাটি করে মুড়কি খেতে দিয়ে গল্পচ্ছলে দেশবিদেশের আশ্চর্য ঘটনা শোনান। আফ্রিকার গল্প, মেরু আবিষ্কারের গল্প, ব্রেজিলের মানুষখেকো মাছের গল্প, সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়া আটলাণ্টিস মহাদেশের গল্প, এসবই বঙ্কুবাবু চমৎকার করে বলতে পারেন।

শনি-রবিবার সন্ধ্যাবেলাটা বঙ্কুবাবু যান গ্রামের উকিল শ্রীপতি মজুমদারের আড্ডায়। অনেকবার ভেবেছেন আর যাবেন না, এই শেষবার, আর না। কারণ ছাত্রদের টিটকিরি গা-সওয়া হয়ে গেলেও, বুড়োদের পিছনে লাগাটা যেন কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। এই বৈঠকে তাঁকে নিয়ে যে ধরনের ঠাট্টা-তামাশা চলে সেটা সত্যিই মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এই তো সেদিন, দু মাসও হয় নি, ভূতের কথা হচ্ছিল। বঙ্কুবাবু সচরাচর

সত্যজিৎ রায়
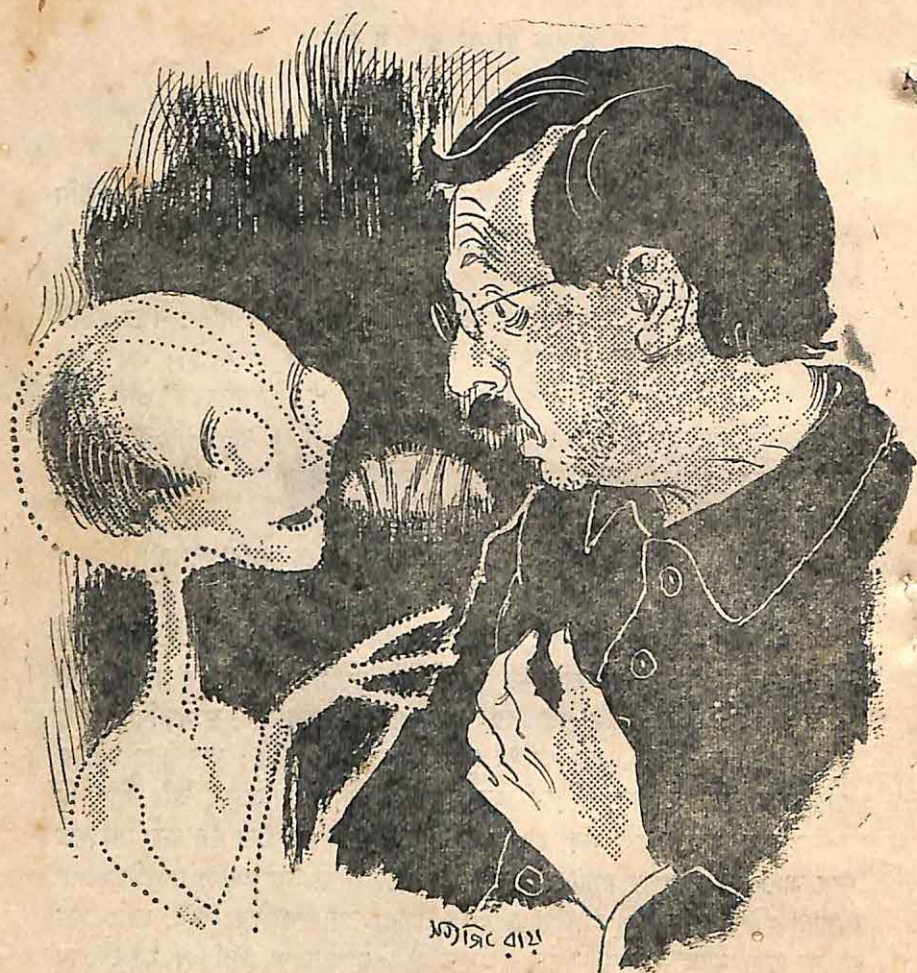
মুখ খোলেন না। সেদিন কী জানি হল, হঠাৎ বলে ফেললেন যে তাঁর ভূতের ভয় নেই। আর যায় কোথা! এমন সুযোগ কি এসব লোকে ছাড়ে? রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে বঙ্কুবাবুকে যাচ্ছেতাইভাবে নাজেহাল হতে হল। মিত্তির-দের তেঁতুলগাছটার তলায় কে এক লিকলিকে লম্বা লোক ভূশোটুশো মেখে অন্ধকারে তাঁর পিঠের উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে। এই আড্ডারই কারো চক্রান্ত আর কি।

ভয় অবিশ্যি পান নি বঙ্কুবাবু। তবে চোট লেগেছিল। তিনদিন ঘাড়ে ব্যথা ছিল। আর সবচেয়ে যেটা বিশ্রী—তাঁর নতুন পাঞ্জাবিটা কালিটালি লেগে ছিঁড়েটিড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ঠাট্টার এ কী রকম রে বাপু!

এ ছাড়া ছোটখাটো পিছনে লাগার ব্যাপার তো লেগেই আছে। এই যেমন ছাতাটা জুতোটা লুকিয়ে রাখা, পানে আসল মসলার বদলে মাটির মসলা দিয়ে দেওয়া, জোর করে ধরে-বেঁধে গান গাওয়ানো ইত্যাদি।

কিন্তু তাও আড্ডায় আসতে হয়। না এলে শ্রীপতিবাবু কী ভাববেন। একে তো তিনি গাঁয়ের গণ্যমান্য লোক, দিনকে রাত করতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁর, তার উপরে আবার তাঁর বঙ্কুবাবু না হলে চলেই না। তিনি বলেন, একজন লোক থাকবে যাকে নিয়ে বেশ রসিয়ে রগড় করা চলবে, নইলে আর আড্ডা? ডাকো বঙ্কুবিহারীকে।

আজকের আড্ডার সুর ছিল উচ্চগ্রামের; অর্থাৎ স্যাটিলাইট নিয়ে কথা হচ্ছিল। আজই সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ পরেই উত্তর দিকের আকাশে একটি চলন্ত আলো দেখা গেছে। মাস তিনেক আগেও একবার ওই রকম আলো দেখা গিয়েছিল এবং তাই নিয়ে আড্ডায় বিস্তর গবেষণা চলেছিল। পরে জানা যায় ওটা একটা রাশিয়ান স্যাটিলাইট। খটকা না ফোসকা এই গোছের কী একটা নাম। সেটা নাকি ৪০০ মাইল ওপর দিয়ে বনবন করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এবং তার থেকে নাকি বৈজ্ঞানিকেরা অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছেন।

আজকের আলোটা বঙ্কুবাবু প্রথম দেখেছিলেন। তারপর তিনিই সেটা নিধু মোক্তারকে ডেকে দেখান।

কিন্তু আড্ডায় এসে বঙ্কুবাবু দেখলেন যে নিধুবাবু অম্লানবদনে প্রথম দেখার ক্রেডিটটা নিজেই নিয়েছেন, এবং সেই নিয়ে খুব বড়াই করছেন। বঙ্কুবাবু কিছু বললেন না।

স্যাটিলাইট সম্বন্ধে এখানে কেউই বিশেষ কিছু জানেন না, তবে এসব কথা বলতে তো আর টিকিট লাগে না, বা বললে পুলিসেও ধরে না, তাই

সবাই ফোড়ন দিচ্ছেন।

চণ্ডীবাবু বললেন, 'যাই বল বাপু, এসব স্যাটিলাইট-ফ্যাটিলাইট নিয়ে খামখা মাথা ঘামানো আমাদের শোভা পায় না। আমাদের কাছে ও-ও যা, সাপের মাথার মণিও তাই। কোথায় আকাশের কোন্ কোণে আলোর ফুটকি দেখছ, তাই নিয়ে খবরের কাগজে লিখছে, আর তাই পড়ে তুমি বৈঠকখানায় বসে পান চিবুতে চিবুতে বাহবা দিচ্ছ। যেন তোমারই কীর্তি, তোমারই গৌরব। হাততালিটা যেন তোমারই পাওনা। হুঃ।'

রামকানাই-এর বয়সটা কম। সে বলল, 'আমার না হোক, মানুষের তো। সবার উপরে মানুষ সত্য।'

চণ্ডীবাবু বললেন, 'রাখো রাখো। যত সব......মানুষ না তো কি বাঁদরে বানাবে স্যাটিলাইট? মানুষ ছাড়া আর আছে কী?'

নিধু মোক্তার বললেন, 'আচ্ছা বেশ। স্যাটিলাইটের কথা ছেড়েই দিলাম। তাতে না-হয় লোকটোক নেই, কেবল একটা যন্তর পাক খাচ্ছে। তা সে তো লাট্টুও পাক খায়। সুইচ টিপলে পাখাও ঘোরে। যাকগে। কিন্তু রকেট? রকেটের ব্যাপারটা তো নেহাত ফেলনা নয় ভায়া।'

চণ্ডীবাবু নাক সিঁটকে বললেন, 'রকেট! রকেট ধুয়ে কোন্ জলটা খাবে শুনি? রকেট! তাও বুঝতাম যদি হ্যাঁ, এই আমাদের দেশেই তৈরি হল, গড়ের মাঠ থেকে ছাড়লে সেটা চাঁদে-টাঁদে তাগ করে, আমরা গিয়ে টিকিট কিনে দেখে এলুম, তাও একটা মানে হয়।'

রামকানাই বলল, 'ঠিক বলেছেন। আমাদের কাছে রকেটও যা, ঘোড়ার ডিমও তাই।'

ভৈরব চক্কোত্তি বললেন, 'ধর যদি অন্য গ্রহ-টহ থেকে একটা কিছু পৃথিবীতে এল...'

'এলেই বা কী? তুমি-আমি তো আর সেটাকে দেখতে পাব না।'

'তা বটে।'

আড্ডার সবাই চায়ের পেয়ালায় মুখ দিলেন। এর পর তো আর কথা চলে না!

এই অবসরে বঙ্কুবাবু খুক করে একটু কেশে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'ধরুন যদি এইখানেই আসে।'

নিধুবাবু অবাক হবার ভান করে বললেন, 'ব্যাঁকা আবার কী বলছ হে, অ্যাঁ? কে আসবে এইখানে? কোত্থেকে আসবে?'

বঙ্কুবাবু আবার মৃদুস্বরে বললেন, 'অন্য গ্রহ থেকে কোন লোক-টোক...'

ভৈরব চক্কোত্তি তাঁর অভ্যাসমত বঙ্কুবাবুর পিঠে একটা অভদ্র চাপড়

মেরে দাঁত বার করে বললেন, 'বাঃ বঙ্কুবিহারী, বাঃ। অন্য গ্রহ থেকে লোক আসবে এইখানে? এই গণ্ডগ্রামে? লণ্ডন নয়, মস্কো নয়, নিউইয়র্ক নয়, মায় কলকেতাও নয়—একেবারে এই কাঁকুড়গাছি? তোমার তো শখ কম নয়!'

বঙ্কুবাবু চুপ করে গেলেন। কিন্তু তাঁর মন বলতে লাগল, সেটা আর এমন অসম্ভব কী? বাইরে থেকে যারা আসবে, তাদের তো পৃথিবীতে আসা নিয়ে কথা। অত যদি হিসেব করে না-ই আসে? কাঁকুড়গাছিতে না-আসা যেমন সম্ভব আসাও তো ঠিক তেমনি সম্ভব।

শ্রীপতিবাবু এতক্ষণ কিছু বলেন নি। এবার তিনি নড়েচড়ে বসতেই সকলে তাঁর মুখের দিকে চাইল। তিনি চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বিজ্ঞের মত ভারী গলায় বললেন, 'দেখ, বাইরের গ্রহ থেকে যদি লোক আসেই, তবে এটা জেনে রেখো যে তারা এই পোড়া দেশে আসবে না। তাদের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই! আর অত বোকা তারা নয়। আমার বিশ্বাস তারা সাহেব, এবং এসে নামবে ওই সাহেবদেরই দেশে, পশ্চিমে। বুঝেছ?'

এ কথায় এক বঙ্কুবাবু ছাড়া সকলেই একবাক্যে সায় দিলেন।

চণ্ডীবাবু নিধু মোক্তারের কোমরে খোঁচা মেরে ইশারায় বঙ্কুবাবুকে দেখিয়ে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বললেন, 'আমার কিন্তু বাবা মনে হয় যে বঙ্কু ঠিকই বলেছে। বঙ্কুবিহারীর মত লোক যেখানে আছে সেখানে আসাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কী বল হে নিধু? ধর যদি একটা স্পেসিমেন নিয়ে যেতে হয়, তাহলে বঙ্কুর মত দ্বিতীয় মানুষ কোথায় পাচ্ছে শুনি?'

নিধু মোক্তার সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক ঠিক। বুদ্ধি বল, চেহারা বল, যাই বল, ব্যাঁকা একেবারে আইডিয়াল।'

রামকানাই বলল, 'একেবারে জাদুঘরে রাখার মত। কিংবা চিড়িয়াখানায়।'

বঙ্কুবাবু মনে মনে বললেন, স্পেসিমেন যদি বলতে হয় তো এঁরাই বা কী কম? ওই তো শ্রীপতিবাবু—উটের মত থুতনি। আর ওই ভৈরব চক্কোত্তি—কচ্ছপের মত চোখ, ওই নিধু মোক্তার ছুঁচো, রামকানাই ছাগল, চণ্ডীবাবু চামচিকে। চিড়িয়াখানায় যদি রাখতে হয় তো...

বঙ্কুবাবুর চোখে জল এল। তিনি উঠে পড়লেন। আজ অন্তত আড্ডাটা ভালো লাগবে ভেবেছিলেন। হল না। মনটা ভারী হয়ে গেছে। আর থাকা চলে না।

'সে কী, উঠলে না কি হে?' শ্রীপতিবাবু যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'হ্যাঁ, রাত হল।'

'কই রাত? কাল তো ছুটি! বোসো, চা খাও।'

'নাঃ। আজ আসি। পরীক্ষার খাতা আছে কিছু। নমস্কার।'

রামকানাই বলল, 'দেখবেন বঙ্কুদা। আজ আবার অমাবস্যা। মঙ্গলগ্রহের

মানুষ কিন্তু ভূতেরও বাড়া।'

বঙ্কুবাবু আলোটা দেখতে পেলেন পঞ্চা ঘোষের বাঁশবাগানের মাঝবরাবর এসে। তাঁর নিজের হাতে আলো ছিল না। শীতকাল, তাই সাপের ভয় নেই; তাছাড়া পথও খুব ভালো ভাবেই চেনা। এ পথে এমনিতে বড় একটা কেউ আসে না, কিন্তু বঙ্কুবাবুর শর্টকাট হয় বলেই তিনি এই পথে যান।

কিছুক্ষণ থেকেই তাঁর কেমন জানি খটকা লাগছিল। অন্যদিনের চেয়ে কী-জানি একটা অন্য রকম ভাব। কিন্তু সেটা যে কী তা বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ খেয়াল হল যে বাঁশবনে আজ ঝিঁঝি ডাকছে না। একদম না। সেইটেই তফাত। অন্যাদিন যতই বনের ভিতর ঢোকেন ততই ঝিঁঝির ডাক বাড়ে। আজ ঠিক তার উলটো। তাই এমন থমথমে ভাব। ব্যাপার কী? ঝিঁঝিগুলো সব ঘুমোচ্ছে নাকি?

ভাবতে ভাবতে হাত বিশেক গিয়ে পুব দিকে চোখ যেতেই আলোটা দেখতে পেলেন।

প্রথমে মনে হল বুঝি আগুন লেগেছে। বনের মধ্যিখানের ফাঁকটায় যেখানে ডোবাটা রয়েছে তার চারপাশের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে গাছের ডালে ও পাতায় একটা গোলাপী আভা। আর নিচে, ডোবার সমস্ত জায়গাটা জুড়ে উজ্জ্বল গোলাপী আলো। কিন্তু আগুন নয়, কারণ আলোটা স্থির।

বঙ্কুবাবু এগোতে লাগলেন।

কানের মধ্যে একটা শব্দ আসছে। কিন্তু সেটা যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। হঠাৎ কানে তালা লাগলে যেমন শব্দ হয়—রী রী রী রী রী রী—এ যেন ঠিক সেই রকম।

বঙ্কুবাবুর গা একটু ছমছম করে থাকলেও, একটা অদম্য কৌতূহলবশে তিনি এগিয়ে চললেন।

ডোবার থেকে ত্রিশ হাত দূরে বড় বাঁশঝাড়টা পেরোতেই তিনি জিনিসটা দেখতে পেলেন। একটা অতিকায় উপুড়-করা কাঁচের বাটির মত জিনিস সমস্ত ডোবাটাকে আচ্ছাদন করে পড়ে আছে এবং তার প্রায়-স্বচ্ছ ছাউনির ভিতর থেকে একটা তীব্র অথচ স্নিগ্ধ গোলাপী আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চতুর্দিকের বনকে আলো করে দিয়েছে।

এমন অদ্ভুত দৃশ্য বঙ্কুবাবু স্বপ্নেও কখন দেখেন নি।

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বঙ্কুবাবু লক্ষ্য করলেন যে জিনিসটা স্থির হলেও যেন নির্জীব নয়। অল্প অল্প স্পন্দনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্বাসপ্রশ্বাসে মানুষের বুক যেমন ওঠে নামে, কাঁচের ঢিবিটা

তেমনি উঠছে নামছে।

বঙ্কুবাবু ভালো করে দেখবার জন্য আর হাত চারেক এগিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন তাঁর শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। আর তার পরমুহূর্তেই তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর হাত-পা যেন কোন অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তাঁর শরীরে আর শক্তি নেই। তিনি না পারেন এগোতে, না পারেন পিছোতে।

কিছুক্ষণ এইভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বঙ্কুবাবু দেখলেন যে জিনিসটার স্পন্দন আস্তে আস্তে থেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সেই অদ্ভুত কানে-তালা-লাগার শব্দটা। তারপর হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে, কতকটা মানুষের মত কিন্তু অত্যন্ত মিহি গলায় চীৎকার এল—মিলিপিপ্পিং খুক, মিলিপিপ্পিং খুক!

বঙ্কুবাবু চমকে গিয়ে থ। এ আবার কী ভাষা রে বাবা! আর যে বলছে সেই বা কোথায়?

দ্বিতীয় চীৎকার শুনে বঙ্কুবাবুর বুকটা ধড়াস করে উঠল।

'হু আর ইউ? হু আর ইউ?'

এ যে ইংরিজি! হয়তো তাঁকেই জিগ্যেস করা হচ্ছে প্রশ্নটা।

বঙ্কুবাবু ঢোক গিলে বলে উঠলেন, 'আই অ্যাম বঙ্কুবিহারী দত্ত স্যার—বঙ্কুবিহারী দত্ত।'

প্রশ্ন এল, 'আর ইউ ইংলিশ? আর ইউ ইংলিশ?'

বঙ্কুবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'নো স্যার। বেঙ্গলি কায়স্থ স্যার।'

একটুক্ষণ চুপচাপের পর পরিষ্কার উচ্চারণে কথা এল, 'নমস্কার।'

বঙ্কুবাবু হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'নমস্কার।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর হাত-পায়ের অদৃশ্য বাঁধনগুলো যেন আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছা করলেই পালাতে পারেন, কিন্তু পালালেন না। কারণ তিনি দেখলেন সেই অতিকায় কাঁচের ঢিবির একটা অংশ আস্তে আস্তে দরজার মত খুলে যাচ্ছে।

সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল প্রথমে একটা মসৃণ বলের মত মাথা, তারপর একটা অদ্ভুত প্রাণীর সমস্ত শরীরটা।

লিকলিকে শরীরের মাথা বাদে সমস্তটাই একটা চকচকে গোলাপী পোশাকে ঢাকা। মুখের মধ্যে কান ও নাকের জায়গায় দুটো করে এবং ঠোঁটের জায়গায় একটা ফুটো। লোম বা চুলের লেশমাত্র নেই। হলদে গোলগাল চোখদুটো এমনই উজ্জ্বল যে দেখলে মনে হয় আলো জ্বলছে।

লোকটা আস্তে আস্তে বঙ্কুবাবুর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর তিন হাত দূরে থেকে তাঁকে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। বঙ্কুবাবুর হাতদুটো আপনা

থেকেই জোড় হয়ে এল।

প্রায় এক মিনিট দেখার পর লোকটা সেই রকম বাঁশির মত মিহি গলায় বলল, 'তুমি মানুষ?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'হুঁ।'

লোকটা বলল, 'এটা পৃথিবী?'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'হুঁ।'

'ঠিক ধরেছি—যন্ত্রপাতিগুলো গোলমাল করছে। যাবার কথা ছিল প্লুটোয়। একটু সন্দেহ ছিল মনে, তাই তোমাকে প্রথমে প্লুটোর ভাষায় প্রশ্ন করলাম। যখন দেখলাম তুমি উত্তর দিলে না তখন বুঝতে পারলাম যে পৃথিবীতেই এসে পড়েছি। পন্ডশ্রম হল। ছি-ছি-ছি, এতদূর এসে! আরেকবার এরকম হয়েছিল। বুধ যেতে বৃহস্পতি গিয়ে পড়েছিলাম। একদিনের তফাত আর কি, হেঃ হেঃ হেঃ।'

বঙ্কুবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তাছাড়া ওঁর এমনিতেই অসোয়াস্তি লাগছিল। কারণ লোকটা সরু সরু আঙুল দিয়ে ওঁর হাত-পা টিপে টিপে দেখতে আরম্ভ করেছে।

টেপা শেষ করে লোকটা বলল, 'আমি ক্রেনিয়াস গ্রহের অ্যাং। মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী।'

এই লিকলিকে চার ফুট লোকটা মানুষের চেয়ে উচ্চস্তরের প্রাণী? বললেই হল? বঙ্কুবাবুর হাসি পেল।

লোকটা কিন্তু আশ্চর্যভাবে বঙ্কুবাবুর মনের কথা বুঝে ফেলল। সে বলল, 'অবিশ্বাস করার কিছু নেই! প্রমাণ আছে।...তুমি ক'টা ভাষা জান?'

বঙ্কুবাবু মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'বাংলা, ইংরিজি, আর ইয়ে...হিন্দিটা... মানে...'

'মানে আড়াইটে।'

'হ্যাঁ তা...'

'আমি জানি চোদ্দ হাজার। তোমাদের সৌরজগতে এমন ভাষা নেই যা আমি জানি না। তাছাড়া আরো একত্রিশটি বাইরের গ্রহের ভাষা আমার জানা আছে। এর পঁচিশটি গ্রহে আমি নিজে গিয়েছি। তোমার বয়স কত?'

'পঞ্চাশ।'

'আমার আটশ তেত্রিশ। তুমি জানোয়ার খাও?'

বঙ্কুবাবু এই সেদিন কালীপুজোয় পাঁঠার মাংস খেয়েছেন—না বলেন কী করে।

অ্যাং বলল, 'আমরা খাই না। বেশ কয়েকশ বছর হল ছেড়ে দিয়েছি। আগে খেতাম। হয়তো তোমাকেও খেতাম।'

বঙ্কুবাবু ঢোক গিললেন।

'এই জিনিসটা দেখছ?'

অ্যাং একটা নুড়িপাথরের মত ছোট জিনিস বঙ্কুবাবুর হাতে দিল। সেটা হাতে ঠেকতেই বঙ্কুবাবুর সর্বাঙ্গে আবার এমন একটা শিহরন খেলে গেল যে তিনি তৎক্ষণাৎ ভয়ে পাথরটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

অ্যাং হেসে বলল, 'এটা আমার হাতে ছিল বলে তুমি তখন এগোতে পার নি। কেউ পারে না। শত্রুকে জখম না করে অক্ষম করার মত এমন জিনিস আর নেই।'

বঙ্কুবাবু এবার সত্যিই অবাক হতে শুরু করেছেন।

অ্যাং বলল, 'এমন কোন জায়গা বা দৃশ্য আছে যা তোমার দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু হয়ে ওঠে না?'

বঙ্কুবাবু ভাবলেন, সারা পৃথিবীটাই তো দেখি বাকি। ভূগোল পড়ান, অথচ বাংলাদেশের গুটিকতক গ্রাম ও শহর ছাড়া আর কী দেখেছেন তিনি? বাংলাদেশেরই বা কী দেখেছেন? হিমালয়ের বরফ দেখেন নি, দীঘার সমুদ্র দেখেন নি, সুন্দরবনের জঙ্গল দেখেন নি, এমনকি শিবপুরের বাগানের সেই বটগাছটা পর্যন্ত দেখেন নি।

মুখে বললেন, 'অনেক কিছুই তো দেখি নি। ধরুন গরম দেশের মানুষ, তাই নর্থ পোলটা দেখতে খুব ইচ্ছে করে।'

অ্যাং একটা ছোট কাঁচ-লাগানো নল বার করে বঙ্কুবাবুর মুখের সামনে ধরে বলল, 'এইটেয় চোখ লাগাও।'

চোখ লাগাতেই বঙ্কুবাবুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এও কী সম্ভব? তাঁর চোখের সামনে ধু ধু করছে অন্তহীন বরফের মরুভূমি, তার মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে পাহাড়ের মত এক-একটা বরফের চাঁই। উপরে গাঢ় নীল আকাশে রামধনুর রঙে রঙীন বিচিত্র নকশা সব ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটাচ্ছে— অরোরা বোরিয়ালিস। ওটা কী? ইগলু! ওই পোলার বেয়ারের সারি। ওই পেঙ্গুইনের দল। ওটা কোন্ বীভৎস জানোয়ার? ভালো করে দেখে বঙ্কুবাবু চিনলেন—সিন্ধুঘোটক। একটা নয়, দুটো—প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। মুলোর মত জোড়া দাঁত একটা আর-একটার গায়ে বসিয়ে দিল। শুভ্র বরফের গায়ে লাল রক্তের স্রোত!...

পৌষ মাসের শীতে বরফের দৃশ্য দেখে বঙ্কুবাবুর ঘাম ঝরতে শুরু করল।

অ্যাং বলল, 'ব্রেজিলে যেতে ইচ্ছে করে না?'

বঙ্কুবাবুর মনে পড়ে গেল—সেই মাংসখেকো পিরান্হা মাছ। আশ্চর্য। লোকটা তাঁর মনের কথা টের পায় কী করে?

বংকুবাবু আবার চোখ লাগালেন।

গভীর জংগল। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে গলে আসা ইতস্তত রোদের ছিটেফোঁটা, একপাশে একটা প্রকাণ্ড গাছ, তা থেকে ঝুলছে ওটা কী? সর্বনাশ! এত বড় সাপ বংকুবাবু জীবনে কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল কোথায় যেন পড়েছেন ব্রেজিলের অ্যানাকণ্ডা। অজগরের বাবা। কিন্তু মাছ কই? ওই যে একটা খাল। দুপাশে ডাঙায় কুমির রোদ পোয়াচ্ছে। সার সার কুমির—তার একটা নড়ে ওঠে। জলে নামবে। ওই নেমে গেল সড়াত—বংকুবাবু যেন শব্দটাও শুনতে পেলেন। কিন্তু এ কী ব্যাপার? কুমিরটা এমন বিদ্যুদ্বেগে জল ছেড়ে উঠে এল কেন? কিন্তু এ কি সেই একই কুমির? বংকুবাবু বিস্ফারিত চোখে দেখলেন যে কুমিরটার তলার অংশটায় মাংস বলে প্রায় কিছুই নেই, খালি হাড়। আর শরীরের বাকী অংশটা গোগ্রাসে গিলে চলেছে পাঁচটি দাঁতালো রাক্ষুসে মাছ। পিরান্হা মাছ!

বংকুবাবু আর দেখতে পারলেন না। তাঁর হাত-পা কাঁপছে, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

অ্যাং বলল, 'এখন বিশ্বাস হয় আমরা শ্রেষ্ঠ?'

বংকুবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, 'তা তো বটেই। নিশ্চয়। বিলক্ষণ। একশোবার।'

অ্যাং বলল, 'বেশ। তোমায় দেখে এবং তোমার হাত-পা টিপে মনে হচ্ছে যে তুমি নিকৃষ্ট প্রাণী হলেও, মানুষ হিসেবে খারাপ নও। তবে তোমার দোষ হচ্ছে যে তুমি অতিরিক্ত নিরীহ, তাই তুমি জীবনে উন্নতি কর নি। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা বা নীরবে অপমান সহ্য করা এসব শুধু মানুষ কেন, কোন প্রাণীরই শোভা পায় না। যাক, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার কথা ছিল না, হয়ে ভালোই লাগল। তবে পৃথিবীতে বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি বরং আসি।'

বংকুবাবু বললেন, 'আসুন অ্যাংবাবু। আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব—'

বংকুবাবুর কথা আর শেষ হল না, চক্ষের পলকে কখন যে অ্যাং রকেটে উঠে পড়ল, এবং কখন যে সেই রকেট পঞ্চা ঘোষের বাঁশবন ছেড়ে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল, তা যেন বংকুবাবু টেরই পেলেন না। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে আবার ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে। রাত হয়ে গেল অনেক।

বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে বংকুবাবু তাঁর মনে একটা আশ্চর্য ভাব অনুভব করলেন। কত বড় একটা ঘটনা যে তাঁর জীবনে ঘটে গেল, এই কিছুক্ষণ আগেও তিনি সেটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। কোথাকার

কোন্ সৌরজগতের এক গ্রহ, তার নামও হয়তো কেউ শোনে নি, তারই একজন লোক—লোক তো নয়, অ্যাং—তাঁর সঙ্গে এসে আলাপ করে গেল। কী আশ্চর্য। কী অদ্ভুত। সারা পৃথিবীতে আর কারো সঙ্গে নয়, কেবল তাঁর সঙ্গে। তিনি, শ্রীবঙ্কুবিহারী দত্ত, কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি ইস্কুলে ভূগোল ও বাংলার শিক্ষক। আজ, এই এখন থেকে, অন্তত একটা অভিজ্ঞতায়, তিনি সারা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয়।

বঙ্কুবাবু দেখলেন, তিনি আর হাঁটছেন না, নাচছেন।

পরদিন রবিবার। শ্রীপতিবাবুর বাড়িতে জোর আড্ডা। কালকের আলোর খবরটা আজ কাগজে বেরিয়েছে, তবে নেহাতই নগণ্যের পর্যায়ে। বাংলাদেশের মাত্র দু-একটি জায়গা থেকে আলোটা দেখতে পাওয়ার খবর এসেছে। তাই সেটাকে ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত পিরিচের মত গুজবের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আজ পঞ্চা ঘোষও আড্ডায় এসেছেন। তাঁর চল্লিশ বিঘের বাঁশবাগানের মধ্যে যে ডোবাটা আছে, তার চারপাশের দশটা বাঁশঝাড় নাকি রাতারাতি একেবারে নেড়া হয়ে গেছে। শীতকালে বাঁশের শুকনো পাতা ঝরে বটে, কিন্তু এইভাবে হঠাৎ নেড়া হয়ে যাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক, এই বিষয়েই কথা হচ্ছিল, এমন সময় ভৈরব চক্কোত্তি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আজ বঙ্কুর দেরি কেন?'

তাই তো, এতক্ষণ কারো খেয়াল হয় নি।

নিধু মোক্তার বললেন, 'ব্যাঁকা কি আর সহজে এমুখো হবে? কাল মুখ খুলতে গিয়ে যা দাবড়ানি খেয়েছে।'

শ্রীপতিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তা বললে চলবে কেন? বঙ্কুকে যে চাই। রামকানাই, তুমি একবার যাও তো দেখি ধরে নিয়ে আসতে পার কিনা।'

রামকানাই 'চা-টা খেয়েই যাচ্ছি' বলে সবে পেয়ালায় চুমুক দিতে গেছে এমন সময় বঙ্কুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

ঢুকলেন বললে অবিশ্যি কিছুই বলা হল না। একটা ছোটখাটো বৈশাখী ঝড় যেন একটি বেঁটেখাটো মানুষের বেশে প্রবেশ করে সবাইকে থমথমিয়ে দিল।

তারপর ঝড়ের খেলা। প্রথমে পুরো এক মিনিট ধরে বঙ্কুবাবু অট্টহাসি হাসলেন—যে হাসি এর আগে কেউ কোনদিন শোনে নি, তিনি নিজেও শোনেন নি।

তারপর হাসি থামিয়ে একটা প্রচণ্ড গলা-খাঁকরানি দিয়ে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন, "বন্ধুগণ! আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আজ এই আড্ডায় আমার শেষদিন। আপনাদের দলটি ছাড়ার আগে আমি কয়েকটি কথা আপনাদের বলে যেতে চাই এবং তাই আজ এখানে আসা। এক নম্বর—সেটা সকলের সম্বন্ধেই খাটে—আপনারা সবাই বড্ড বাজে বকেন। যে বিষয়ে জানেন না, সে বিষয়ে বেশি কথা বললে লোকে বোকা বলে। দুই নম্বর—এটা চণ্ডীবাবুকে বলছি—আপনাদের বয়সে পরের ছাতা-জুতো লুকিয়ে রাখা শুধু অন্যায় নয়, ছেলেমানুষি। দয়া করে আমার ছাতাটা ও খয়েরি ক্যাম্বিসের জুতোটা কালকের মধ্যে আমার বাড়িতে পেঁছে দেবেন। নিধুবাবু, আপনি যদি আমাকে ব্যাঁকা বলে ডাকেন তবে আমি আপনাকে ছ্যাঁদা বলে ডাকব, আপনাকে সেইটেই মেনে নিতে হবে। আর শ্রীপতিবাবু—আপনি গণ্যমান্য লোক, আপনার মোসাহেবের প্রয়োজন হবে বইকি। কিন্তু জেনে রাখুন যে আজ থেকে আমি আর ও-দলে নেই; যদি বলেন তো আমার পোষা হুলোটাকে পাঠিয়ে দিতে পারি—ভালো পা চাটতে পারে।...ওহো, পঞ্চাবাবুও এসেছেন দেখছি—আপনাকেও খবরটা দিয়ে রাখি—কাল রাত্রে ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে একটি অ্যাং এসে আপনার বাঁশবাগানের ডোবাটির মধ্যে নেমেছিল। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। লোকটি—থুড়ি, অ্যাংটি—ভারি ভালো।"

এই বলে বঙ্কুবাবু তাঁর বাঁ হাত দিয়ে ভৈরব চক্কোত্তির পিঠে একটা চাপড় মেরে বিষম খাইয়ে সদর্পে শ্রীপতিবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই রামকানাই-এর হাত থেকে চা-ভর্তি পেয়ালাটা পড়ে গিয়ে সব্বাই-এর কাপড়ে-চোপড়ে গরম চা ছিটিয়ে চুরমার হয়ে গেল।

বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম

নিউ মার্কেটের কালীচরণের দোকান থেকে প্রতি সোমবার আপিস-ফেরতা বই কিনে বাড়ি ফেরেন বিপিন চৌধুরী। যতরাজ্যের ডিটেকটিভ বই, রহস্যের বই আর ভূতের গল্প। একসঙ্গে অন্তত খান পাঁচেক বই না কিনলে তাঁর এক সপ্তাহের খোরাক হয় না। বাড়িতে তিনি একা মানুষ। লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা তাঁর ধাতে আসে না, আড্ডার বাতিক নেই, বন্ধুপরিজনের সংখ্যাও কম। সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যেসব কাজের লোক আসেন, তাঁরা কাজের কথা সেরে উঠে চলে যান। যাঁরা ওঠেন না বা উঠতে চান না, বিপিনবাবু তাঁদের সোয়া আটটা বাজলেই বলেন—'আমার ডাক্তারের আদেশ আছে—সাড়ে আটটায় খাওয়া সারতে হবে। কিছু মনে করবেন না...'। খাওয়ার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম, তারপর গল্পের বই হাতে নিয়ে সোজা বিছানায়। এই নিয়ম যে কতদিন ধরে চলেছে বিপিনবাবুর নিজেরই তার হিসেব নেই।

আজ কালীচরণের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিপিনবাবুর খেয়াল হল আরেকটি লোক যেন তাঁর পাশে কিছুক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। বিপিনবাবু মুখ তুলে দেখেন একটি গোলগাল অমায়িক চেহারার ভদ্রলোক তাঁরই দিকে চেয়ে হাসছেন।

'আমায় চিনতে পারছেন না বোধহয়?'

বিপিনবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত বোধ করলেন। কই, এঁর সঙ্গে তো কোনদিন আলাপ হয়েছে বলে তাঁর মনে পড়ে না। এমন মুখও তো কোন মনে পড়ছে না তাঁর।

'অবিশ্যি আপনি কাজের মানুষ। অনেক রকম লোকের সঙ্গে দেখা হয় তো রোজ—তাই বোধহয়...'

'আমার কি আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে এর আগে?' বিপিনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

ভদ্রলোক যেন এবার একটু অবাক হয়েই বললেন, 'আজ্ঞে সাতদিন দুবেলা সমানে দেখা হয়েছে। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলুম—সেই গাড়িতে আপনি হুড্রু ফল্‌স দেখতে গেলেন। সেই নাইনটিন ফিফ্‌টি এইটে—রাঁচিতে! আমার নাম পরিমল ঘোষ।'

সত্যজিৎ রায়
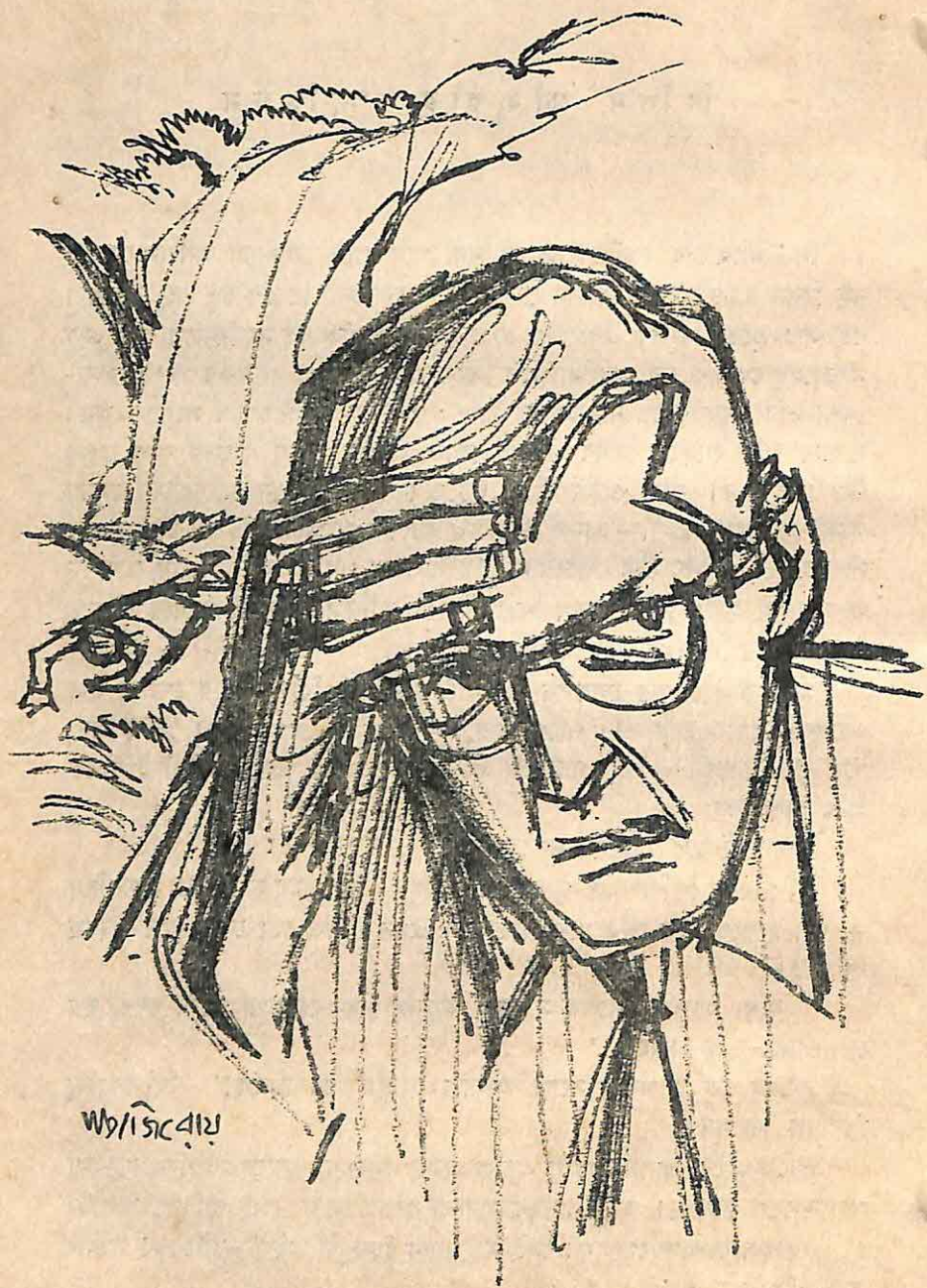
'রাঁচি?' বিপিনবাবু এবার বুঝলেন যে ভুল তাঁর হয় নি, হয়েছে এই লোকটিরই। কারণ বিপিনবাবু কোনদিন রাঁচি যান নি। যাবার কথা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এবার বিপিনবাবু একটু হেসে বললেন, 'আমি কে তা আপনি জানেন কি?'

ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে জিভ কেটে বললেন, 'আপনি কে তা জানব না? বলেন কী? বিপিন চৌধুরীকে কে না জানে?'

বিপিনবাবু এবার বইয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'কিন্তু তাও আপনার ভুল হয়েছে। ওরকম হয় মাঝে মাঝে। আমি রাঁচি যাই নি কখনো।'

ভদ্রলোক এবার বেশ জোরে হেসে উঠলেন।

'কী বলছেন মিস্টার চৌধুরী? ঝরনা দেখতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে আপনার হাঁটু ছড়ে গেল। আমিই শেষটায় আয়োডিন এনে দিলুম। পরদিন নেতারহাট যাবার জন্যে আমি গাড়ি ঠিক করেছিলুম—আপনি পায়ের ব্যথার জন্যে যেতে পারলেন না। কিছু মনে পড়ছে না? আপনার চেনা আরেকজন লোকও তো গেস্‌লেন সেবার—দীনেশ মুখুজ্যে। আপনি ছিলেন একটা বাংলো ভাড়া করে—বললেন হোটেলের খাবার আপনার ভালো লাগে না—তার চেয়ে বাবুর্চি দিয়ে রান্না করিয়ে নেওয়া ভালো। দীনেশ মুখুজ্যে ছিলেন তাঁর বোনের বাড়িতে। আপনাদের দুজনের সেই তর্ক লেগেছিল একদিন চাঁদে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে—মনে নেই? সব ভুলে গেলেন? আরো বলছি—আপনার কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ ছিল—তাতে গল্পের বই থাকত। বাইরে গেলে নিয়ে যেতেন। কেমন—ঠিক কিনা?'

বিপিনবাবু এবার গম্ভীর সংযত গলায় বললেন, 'আপনি ফিফ্‌টি-এইটের কোন্ মাসের কথা বলছেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মহালয়ার ঠিক পরেই। হয় আশ্বিন, নয় কার্তিক।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না। পুজোয় সে বছর আমি ছিলাম কানপুরে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। আপনি ভুল করছেন। নমস্কার।'

কিন্তু ভদ্রলোক গেলেন না। অবাক অপলক দৃষ্টিতে বিপিনবাবুর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলে যেতে লাগলেন, 'কী আশ্চর্য! একদিন সন্ধ্যাবেলা আপনার বাংলোর দাওয়ায় বসে চা খেলুম। আপনি আপনার ফ্যামিলির কথা বললেন—বললেন, আপনার ছেলেপিলে নেই, আপনার স্ত্রী বারো তেরো বছর আগে মারা গেছেন। একমাত্র ভাই পাগল ছিলেন, তাই আপনি পাগলা গারদ দেখতে যেতে চাইলেন না। বললেন, ভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়...'

বিপিনবাবু যখন বইয়ের দামটা দিয়ে দোকান থেকে বেরোচ্ছেন তখনও ভদ্রলোক তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন।

বারট্রাম স্ট্রীটে লাইটহাউস সিনেমার গায়ে বিপিন চৌধুরীর বুইক গাড়িটা

লাগানো ছিল। তিনি গাড়িতে পৌঁছে ড্রাইভারকে বললেন, 'একটু গঙ্গার ধারটায় ঘুরে চলো তো সীতারাম।'

চলন্ত গাড়িতে বসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতেই বিপিনবাবুর আপসোস হল। বাজে ভণ্ড লোকটাকে এতটা সময় কেন মিছামিছি দিলেন তিনি! রাঁচি তো তিনি যান নি, কখনই যেতে পারেন না। মাত্র ছ সাত বছর আগেকার স্মৃতি মানুষে অত সহজে ভুলতেই পারে না, এক যদি না—

বিপিনবাবুর মাথা হঠাৎ বন্ করে ঘুরে গেল।

এক যদি না তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তাই বা হয় কী করে? তিনি তো দিব্যি আপিসে কাজ করে যাচ্ছেন। এত বিরাট আপিস—এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কোথাও তো কোন ত্রুটি হচ্ছে বলে তিনি জানেন না। আজও তো একটা জরুরী মিটিংএ আধঘণ্টার বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। আশ্চর্য! অথচ—

অথচ লোকটা তাঁর এত খবর রাখল কী করে? এ যে একেবারে নাড়ী-নক্ষত্র জেনে বসে আছে। বইয়ের ব্যাগ, স্ত্রীর মৃত্যু, ভাইয়ের মাথা খারাপ! ভুল করেছে কেবল ওই রাঁচির ব্যাপারে। ভুল কেন—জেনেশুনে মিথ্যে বলছে। আটান্ন সালের পুজোয় তিনি রাঁচি যান নি; গিয়েছিলেন কানপুরে, তাঁর বন্ধু হরিদাস বাগচির বাড়িতে। হরিদাসকে লিখলেই—নাঃ, হরিদাসকে লেখার উপায় নেই।

বিপিনবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল হরিদাস বাগচি আজ মাসখানেক হল সস্ত্রীক জাপানে গেছেন তাঁর ব্যাবসার ব্যাপারে। জাপানের ঠিকানা বিপিনবাবু জানেন না। কাজেই চিঠি লিখে প্রমাণ আনানোর রাস্তা বন্ধ।

কিন্তু প্রমাণের প্রয়োজনটাই বা কোথায়। এমন যদি হত যে উনিশ শ আটান্ন সালের আশ্বিন মাসে রাঁচিতে কোন খুনের জন্য পুলিশ তাঁকে দায়ী করার চেষ্টা করছে, তখনই তাঁর চিঠির প্রয়োজন হত হরিদাস বাগচির কাছ থেকে। এখন তো প্রমাণের কোন দরকার নেই। তিনি নিজে জানেন তিনি রাঁচি যান নি। ব্যস্, ল্যাঠা চুকে গেল।

গঙ্গার হাওয়াতে বিপিন চৌধুরীর মাথা অনেক ঠাণ্ডা হলেও, মনের মধ্যে একটা খটকা, একটা অসোয়াস্তিবোধ যেন থেকেই গেল!

হেস্টিংস-এর কাছাকাছি এসে বিপিনবাবু তাঁর প্যাণ্টের কাপড়টা গুটিয়ে উপরে তুলে দেখলেন যে ডান হাঁটুতে একটা এক-ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগ রয়েছে। সেটা কবেকার দাগ তা বোঝবার কোন উপায় নেই। ছেলেবেলা কি কখনও হোঁচট খেয়ে হাঁটু ছড়ে নি বিপিনবাবুর? অনেক চেষ্টা করেও সেটা তিনি মনে করতে পারলেন না।

চড়কডাঙার মোড়ের কাছাকাছি এসে তাঁর দীনেশ মুখুজ্যের কথাটা মনে

পড়ল। লোকটা বলছিল দীনেশ মুখুজ্যে ছিল রাঁচিতে ওই একই সময়ে। তাহলে দীনেশকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়। সে থাকে কাছেই—বেণীনন্দন স্ট্রীট। এখনই যাবেন কি তার কাছে? কিন্তু যদি রাঁচি যাওয়ার ব্যাপারটা মিথ্যেই হয়—তাহলে দীনেশকে সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে তো সে বিপিনবাবুকে পাগল ঠাওরাবে। না না—এ ছেলেমানুষি তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজেকে সেধে সেধে এইভাবে বোকা বানানো কোনমতেই চলতে পারে না। আর দীনেশের বিদ্রূপ যে কত নির্মম হতে পারে তার অভিজ্ঞতা বিপিনবাবুর আছে।...

বাড়ি এসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে ঠাণ্ডা শরবত খেয়ে বিপিনবাবুর উদ্বেগটা অনেক কম বলে মনে হল। যত সব বাউণ্ডুলের দল! নিজেদের কাজকর্ম নেই, তাই কাজের লোকদের ধরে ধরে বিব্রত করা।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে নতুন বইটা পড়তে পড়তে বিপিনবাবু নিউমার্কেটের ভদ্রলোকটির কথা ভুলেই গেলেন।

পরদিন আপিসে কাজ করতে করতে বিপিনবাবু লক্ষ্য করলেন যে যতই সময় যাচ্ছে ততই যেন গতকালের ঘটনাটা তাঁর স্মৃতিতে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে আসছে। সেই গোলগাল মুখ, সেই ঢুলুঢুলু অমায়িক চাহনি, আর সেই হাসি। তাঁর এত ভেতরের খবরই যদি লোকটা নির্ভুল জেনে থাকে, তবে রাঁচির ব্যাপারটায় সে এত ভুল করল কী করে?

লাঞ্চের ঠিক আগে—অর্থাৎ একটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময়—বিপিনবাবু আর থাকতে না পেরে টেলিফোনের ডিরেক্টরিটা খুলে বসলেন। দীনেশ মুখুজ্যেকে ফোন করতে হবে একটা। ফোনই ভালো। অপ্রস্তুত হবার সম্ভাবনাটা কম।

টু-থ্রি-ফাইভ-সিক্স-ওয়ান-সিক্স।

বিপিনবাবু ডায়াল করলেন।

'হ্যালো।'

'কে, দীনেশ? আমি বিপিন কথা বলছি।'

'কী খবর?'

'ইয়ে—ফিফ্‌টি এইটের একটা ঘটনা তোমার মনে আছে কিনা জানবার জন্য ফোন করছি।'

'ফিফ্‌টি এইট? কী ঘটনা?'

'সে বছরটা কি তুমি কলকাতাতেই ছিলে? আগে সেইটে আমার জানা দরকার।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। ফিফ্‌টি এইট—আটান্নো...দাঁড়াও, আমার ডায়রি দেখি! একটু ধরো।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। বিপিনবাবু তাঁর বুকের ভেতর একটা দুরুদুরু কাঁপুনি অনুভব করলেন। প্রায় এক মিনিট পরে আবার দীনেশ মুখুজ্যের গলা পাওয়া গেল।

'হ্যাঁ, পেয়েছি। আমি বাইরে গেস্‌লাম—দু'বার।'

'কোথায়?'

'একবার গেস্‌লাম ফেব্রুয়ারিতে—কাছেই—কেষ্টনগর—আমার এক ভাগনের বিয়েতে। আরেকবার—ও, এটা তো তুমি জানই। সেই রাঁচি। সেই যে যেবার তুমিও গেলে। ব্যস্‌। কিন্তু কেন বলো তো?'

'না। একটা দরকার ছিল। ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ...'

বিপিনবাবু টেলিফোনটা রেখে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তার কান ভোঁ ভোঁ করছে, হাত পা যেন সব কেমন ঠান্ডা হয়ে আসছে। সঙ্গে টিফিনের ব্যাক্সে স্যান্ডউইচ ছিল, সেটা আর তিনি খেলেন না। খাবার কোন ইচ্ছেই হল না। তাঁর খিদে চলে গেছে।

লাঞ্চ টাইম শেষ হয়ে যাবার পর বিপিনবাবু বুঝতে পারলেন, এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে আপিসে বসে কাজ করা অসম্ভব। তাঁর পঁচিশ বছরের কর্মজীবনে এর আগে এরকম কখনো হয় নি। নিরলস কর্মী বলে বিপিনবাবুর একটা খ্যাতি ছিল। কর্মচারীরা তাঁকে বাঘের মতো ভয় করত। যত বিপদই আসুক, যত বড় সমস্যারই সামনে পড়তে হোক, বিপিনবাবুর কোনদিন মতিভ্রম হয় নি। মাথা ঠান্ডা করে কাজ করে সব সময়ে সব বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন তিনি।

আজ কিন্তু তাঁর সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে!

আড়াইটের সময় বাড়ি ফিরে, শোবার ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে মনটাকে প্রকৃতিস্থ করে, কী করা উচিত সেটা ভাববার চেষ্টা করলেন বিপিনবাবু। মানুষ মাথায় চোট খেয়ে বা অন্য কোনরকম অ্যাকসি-ডেন্টের ফলে মাঝে মাঝে পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আর সব মনে আছে, শুধু একটা বিশেষ ঘটনা মনে নেই—এর কোন উদাহরণ তিনি আর কখনও পান নি। রাঁচি যাবার ইচ্ছে তাঁর অনেক দিন থেকেই ছিল। সেই রাঁচিই গেছেন, অথচ গিয়ে ভুলে গেছেন, এ একেবারে অসম্ভব।

বাইরে কোথাও গেলে বিপিনবাবু তাঁর বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু এখন যে বেয়ারাটি আছে সে নতুন লোক। সাত বছর আগে তাঁর বেয়ারা ছিল রামস্বরূপ। তিনি রাঁচি গিয়ে থাকলে সেও নিশ্চয়ই যেত, কিন্তু এখন সে আর নেই, তিন বছর হল নেই।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপিনবাবু একাই কাটালেন তাঁর ঘরে। মনে মনে স্থির

করলেন আজ কেউ এলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না।

সাতটা নাগাদ চাকর এসে খবর দিল তাঁর সঙ্গে ধনী ব্যবসায়ী শেঠ গিরিধারিপ্রসাদ দেখা করতে এসেছেন। জাঁদরেল লোক গিরিধারিপ্রসাদ। কিন্তু বিপিনবাবুর মানসিক অবস্থা তখন এমনই যে তিনি বাধ্য হয়ে চাকরকে বলে দিলেন যে, তাঁর পক্ষে নীচে নামা সম্ভব নয়। চুলোয় যাক গিরিধারিপ্রসাদ!

সাড়ে সাতটায় আবার চাকরের আগমন। বিপিনবাবুর তখন সবে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে, একটা দুঃস্বপ্নের গোড়াটা শুরু হয়েছে, এমন সময় চাকরের ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আবার কে এল? চাকর বলল, চুনিবাবু। বলছে ভীষণ জরুরী দরকার।

দরকার যে কী তা বিপিনবাবু জানেন। চুনি তাঁর স্কুলের সহপাঠী। সম্প্রতি দুরবস্থায় পড়েছে, ক'দিন থেকেই তাঁর কাছে আসছে একটা কোন চাকরির আশায়। বিপিনবাবুর পক্ষে তার জন্যে কিছু করা সম্ভব নয়, তাই প্রতিবারই তিনি তাকে না বলে দিয়েছেন, আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তো চুনি!

বিপিনবাবু অত্যন্ত বিরক্তভাবে চাকরটাকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে শুধু আজ নয়—বেশ কিছু দিন তাঁর পক্ষে চুনির সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না।

চাকর ঘর থেকে চলে যেতেই বিপিনবাবুর খেয়াল হল যে চুনির হয়তো আটান্নর ঘটনা কিছুটা মনে থাকতে পারে। তাকে একবার জিজ্ঞেস করাতে দোষ কী?

বিপিনবাবু তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈঠকখানায় হাজির হলেন। চুনি যাবার জন্য উঠে পড়েছিল, বিপিনবাবুকে নেমে আসতে দেখে সে যেন একটু আশান্বিত হয়েই ঘুরে দাঁড়াল।

বিপিনবাবু ভণিতা না করেই বললেন, 'শোনো চুনি, তোমার কাছে একটা—মানে, একটু বেখাপ্পা প্রশ্ন আছে। তোমার তো স্মরণশক্তি বেশ ভালো ছিল বলে জানি—আর আমার বাড়িতে তো তুমি অনেক বছর ধরেই মাঝে মাঝে যাতায়াত করছ। ভেবে দেখো তো মনে পড়ে কিনা—আমি কি আটান্ন সালে রাঁচি গিয়েছিলাম?'

চুনি বলল, 'আটান্ন? আটান্নই তো হবে। নাকি উনষাট?'

'রাঁচি যাওয়াটা নিয়ে তোমার কোন সন্দেহ নেই?'

চুনি এবার রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

'তোমার কি যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে?'

'আমি গিয়েছিলাম? তোমার ঠিক মনে আছে?'

চুনি যে সোফা থেকে উঠেছিল, সেটাতেই আবার বসে পড়ল। তারপর সে বিপিন চৌধুরীর দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, 'বিপিন, তুমি কি নেশাটেশা ধরেছ নাকি আজকাল? এদিকে তো তোমার কোন বদনাম

ছিল না! তুমি কড়া মেজাজের লোক, পুরোনো বন্ধুদের প্রতি তোমার সহানুভূতি নেই—এসবই তো জানতুম! কিন্তু তোমার তো মাথাটা পরিষ্কার ছিল; অন্তত কিছুদিন আগে অবধি ছিল!'

বিপিনবাবু কম্পিতস্বরে বললেন, 'তোমার মনে আছে আমার যাবার কথা?'

চুনি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা পালটা প্রশ্ন করে বসল। সে বলল—'আমার শেষ চাকরি কী ছিল মনে আছে তোমার?'

'বিলক্ষণ। তুমি হাওড়া স্টেশনে বুকিং ক্লার্ক ছিলে।'

'তোমার সেটা মনে আছে, আর আমিই যে তোমার রাঁচির বুকিং করে দিলাম সেটা মনে নেই? তোমার যাবার দিন তোমার কামরায় গিয়ে দেখা করলাম, ডাইনিং কারে বলে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করে দিলাম, তোমার কামরায় পাখা চলছিল না—সেটা লোক ডেকে চালু করে দিলাম—এসব তুমি ভুলে গেছ? তোমার হয়েছে কী?'

বিপিনবাবু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন।

চুনি বলল, 'তোমার কি অসুখ করেছে? তোমার চেহারাটা তো ভালো দেখছি না।'

বিপিনবাবু বললেন, 'তাই মনে হচ্ছে। ক'দিন কাজের চাপটা একটু বেশি পড়েছিল। দেখি একটা স্পেশালিস্ট-টেশালিস্ট...'

বিপিনবাবুর অবস্থা দেখেই বোধহয় চুনি আর চাকরির উল্লেখ না করে আস্তে আস্তে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

পরেশ চন্দকে ইয়াং ডাক্তারই বলা চলে, চল্লিশের নীচে বয়স, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বিপিনবাবুর ব্যাপার শুনে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিপিনবাবু তাঁকে মরিয়া হয়ে বললেন, 'দেখুন ডক্টর চন্দ, আমার এ ব্যারাম আপনাকে সারিয়ে দিতেই হবে। আপিস কামাই করার ফলে যে কী ক্ষতি হচ্ছে আমার ব্যবসার তা আমি বোঝাতে পারব না। আজকাল তো অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। আমার এ ব্যারামের জন্য কি কিছুই নেই? আমি যত টাকা লাগে দেব। যদি বিদেশ থেকে আনাবার দরকার হয় তারও ব্যবস্থা করব। কিন্তু এ রোগ আপনাকে সারাতেই হবে।'

ডাক্তার একটু ভেবে চিন্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন মিস্টার চৌধুরী? আমার কাছে এ রোগ একেবারে নতুন জিনিস; আমার অভিজ্ঞতার একেবারে বাইরে। তবে একটা মাত্র উপায় আমি বলতে পারি। ফল হবে কিনা জানি না, কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই।'

বিপিনবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলেন।

ডাক্তার বললেন, 'আমার যতদূর মনে হচ্ছে—এবং আমার বিশ্বাস আপনারও এখন তাই ধারণা—যে আপনি সত্যিই রাঁচি গিয়েছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, এই যাওয়ার ব্যাপারটা আপনি বেমালুম ভুলে গেছেন। আমি সাজেস্ট করছি যে আপনি আরেকবার রাঁচি যান। তাহলে হয়তো জায়গাটা দেখে আপনার আগের ট্রিপ-এর কথাটা মনে পড়ে যাবে। এটা অসম্ভব নয়। আজ এই মুহূর্তে তো বেশি কিছু করা সম্ভব নয়! আমি আপনাকে একটি বড়ি লিখে দিচ্ছি—সেটা খেলে হয়তো ঘুমটা হবে। ঘুমটা দরকার, তা নাহলে আপনার অশান্তি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অসুখও বেড়ে যাবে। আপনি একটা কাগজ দিন, আমি ওষুধটা লিখে দিচ্ছি।'

বড়ির জন্যেই হোক, বা ডাক্তারের পরামর্শের জন্যেই হোক, বিপিনবাবু পরদিন সকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করলেন।

প্রাতঃকালীন জলযোগ সেরে আপিসে টেলিফোন করে কিছু ইন্‌স্ট্রাকশন দিয়ে সেইদিনই রাত্রের জন্য রাঁচির টিকিট কিনলেন।

পরদিন রাঁচি স্টেশনে নেমেই তিনি বুঝলেন এ জায়গায় তিনি কস্মিন-কালেও আসেন নি।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি করে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে বুঝলেন যে এখানের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মোরাবাদি পাহাড়, হোটেল, বাংলো, কোনটার সঙ্গেই তাঁর বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই। হুড্রু ফল্‌স কি তিনি চিনতে পারবেন? জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখলেই কি তাঁর পুরোনো কথা সব মনে পড়ে যাবে?

নিজে সে কথা বিশ্বাস না করলেও, পাছে কলকাতায় ফিরে অনুতাপ হয় তাই একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দুপুরের দিকে হুড্রুর দিকে রওনা দিলেন।

সেইদিনই বিকেল পাঁচটার সময় হুড্রুতে একটি পিকনিকের দলের দুটি গুজরাটি ভদ্রলোক বিপিনবাবুকে অজ্ঞান অবস্থায় একটি পাথরের ঢিপির পাশে আবিষ্কার করল। এই দুই ভদ্রলোকের শুশ্রূষার ফলে জ্ঞান ফিরে পেতেই বিপিনবাবু প্রথম কথা বললেন—'আমি রাঁচি আসি নি। আমার সব গেল! আর কোন আশা নেই...'

পরদিন সকালে বিপিন চৌধুরী কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি বুঝে-ছিলেন যে যদি না তিনি এই রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পারেন, তবে তাঁর আর সত্যই কোনো আশা নেই। তাঁর কর্মক্ষমতা, তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর উৎসাহ বুদ্ধি বিবেচনা সবই তিনি ক্রমে ক্রমে হারাবেন। শেষে কি তাহলে তাঁকে সেই রাঁচির...?

এর পরে আর বিপিনবাবু ভাবতে পারেন না, ভাবতে চান না।...

বাড়ি ফিরে কোনরকমে স্নান করে মাথায় বরফের থলি চাপা দিয়ে বিপিন চৌধুরী শয্যা নিলেন। চাকরকে বললেন ডাক্তার চন্দকে ডেকে নিয়ে আসতে। চাকর যাবার আগে তাঁর হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল, কে জানি ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে গেছে। সবুজ খাম, তার উপর লাল কালিতে লেখা—'শ্রীবিপিনবিহারী চৌধুরী। জরুরী, একান্ত ব্যক্তিগত।'

অসুস্থতা সত্ত্বেও বিপিনবাবুর কেন জানি মনে হল যে চিঠিটা তার পড়া দরকার। খাম খুলে দেখেন এই চিঠি—

'প্রিয় বিপিন,

হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কুফল যে তোমার মধ্যে এভাবে দেখতে পাব তা আশা করি নি। একজন দুঃস্থ বাল্যবন্ধুর জন্য একটা উপায় করে দেওয়া কি সত্যিই তোমার পক্ষে এত অসম্ভব ছিল? আমার টাকা নেই, তাই ক্ষমতা সামান্যই। যে জিনিসটা আছে আমার সেটা হল কল্পনাশক্তি। তারই সামান্য কিছুটা খরচ করে তোমার উপর সামান্য প্রতিশোধ নিলাম।

নিউমার্কেটের সেই ভদ্রলোকটি আমার প্রতিবেশী; বেশ ভালো অভিনেতা। দীনেশ মুখুজ্যে তোমার প্রতি সদয় নন, তাই তাকে হাত করতে কোন অসুবিধা হয় নি। হাঁটুর দাগটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে—সেই চাঁদপাল ঘাটে আছাড় খাওয়া—উনিশ শ ছত্রিশ সনে?...

আর কী? এবার সেরে উঠবে। আমার একটি উপন্যাস এক প্রকাশকের পছন্দ হয়েছে। কয়েকটা মাস তাতেই কোনরকমে চালিয়ে নেব। ইতি।

তোমার বন্ধু চুনিলাল'

ডাক্তার চন্দ আসতেই বিপিনবাবু বললেন, 'ভালো আছি। রাঁচি স্টেশনে নেমেই সব মনে পড়ে গেল।'

ডাক্তার বললেন, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ! আপনার কেসটা একটা ডাক্তারি জার্নালে ছাপিয়ে দেব ভাবছি।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আপনাকে যেই জন্য ডাকা—দেখুন তো, আমার কোমরের হাড়টাড় ভাঙল কিনা। রাঁচিতে হোঁচট খেয়েছিলাম। টনটন করছে।'

দুই ম্যাজিশিয়ান

'পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো।'

সুরপতি ট্রাঙ্কগুলো গুনে নিয়ে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অনিলের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক আছে। দাও, পাঠিয়ে দাও সব ব্রেকভ্যানে। আর মাত্র পঁচিশ মিনিট।'

অনিল বলল, 'আপনার গাড়িও ঠিক আছে স্যার। কুপে। দুটো বার্থই আপনার নামে নেওয়া আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।' তারপর মুচকি হেসে বলল, 'গার্ডসাহেবও আপনার একজন ভক্ত। নিউ এম্পায়ারে দেখেছেন আপনার শো। এই যে স্যার—আসুন এদিকে!'

গার্ড বীরেন বকশি মশাই একগাল হেসে এগিয়ে এসে তাঁর ডান হাতখানা সুরপতির দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'আসুন স্যার, যে-হাতের সাফাই দেখে এত আনন্দ পেইচি, সে-হাত একবারটি শেক করে নিজেকে কেতাত্থ করি!'

সুরপতি মণ্ডলের এগারোটি ট্রাঙ্কের যে-কোন একটির দিকে চাইলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'Mondol's Miracles' কথাটা পরিষ্কার বড় বড় অক্ষরে লেখা প্রতিটি ট্রাঙ্কের পাশে এবং ঢাকনার উপর। এর বেশি আর পরিচয়ের দরকার নেই—কারণ ঠিক দু মাস আগেই কলকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে মণ্ডলের জাদুবিদ্যার প্রমাণ পেয়ে দর্শক বার বার করধ্বনি করে তাদের বাহবা জানিয়েছে। খবরের কাগজেও প্রশংসা হয়েছে প্রচুর। এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম ভিড়ের ঠেলায় চলেছে চার সপ্তাহ। তাও যেন লোকের আশ মেটে নি। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই মণ্ডলকে কথা দিতে হয়েছে যে বড়দিনের ছুটিতে আবার শো করবে সে।

'কোনো অসুবিধে-টসুবিধে হলে বলবেন স্যার।'

গার্ডসাহেব সুরপতিকে তাঁর কামরায় তুলে দিলেন। সুরপতি এদিকে ওদিকে দেখে নিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বেশ কামরা।

'আচ্ছা স্যার, তাহলে...'

'অনেক ধন্যবাদ!'

গার্ড চলে যাবার পর সুরপতি তার বেঞ্চের কোণে জানালার পাশটায়

ঠেস দিয়ে বসে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করল। এই বোধহয় তার বিজয়-অভিযানের শুরু। উত্তর প্রদেশ : দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাশী, লক্ষ্মৌ। এ যাত্রা এই ক'টিই—তারপর আরো কত প্রদেশ পড়ে আছে, কত নগর কত উপনগর। আর শুধু কি ভারতবর্ষই? তার বাইরেও যে জগৎ রয়েছে একটা—বিরাট বিস্তীর্ণ জগৎ। বাঙালী বলে কি আর অ্যাম্বিশন নেই? সুরপতি দেখিয়ে দেবে। এককালে যে-দেশের জাদুকর হুডিনির কথা পড়ে তার গায়ে কাঁটা দিত, সেই আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে তার খ্যাতি। বাংলার ছেলের দৌড় কতখানি, তা সে প্রমাণ করবে বিশ্বের লোকের কাছে। যাক না ক'টা বছর। এ তো সবে শুরু।

অনিল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, 'সব ঠিক আছে স্যার। এভরিথিং।'

'তালাগুলো চেক করে নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'গুড।'

'আমি দুটো বোগি পরেই আছি।'

'লাইন ক্লিয়ার দিয়েছে?'

'এই দিল বলে। আমি চলি।...বর্ধমানে চা খাবেন কি?'

'হলে মন্দ হয় না।'

'আমি নিয়ে আসব'খন।'

অনিল চলে গেল। সুরপতি সিগারেটটা ধরিয়ে জানালার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কুলি যাত্রী ফেরিওয়ালার দু-মুখো কলমুখর স্রোত বয়ে চলেছে। সুরপতি সেদিকে দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। স্টেশনের কোলাহল মিলিয়ে এল। মনটা তার চলে গেল অনেক দূরে, অনেক পিছনে। এখন তার বয়স তেত্রিশ, তখন সাত কি আট। দিনাজপুর জেলার ছোট একটি গ্রাম—পাঁচপুকুর। শরতের এক শান্ত দুপুর। এক বুড়ী চটের থলি নিয়ে বসেছে বটতলায় মতি মুদির দোকানের ঠিক সামনে। তাকে ঘিরে ছেলেবুড়োর ভিড়। কত বয়স বুড়ীর? ষাটও হতে পারে, নব্বুইও হতে পারে। তোবড়ানো গালে অজস্র হিজিবিজি বলিরেখা, হাসলেই সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। আর ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথার খই ফুটছে।

ভানুমতীর খেল!

ভানুমতীর খেল দেখিয়েছিল বুড়ী। সেই প্রথম আর সেই শেষ। কিন্তু যা দেখেছিল তা সুরপতি কোনদিন ভোলেও নি, ভুলবেও না। তার নিজের ঠাকুরমার বয়সও তো পঁয়ষট্টি; ছুঁচে সুতো পরাতে গেলে সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপে। আর ওই বুড়ীর কুঁকড়োনো হাতে এত জাদু! চোখের সামনে নাকের

সামনে হাত-দুহাতের মধ্যে জিনিসপত্তর সব ফুসমন্তরে উধাও করে দিচ্ছে, আবার পরক্ষণেই ফুসমন্তরে বার করে দিচ্ছে—টাকা, মার্বেল, লাট্টু, সুপুরি, পেয়ারা! কালুকাকার কাছ থেকে একটা টাকা নিয়ে বুড়ী ভ্যানিশ করে দিল, তাতে কাকার কী রাগ আর তম্বি! তারপর খিলখিল হাসি হেসে বুড়ী যখন আবার সেটি বার করে ফেরত দিল, তখন কাকার চোখ ছানাবড়া।

সুরপতির বেশ কিছুদিন ভালো করে ঘুম হয় নি এই ম্যাজিক দেখে। আর তারপর যখন ঘুমিয়েছে তখনও নাকি মাস কয়েক ধরে মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে ম্যাজিক-ম্যাজিক বলে চেঁচিয়ে উঠেছে।

এর পরে গাঁয়ে যখনই মেলা-টেলা বসেছে, সুরপতি ম্যাজিক দেখার আশায় ধাওয়া করেছে সেখানে। কিন্তু তেমন অবাক-করা কিছুই আর চোখে পড়ে নি।

ষোলো বছর বয়সে সুরপতি চলে আসে কলকাতার বিপ্রদাস স্ট্রীটে কাকার বাড়িতে থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পড়বে বলে। কলেজের বইয়ের সঙ্গে পড়া চলেছিল ম্যাজিকের বই। কলকাতায় আসার দু-এক মাসের মধ্যেই সুরপতি সেসব বই কিনে নিয়েছিল, আর কেনার কিছুদিনের মধ্যেই বইয়ের সব ম্যাজিকই তার শেখা হয়ে গিয়েছিল। তাসের প্যাকেট কিনতে হয়েছিল অনেকগুলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক অভ্যাস করতে হয়েছিল তাকে। কলেজের সরস্বতী পুজোয়, বন্ধুবান্ধবের জন্মদিন-টন্মদিনে সুরপতি এসব ম্যাজিক মাঝে মাঝে দেখাত।

সে যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, তখন তার বন্ধু গৌতমের বোনের বিয়েতে তার নেমন্তন্ন হয়। সুরপতির ম্যাজিক শেখার ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় দিন, কারণ এই বিয়েবাড়িতেই তার প্রথম দেখা হয় ত্রিপুরাবাবুর সঙ্গে। সুইনহো স্ট্রীটের বিরাট বাড়ির পিছনের মাঠে শামিয়ানা পড়েছে; তারই এক কোণে একটি ফরাসে অতিথি-অভ্যাগত-পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন ত্রিপুরা-চরণ মল্লিক। হঠাৎ দেখলে নেহাত নগণ্য লোক বলেই মনে হয়। বছর আটচল্লিশ বয়স, কোঁকড়ানো টেরিকাটা চুল, হাসি-হাসি মুখ, ঠোঁটের দু কোণে পানের দাগ। রাস্তায় ঘাটে এরকম কত লোক দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তার ঠিক সামনেই ফরাসের উপর যে কাণ্ডটা ঘটছে সেটা দেখলে লোকটির সম্বন্ধে মত পালটাতে হয়। সুরপতি প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারে নি। একটা রুপোর আধুলি গড়িয়ে গড়িয়ে তিন হাত দূরে রাখা একটি সোনার আংটির কাছে গেল, তারপর আংটিটাকে সঙ্গে নিয়ে আবার গড়গড়িয়ে ত্রিপুরাবাবুর কাছেই ফিরে এল। সুরপতি এতই হতভম্ব যে তার হাততালি দেবারও সামর্থ্য নেই। এদিকে পর মুহূর্তেই আবার আরেক তাজ্জব জাদু। গৌতমের জ্যাঠামশাই ম্যাজিক দেখতে দেখতে চুরুট ধরাতে গিয়ে তাঁর

দেশলাইয়ের কাঠি সব বাক্স থেকে মাটিতে ফেলে বসলেন। তাঁকে উপড়ে হতে দেখে ত্রিপুরাবাবু বললেন, 'আপনি আর কষ্ট করে ওগুলো তুলছেন কেন স্যার? আমাকে দিন। আমি তুলে দিচ্ছি।'

তারপর কাঠিগুলো ফরাসের এক কোণে স্তূপ করে রেখে নিজের বাঁ হাতে বাক্সটা নিয়ে ত্রিপুরাবাবু ডাকতে লাগলেন—'আঃ তুতুতু—আঃ আঃ আঃ...' আর কাঠিগুলো ঠিক পোষা বেড়াল-কুকুরের মতোই একে একে গুটি গুটি এসে বাক্সের ভিতর ঢুকে যেতে লাগল।

সেই রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর সুরপতি ভদ্রলোককে একটু একা পেয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে। সুরপতির ম্যাজিকে আগ্রহ দেখে ভদ্রলোক খুবই অবাক হন। বলেন, 'বাঙালীরা ম্যাজিক দেখেই খালাস, দেখাবার লোক তো কই বড় একটা দেখি না। তোমার এদিকে ইন্টারেস্ট দেখে আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি।'

এর দুদিন পরেই সুরপতি ত্রিপুরাবাবুর বাড়ি যায়। বাড়ি বললে ভুল হবে। মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি মেস-বাড়ির একটি জীর্ণ ছোট্ট ঘর। অভাব-অনটনের এমন স্পষ্ট চেহারা সুরপতি আর দেখে নি। ভদ্রলোক সুরপতিকে তাঁর জীবিকার কথা বলেছিলেন। পঞ্চাশ টাকা করে ম্যাজিক দেখানোর 'ফী' তাঁর। মাসে দুটো করে বায়না জোটে কিনা সন্দেহ। চেষ্টায় হয়তো আরো কিছুটা হতে পারত, কিন্তু সুরপতি বুঝেছিল ভদ্রলোকের সে চেষ্টাই নেই। এত গুণী লোকের এমন অ্যাম্বিশনের অভাব হতে পারে সুরপতি তা ভাবতে পারে নি। এর উল্লেখ করাতে ভদ্রলোক বললেন, 'কী হবে? ভালো জিনিসের কদর করবে কেউ এ পোড়া দেশে? ক'টা লোক সত্যিকারের আর্ট বোঝে? খাঁটি আর মেকির তফাত ক'টা লোকে ধরতে পারে? সেদিন যে বিয়ের আসরের ম্যাজিক তুমি এত তারিফ করলে, কই, আর তো কেউ করল না! যেই খবর এল পাত পড়েছে, সব সুড়সুড় করে চলে গেল ম্যাজিক ছেড়ে পেটপুজো করতে।'

সুরপতি কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে অনুষ্ঠানে ত্রিপুরাবাবুর ম্যাজিকের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। কিছুটা কৃতজ্ঞতা এবং বেশিটাই একটা স্বাভাবিক স্নেহবশত ত্রিপুরাবাবু সুরপতিকে তাঁর ম্যাজিক শেখাতে রাজী হয়েছিলেন। সুরপতি টাকার কথা তোলাতে তিনি তীব্র আপত্তি করেন। বলেন, 'তুমি ও কথা তুলো না। আমার একজন উত্তরাধিকারী হল, এইটেই বড় কথা। তোমার যখন এত শখ, এত উৎসাহ, তখন আমি শেখাব। তবে তাড়াহুড়ো কোরো না। এটা একটা সাধনা। তাড়াহুড়োয় কিছু হবে না। ভালো করে শিখে নিলে একটা সৃষ্টির আনন্দ পাবে। খুব বেশি টাকা বা খ্যাতির আশা কোরো না। অবিশ্যি আমার দুর্দশা তোমার কোনদিনই হবে না, কারণ তোমার

মধ্যে অ্যাম্বিশন আছে, আমার নেই...'

সুরপতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সব ম্যাজিক শেখাবেন তো? ওই আধুলি আর আংটির ম্যাজিকটাও শেখাবেন তো?'

ত্রিপুরাবাবু হেসে বলেছিলেন, 'ধাপে ধাপে উঠতে হবে। ব্যস্ত হোয়ো না। লেগে থাকো। সাধনা চাই। এসব পুরাকালের জিনিস। মানুষের মনে যখন সত্যিকারের জোর ছিল, একাগ্রতা ছিল, তখন উদ্ভব হয় এসব ম্যাজিকের। আজকের মানুষের পক্ষে মনকে সে-স্তরে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। আমার কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে জান?'

ত্রিপুরাবাবুর কাছে যখন প্রায় ছ মাস তালিম নেওয়া হয়ে গেছে সেই সময় একটা ব্যাপার ঘটে।

একদিন কলেজ যাবার পথে সুরপতি চৌরঙ্গীর দিকে লক্ষ্য করল চারিদিকে দেয়ালে, ল্যাম্পপোস্টে আর বাড়ির গায়ে রঙীন বিজ্ঞাপন পড়েছে—'শেফাল্লো দি গ্রেট।' কাছে গিয়ে বিজ্ঞাপন পড়ে সুরপতি বুঝল শেফাল্লো একজন বিখ্যাত ইতালীয় জাদুকর—কলকাতায় আসছেন তাঁর খেলা দেখাতে। সঙ্গে আসছেন সহজাদুকরী মাদাম প্যালার্মো।

নিউ এম্পায়ারেই এক টাকার গ্যালারিতে বসে শেফাল্লোর ম্যাজিক দেখেছিল সুরপতি। আশ্চর্য চোখ-ধাঁধানো মন-ধাঁধানো ম্যাজিক সব। এতদিন এসব ম্যাজিকের কথা সুরপতি কেবল বইয়েই পড়েছে। চোখের সামনে গোটা গোটা মানুষ ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার আলাদিনের প্রদীপের ভেল্কির মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। একটি মেয়েকে কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরে বাক্সটাকে করাত দিয়ে কেটে আধখানা করে দিলেন শেফাল্লো, আবার পাঁচ মিনিট পরেই মেয়েটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল অন্য আরেকটা বাক্সের ভিতর থেকে—তার গায়ে একটি আঁচড়ও নেই। সুরপতির হাতের তেলো সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিল হাততালির চোটে।

আর শেফাল্লোকে লক্ষ্য করে বার বার অবাক হচ্ছিল সেদিন সুরপতি। লোকটা যেমন জাদুকর, তেমনি অভিনেতা। পরনে কালো চকচকে সুট, হাতে ম্যাজিক-ওয়াণ্ড, মাথায় টপ-হ্যাট। সেই হ্যাটের ভিতর থেকে জাদুবলে কীই না বার করলেন শেফাল্লো। একবার খালি হ্যাটে হাত ঢুকিয়ে কান ধরে একটা খরগোশ টেনে বার করলেন। বেচারা সবে কানঝাড়া শেষ করেছে এমন সময় বেরোল পায়রা—এক, দুই, তিন, চার। ফরফর করে স্টেজের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল ম্যাজিক পায়রা। ওদিকে শেফাল্লো ততক্ষণে সেই একই হ্যাটের ভিতর থেকে চকোলেট বের করে দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

আর এর সবকিছুর সঙ্গেই চলেছে শেফাল্লোর কথা। যাকে বলে কথার তুবড়ি। সুরপতি বইয়ে পড়েছিল যে একে বলে 'প্যাটার'। এই 'প্যাটার' হল ম্যাজিশিয়ানদের একটা প্রধান অবলম্বন। দর্শক যখন এই প্যাটারের স্রোতে নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন, ম্যাজিশিয়ান সেই ফাঁকে হাতসাফাইয়ের আসল কাজ-গুলো সেরে নিচ্ছেন।

কিন্তু এর আশ্চর্য ব্যতিক্রম হলেন মাদাম প্যালার্মো। তাঁর মুখে একটি কথা নেই। নির্বাক কলের পুতুলের মতো খেলা দেখিয়ে গেলেন তিনি। তাহলে তাঁর হাতসাফাইগুলো হয় কোন্ ফাঁকে? এর উত্তরও সুরপতি পরে জেনেছিল। স্টেজে এমন ম্যাজিক দেখানো সম্ভব যাতে হাত সাফাইয়ের কোন প্রয়োজন হয় না। সেসব ম্যাজিক নির্ভর করে কেবল যন্ত্রের কারসাজির উপর এবং সেসব যন্ত্র চালানোর জন্য স্টেজের কালো পর্দার পিছনে লোক থাকে। মানুষকে দুভাগে ভাগ করে কেটে আবার জুড়ে দেওয়া, বা ধোঁয়ার ভিতর অদৃশ্য করে দেওয়া—এসবই কলকব্জার ব্যাপার। তোমার যদি পয়সা থাকে, তুমিও সেই সব কলকব্জা কিনে বা তৈরি করিয়ে সেই সব ম্যাজিক দেখাতে পার। অবিশ্যি ম্যাজিকগুলো জমিয়ে, রসিয়ে সাজপোশাকের বাহারে চিত্তাকর্ষক করে দেখানোর মধ্যেও একটা বাহাদুরি আছে, আর্ট আছে। সবাইয়ের সে আর্ট জানা নেই, কাজেই পয়সা থাকলেই বড় ম্যাজিশিয়ান হওয়া যায় না। সবাই কি আর—

সুরপতির স্মৃতিজাল হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ট্রেনটা একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়েছে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজা খুলে কামরার মধ্যে ঢুকেছে—এ কী! সুরপতি হাঁ-হাঁ করে উঠে বাধা দিতে গিয়ে থমকে থেমে গেল।

এ যে সেই ত্রিপুরাবাবু! ত্রিপুরাচরণ মল্লিক!

এরকম অভিজ্ঞতা সুরপতির আরো কয়েকবার হয়েছে। একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে হয়তো অনেককাল দেখা নেই। হঠাৎ একদিন তাঁর কথা মনে পড়ল বা তাঁর বিষয় আলোচনা হল, আর পরমুহূর্তেই সশরীরে সেই লোক এসে হাজির।

কিন্তু তাও সুরপতির মনে হল যে ত্রিপুরাবাবুর আজকের এই আবির্ভাবটা যেন আগের সব ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে।

সুরপতি কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারল না। ত্রিপুরাবাবু ধুতির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে হাতের একটা পোঁটলা মেঝেতে রেখে সুরপতির বেঞ্চের বিপরীত কোণটাতে বসলেন। তারপর সুরপতির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'অবাক লাগছে, না?'

সুরপতি কোনমতে ঢোক গিলে বলল, 'অবাক মানে—প্রথমত, আপনি যে

বেঁচে আছেন তাই আমার ধারণা ছিল না।'

'কী রকম?'

'আমি আমার বি. এ. পরীক্ষার কিছুদিন পরেই আপনার মেসে যাই। গিয়ে দেখি তালা বন্ধ। ম্যানেজারবাবু—নাম ভুলে গেছি—বললেন যে আপনি নাকি গাড়ি চাপা পড়ে...'

ত্রিপুরাবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'সেরকম হলে তো বেঁচেই যেতাম! অনেক ভাবনাচিন্তা থেকে রেহাই পেতাম।'

সুরপতি বলল, 'আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—আমি এই কিছুক্ষণ আগেই আপনার কথা ভাবছিলাম।'

'বল কী?' ত্রিপুরাবাবুর চোখেমুখে যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। 'আমার কথা ভাবছিলে? এখনো ভাব আমার কথা? শুনে আশ্চর্য হলাম।'

সুরপতি জিভ কাটল। 'এটা আপনি কী বলছেন ত্রিপুরাবাবু! আমি কি অত সহজে ভুলি? আমার হাতেখড়ি যে আপনার হাতেই। আজ বিশেষ করে পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল। আজ বাইরে যাচ্ছি 'শো' দিতে। এই প্রথম বাংলার বাইরে।—আমি যে এখন পেশাদারী ম্যাজিশিয়ান তা আপনি জানেন কি?'

ত্রিপুরাবাবু মাথা নাড়লেন।

'জানি। সব জানি। সব জেনেশুনেই, তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই আজ এসেছি। এই বারো বছর তুমি কী করেছ না করেছ, কী ভাবে তুমি বড় হয়েছ, এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছ—এর কোনোটাই আমার অজানা নেই। সেদিন নিউ এম্পায়ারে ছিলাম আমি, প্রথম দিন। একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে। সবাই তোমার কলাকৌশল কেমন অ্যাপ্রিসিয়েট করল তা দেখলাম। কিছুটা গর্ব হচ্ছিল বটেই। কিন্তু—'

ত্রিপুরাবাবু থেমে গেলেন। সুরপতিও কিছু বলার খুঁজে পেল না। কীই বা বলবে সে? ত্রিপুরাবাবু যদি কিছুটা ক্ষুণ্ণ বোধ করেন তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সত্যিই উনি গোড়াপত্তনটা না করিয়ে দিলে সুরপতির আজ এতটা উন্নতি হত না। আর তার প্রতিদানে সুরপতি কীই বা করেছে? বরং উলটে এই বারো বছরে ক্রমশ তার মন থেকে ত্রিপুরাবাবুর স্মৃতি মুছে এসেছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাবটাও যেন কমে এসেছে।

ত্রিপুরাবাবু আবার শুরু করলেন, 'গর্ব আমার হয়েছিল তোমার সেদিনের সাক্সেস দেখে। কিন্তু তার সঙ্গে আপসোসও ছিল। কেন জান? তুমি যে রাস্তা বেছে নিয়েছ, সেটা খাঁটি ম্যাজিকের রাস্তা নয়। তোমার ব্যাপারটা অনেকখানি লোকভুলানো রং-তামাশা, অনেকখানি যন্ত্রের কৌশল। তোমার নিজের কৌশল নয়। অথচ আমার ম্যাজিক মনে আছে তোমার?'

সুরপতি ভোলে নি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে ছিল তার যে ত্রিপুরাবাবু যেন তাঁর সেরা ম্যাজিকগুলো তাকে শেখাতে দ্বিধা বোধ করতেন। তিনি বলতেন, 'এখনো সময় লাগবে।' সেই সময় আর কোনদিন আসে নি। তার আগেই এসে পড়ল শেফাল্লো, আর তার দু মাসের মধ্যেই ত্রিপুরাবাবু উধাও।

কিছুটা বিস্ময় ও কিছুটা আপসোস সুরপতির হয়েছিল সেদিন—মেসে গিয়ে ত্রিপুরাবাবুকে না পেয়ে। কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী। কারণ তখনও তার মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে শেফাল্লো। শেফাল্লোর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে সে অনেক স্বপ্নজাল বোনে। দেশে দেশে ম্যাজিক দেখিয়ে রোজগার করবে, নাম করবে, লোককে আনন্দ দেবে, লোকের হাততালি পাবে, বাহবা পাবে।

ত্রিপুরাবাবু অন্যমনস্কভাবে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। সুরপতি তাঁকে একবার ভালো করে দেখল। ভদ্রলোককে সত্যিই দুঃস্থ বলে মনে হচ্ছে। মাথার চুল প্রায় সমস্ত পেকে গেছে, গালের চামড়া আলগা হয়ে এসেছে, চোখ ঢুকে গেছে কোটরের ভিতরে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি কি ম্লান হয়েছে কিছু? মনে তো হয় না। আশ্চর্য তীক্ষ্ন চাহনি ভদ্রলোকের।

ত্রিপুরাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অবিশ্যি তুমি কেন এ পথ বেছে নিয়েছ জানি। আমি জানি তুমি বিশ্বাস কর—হয়তো আমিই তার জন্য কিছুটা দায়ী—যে খাঁটি জিনিসের কদর নেই। স্টেজে ম্যাজিক চালাতে গেলে একটু চটক চাই, চাকচিক্য চাই। তাই নয় কি?'

সুরপতি অস্বীকার করল না। শেফাল্লো দেখার পর থেকেই তার এ ধারণা হয়েছিল। কিন্তু জাঁকজমক মানেই কি খারাপ? আজকাল দিনকাল বদলেছে। বিয়ের আসরে ফরাসের উপর বসে ম্যাজিক দেখিয়ে কীই বা রোজগার করবে তুমি, আর কেই বা জানবে তোমার নাম? ত্রিপুরাবাবুর অবস্থাটা তো সে নিজের চোখেই দেখেছে। খাঁটি ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে যদি মানুষের পেট না চলে তো সে ম্যাজিকের সার্থকতা কোথায়?

সুরপতি ত্রিপুরাবাবুকে শেফাল্লোর কথা বলল। যে-জিনিস হাজার হাজার দর্শক দেখে আনন্দ পাচ্ছে, তারিফ করছে, তার কি কোনই সার্থকতা নেই? খাঁটি ম্যাজিক তো সুরপতি অশ্রদ্ধা করছে না। কিন্তু সে পথে কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই সুরপতি এই পথ বেছে নিয়েছে।

ত্রিপুরাবাবু হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বেঞ্চির উপর পা তুলে দিয়ে তিনি সুরপতির দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

'শোনো সুরপতি, তুমি যদি সত্যিই বুঝতে পারতে আসল ম্যাজিক কী জিনিস তাহলে তুমি নকলের পিছনে ধাওয়া করতে না। হাতসাফাই তো ওর শুধু একটা মাত্র অঙ্গ। অবিশ্যি তারও যে কত শ্রেণীবিভাগ আছে তার শেষ

নেই। যৌগিক ক্রিয়ার মতো সেসব সাফাই মাসের পর মাস বছরের পর বছর অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু এ ছাড়াও তো আরো কত কী আছে। হিপ্নটিজ্‌ম! কেবল চোখের চাহনির জোরে মানুষকে সম্পূর্ণ তোমার বশে এনে ফেলতে পারবে। এমন বশ করবে যে সে তোমার হাতে কাদা হয়ে যাবে। তারপর ক্লেয়ারভয়েন্স, বা টেলিপ্যাথি, বা থটরীডিং। অপরের চিন্তার জগতে তুমি অবাধ চলাফেরা করতে পারবে। একজনের নাড়ী টিপে বলে দেবে সে কী ভাবছে। তেমন তেমন শেখা হয়ে গেলে পরে তাকে স্পর্শও করতে হবে না। কেবল মিনিট খানেক তার চোখের দিকে চেয়ে থাকলেই তার মনের কথা পেটের কথা সব জেনে ফেলবে। এসব কি কম ম্যাজিক? জগতের সব সেরা ম্যাজিকের মূলে হচ্ছে এইসব জিনিস। এতে কলকব্জার কোন ব্যাপারই নেই। আছে শুধু সাধনা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা।'

ত্রিপুরাবাবু দম নেবার জন্য থামলেন। ট্রেনের শব্দের জন্য তাঁকে গলা উঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল। তাতে বোধ হয় তিনি আরো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবারে তিনি সুরপতির দিকে আরো এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি তোমাকে এর সব কিছুই শেখাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি গ্রাহ্য করলে না। তোমার তর সইল না। একজন বিদেশী বুজরুকের বাইরের জাঁকজমক তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিল। আসল পথ ছেড়ে যে পথে চট করে অর্থ হয়, খ্যাতি হয়, সেই পথে চলে গেলে তুমি।'

সুরপতি নির্বাক। সত্যি করে এর কোন অভিযোগেরই প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

ত্রিপুরাবাবু এবার সুরপতির কাঁধে একটা হাত রেখে গলার স্বর একটু নরম করে বললেন: 'আমি তোমার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি সুরপতি। আমায় দেখে বুঝেছ কিনা জানি না—আমার অবস্থা খুবই খারাপ। এত জাদু জানি, কিন্তু টাকা করার জাদুটা এখনও অজানা রয়ে গেছে। অ্যাম্বিশনের অভাবই আমার কাল হয়েছে, নাহলে কি আর আমার অন্নচিন্তা করতে হয়? আমি এখন মরিয়া হয়েই এসেছি তোমার কাছে সুরপতি। আমি নিজে যে নিজের পায়ে দাঁড়াব সে শক্তি আর নেই, বয়সও নেই। কিন্তু আমার এটুকু বিশ্বাস আছে যে আমার এ দুর্দিনে তুমি আমাকে—কিছুটা স্যাক্রিফাইস করেও—সাহায্য করবে। ব্যস্—তারপর আর আমি তোমাকে বিরক্ত করব না।'

সুরপতির মনটা ধাঁধিয়ে উঠল। কী সাহায্য চাইছেন ভদ্রলোক?

ত্রিপুরাবাবু বলে চললেন, 'তোমার কাছে হয়তো প্ল্যানটা একটু রূঢ় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। মুশকিল হচ্ছে কি, আমার যে শুধু টাকারই প্রয়োজন তা নয়। বুড়ো বয়সে একটা নতুন শখ হয়েছে, জান। একসঙ্গে অনেকগুলো লোকের সামনে আমার সেরা খেলাগুলো একবার দেখাতে

ইচ্ছে করছে। হয়তো এই প্রথম এবং এই শেষবার, কিন্তু তাও এ শখটাকে কিছুতেই দমন করতে পারছি না সুরপতি!'

একটা অজানা আশঙ্কা সুরপতির বুকটাকে কাঁপিয়ে দিল।

ত্রিপুরাবাবু এবার তাঁর আসল প্রস্তাবটি পাড়লেন।

'লক্ষ্মৌতে তোমার ম্যাজিক দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি সেখানেই যাচ্ছ। ধরো যদি শেষ মুহূর্তে তোমার অসুখ করে! দর্শককে একেবারে হতাশ করে ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে ধরো যদি তোমার জায়গায় আর কেউ......।'

সুরপতি হকচকিয়ে গেল। ত্রিপুরাবাবু বলেন কী! সত্যিই মরিয়া হয়েছেন ভদ্রলোক, নাহলে এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করেন কী করে?

সুরপতি চুপ করে আছে দেখে ত্রিপুরাবাবু বললেন, 'অনিবার্য কারণ হেতু তোমার বদলে তোমার গুরু ম্যাজিক দেখাবেন—এইভাবেই খবরটা দিয়ে দেবে তুমি। এতে কি লোক খুব হতাশ হবে বলে মনে হয়? আমার তো তা মনে হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার ম্যাজিক লোকের ভালোই লাগবে। কিন্তু তাও আমি প্রস্তাব করি যে প্রথম দিনের হিসেবে তোমার যা টাকা পাওনা হত, তার অর্ধেক তুমিই পাবে। তাতে আমার ভাগে যা থাকবে তাতেই আমার চলে যাবে। তারপর তুমি যেমন চলছ চলো। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না। কেবল এই একদিনের সুযোগটুকু তোমাকে করে দিতেই হবে সুরপতি!'

'অসম্ভব!' সুরপতির মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

'অসম্ভব! আপনি কী বলছেন আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন না ত্রিপুরাবাবু। বাংলার বাইরে এই আমার প্রথম প্রদর্শনী। লক্ষ্মৌয়ের 'শো'-এর উপর কত কিছু নির্ভর করছে তা আপনি বুঝতে পারছেন না? আমার কেরিয়ারের গোড়াতেই আমি একটা মিথ্যের আশ্রয় নেব? কী করে ভাবছেন আপনি এমন কথা?'

ত্রিপুরাবাবু স্থির দৃষ্টিতে সুরপতির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ট্রেনের শব্দের উপর দিয়ে তাঁর ধীর, সংযত কণ্ঠস্বর সুরপতির কানে ভেসে এল।

'সেই আধুলি আর আংটির ম্যাজিকের উপর তোমার এখনো লোভ আছে কি?'

সুরপতি চমকে উঠল। কিন্তু ত্রিপুরাবাবুর চাহনিতে কোন পরিবর্তন নেই।

'কেন?'

ত্রিপুরাবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজী হও তাহলে আমি তোমায় ম্যাজিকটা শিখিয়ে দেব। যদি এখনই কথা দাও তো এখনই। আর যদি না দাও—'

হুইশল্-এর বিকট শব্দ করে একটা হাওড়াগামী ট্রেন সুরপতিদের ট্রেনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার কামরার আলোয় ত্রিপুরাবাবুর চোখ বার বার ধকধক করে জ্বলে উঠল। আলো আর শব্দ মিলিয়ে গেলে পর সুরপতি জিজ্ঞাসা করল, 'আর যদি রাজী না হই?'

'তাহলে ফল ভালো হবে না সুরপতি। তোমার একটা কথা জানা দরকার। আমি যদি দর্শকের মধ্যে উপস্থিত থাকি তাহলে ইচ্ছা করলে আমি যে-কোন জাদুকরকে অপদস্থ, নাকাল এমন কি একেবারে অকেজো করে দিতে পারি।'

ত্রিপুরাবাবু তাঁর কোটের পকেট থেকে একজোড়া তাস সুরপতির দিকে এগিয়ে দিলেন।

'দেখাও তো দেখি তোমার হাতসাফাই! কঠিন কিছু না। একেবারে প্রাথমিক সাফাই। পিছনের এই গোলামটা সামনের এই তিরির উপর নিয়ে এসো দেখি হাতের এক ঝাঁকানিতে।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ষোলো বছর বয়সে সুরপতির এই সাফাইটি আয়ত্ত করতে লেগেছিল মাত্র সাতদিন।

আর আজ?

সুরপতি তাস হাতে নিয়ে দেখল তার আঙুল অবশ হয়ে আসছে। শুধু আঙুল নয়,—আঙুল, কব্জি, কনুই—একেবারে পুরো হাতটাই অবশ। ঝাপসা চোখে সুরপতি দেখল ত্রিপুরাবাবুর ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি; এক অমানুষিক তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তিনি সুরপতির চোখের দিকে। সুরপতির কপাল ঘেমে গেল, সর্বাঙ্গে একটা কাঁপুনির লক্ষণ অনুভব করল সে।

'এবার বুঝেছ আমার ক্ষমতা?'

সুরপতির হাত থেকে তাসের প্যাকেটটা আপনা থেকেই পড়ে গেল বেঞ্চির উপরে। ত্রিপুরাবাবু তাসগুলো গোছ করে তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'রাজী আছ?'

সুরপতির অসুস্থ অবশ ভাবটা কেটে গেছে।

সে ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাজিকটা শেখাবেন তো?'

ত্রিপুরাবাবু তাঁর ডান হাতের তর্জনী সুরপতির নাকের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'লক্ষ্মী'য়ের প্রথম শোতে তোমার অসুস্থতাহেতু তোমার পরিবর্তে তোমার গুরু ত্রিপুরাচরণ মল্লিক তাঁর জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করবে। তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তুমি তোমার প্রাপ্য টাকার অর্ধেক আমাকে দেবে। ঠিক তো?'

'ঠিক।'

'তবে এসো।'

সুরপতি পকেট হাতড়ে একটা আধুলি, আর নিজের আঙুল থেকে পলা-বসানো আংটিটা খুলে ত্রিপুরাবাবুকে দিল।...

* * *

বর্ধমানে গাড়ি থামতে চা নিয়ে তার 'বস্'-এর কামরার সামনে এসে অনিল দেখে সুরপতি ঘুমে অচেতন। অনিল একটু ইতস্তত করে একবার 'স্যার' বলে মৃদু শব্দ করতেই সুরপতি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'কী...কী ব্যাপার?'

'আপনার চা এনেচি স্যার। ডিসটার্ব করলুম, কিছু মনে করবেন না।'

'কিন্তু...?' সুরপতি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে কামরার এদিক-ওদিক দেখতে লাগল।

'কী হল স্যার?'

'ত্রিপুরাবাবু...?'

'ত্রিপুরাবাবু?' অনিল হতভম্ব।

'না, না...উনি তো সেই ফিফ্‌টি-ওয়ানেই...বাস চাপা পড়ে...কিন্তু আমার আংটি?'

'কোন্ আংটি স্যার? আপনার পলাটা তো হাতেই রয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর...'

সুরপতি পকেটে হাত দিয়ে একটা আধুলি বার করল। অনিল লক্ষ্য করল সুরপতির হাত থরথর করে কাঁপছে।

'অনিল, ভেতরে এসো তো একবার। চট করে এসো। ওই জানালাগুলো বন্ধ করো তো। হ্যাঁ। এইবার দেখো।'

সুরপতি বেঞ্চির এক মাথায় আংটি আর অন্য মাথায় আধুলিটি রাখল। তারপর ইষ্টনাম জপ করে যা-থাকে-কপালে করে স্বপ্নে-পাওয়া কৌশল প্রয়োগ করল আধুলির দিকে তীব্র সংহত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

আধুলিটা বাধ্য ছেলের মতো গড়িয়ে আংটির কাছে গিয়ে সেটাকে সঙ্গে নিয়ে সুরপতির কাছে গড়িয়ে ফিরে এল।

অনিলের হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা পড়ে যেত যদি না সুরপতি অদ্ভুত হাতসাফাইয়ের বলে সেটাকে পড়ার পূর্বমুহূর্তেই নিজের হাতে নিয়ে নিত।

লক্ষ্ণৌয়ে জাদুপ্রদর্শনীর প্রথম দিন পর্দা উঠলে পর সুরপতি মণ্ডল সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বর্গত জাদুবিদ্যাশিক্ষক ত্রিপুরাচরণ মল্লিকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল।

আজ প্রদর্শনীর শেষ খেলা—যেটাকে সুরপতি খাঁটি দেশী ম্যাজিক বলে আখ্যা দিল—হল আংটি ও আধুলির খেলা।

অনাথবাবুর ভয়

অনাথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ট্রেনের কামরায়। আমি যাচ্ছিলাম রঘুনাথপুর হাওয়াবদলের জন্য। কলকাতায় খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি। গত ক-মাস ধরে কাজের চাপে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তাছাড়া আমার লেখার শখ, দু-একটা গল্পের প্লটও মাথায় ঘুরছিল, কিন্তু এত কাজের মধ্যে কি আর লেখার ফুরসত জোটে? তাই আর সাত-পাঁচ না ভেবে দশদিনের পাওনা ছুটি আর দিস্তেখানেক কাগজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এত জায়গা থাকতে রঘুনাথপুর কেন তারও অবিশ্যি একটা কারণ আছে। ওখানে বিনা-খরচায় থাকার একটা ব্যবস্থা জুটে গেছে। আমার কলেজের সহ-পাঠী বীরেন বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে রঘুনাথপুরে। কফি হাউসে বসে, ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায় এই আলোচনাপ্রসঙ্গে বীরেন খুব খুশী হয়ে ওর বাড়িটা অফার করে বলল, 'আমিও যেতুম, কিন্তু আমার এদিকের ঝামেলা, বুঝতেই তো পারছিস। তবে তোর কোনই অসুবিধা হবে না। আমাদের পঞ্চাশ বছরের পুরনো চাকর ভরদ্বাজ রয়েছে ও-বাড়িতে। ওই তোর দেখাশুনো করবে। তুই চলে যা।'

গাড়িতে যাত্রী ছিল অনেক। আমার বেঞ্চিতে আমারই পাশে বসে ছিলেন অনাথবন্ধু মিত্র। বেঁটেখাটো মানুষটি, বছর পঞ্চাশেক আন্দাজ বয়স। মাঝখানে টেরিকাটা কাঁচাপাকা চুল, চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ, আর ঠোঁটের কোণে এমন একটা ভাব যেন মনের আনাচেকানাচে সদাই কোন মজার চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম : ভদ্রলোককে হঠাৎ দেখলে মনে হবে তিনি যেন পঞ্চাশ বছরের পুরনো কোন নাটকের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সেজেগুজে তৈরি হয়ে এসেছেন। ওরকম কোট, ও ধরনের শার্টের কলার, ওই চশমা, আর বিশেষ করে ওই বুট জুতো—এসব আর আজ-কালকার দিনে কেউ পরে না।

অনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম তিনিও রঘুনাথপুর যাচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কিংবা এও হতে পারে যে ট্রেনের শব্দের জন্য তিনি আমার প্রশ্ন শুনতে পান নি।

বীরেনের পৈতৃক ভিটেটি দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল। বেশ বাড়ি। সামনে এককালি জমি—তাতে সবজি ও ফুলগাছ দুইই হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে অন্য কোন বাড়িও নেই, কাজেই পড়শীর উৎপাত থেকেও রক্ষা।

আমি আমার থাকার জন্য ভরদ্বাজের আপত্তি সত্ত্বেও ছাতের চিলেকোঠাটি বেছে নিলাম। আলো বাতাস এবং নির্জনতা, তিনটেই অপর্যাপ্ত পাওয়া যাবে ওখানে। ঘর দখল করে জিনিসপত্র গোছাবার সময় দেখি আমার দাড়ি কামানোর খুর আনতে ভুলে গিয়েছি। ভরদ্বাজ শুনে বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে খোকাবাবু। এই তো কুণ্ডুবাবুর দোকান, পাঁচ মিনিটের পথ। সেখানে গেলেই পাবে'খন বিলেড।'

বিকেল চারটে নাগাদ চা-টা খেয়ে কুণ্ডুবাবুর দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি সেটি একটি ভালো আড্ডার জায়গা। দোকানের ভিতর দুটি বেঞ্চিতে বসে পাঁচ-সাতটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রীতিমত গল্প জমিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিতভাবে বলছেন, 'আরে বাপু, এ তো আর শোনা কথা নয়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। আর তিরিশ বছর হয়ে গেল বলেই কি সব মন থেকে মুছে গেল? এসব স্মৃতি অত সহজে ভোলবার নয়, আর বিশেষ করে যখন হলধর দত্ত ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার মৃত্যুর জন্য আমি যে কিছু অংশে দায়ী, সে বিশ্বাস আমার আজও যায় নি।'

আমি এক প্যাকেট সেভ্ন-ও-ক্লক কিনে আরো দু-একটা অবান্তর জিনিসের খোঁজ করতে লাগলাম। ভদ্রলোক বলে চললেন, 'ভেবে দেখুন, আমারই বন্ধু আমারই সঙ্গে মাত্র দশ টাকা বাজি ধরে রাত কাটাতে গেল ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটাতে। পরদিন ফেরে না, ফেরে না, ফেরে না—শেষটায় আমি, জিতেন বক্সি, হরিচরণ সা, আর আরো তিন-চারজন কে ছিল ঠিক মনে নেই—গেলুম হালদার-বাড়িতে হলধরের খোঁজ করতে। গিয়ে দেখি বাবু ওই ঘরের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে মরে কাঠ হয়ে আছেন, তাঁর চোখ চাওয়া, দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে। আর সেই দৃষ্টিতে ভয়ের যা নমুনা দেখলুম, তাতে ভূত ছাড়া আর কী ভাবব বলুন? গায়ে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই, বাঘের আঁচড় নেই, সাপের ছোবল নেই, কিচ্ছু নেই। আপনারাই বলুন এখন কী বলবেন।'

আরো মিনিট পাঁচেক দোকানে থেকে আলোচনার বিষয়টা সম্পর্কে মোটা-মুটি একটা ধারণা হল। ব্যাপারটা এই—রঘুনাথপুরের দক্ষিণপ্রান্তে হালদার-বাড়ি বলে একটি দুশো বছরের পুরনো ভগ্নপ্রায় জমিদারী প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদে—বিশেষ করে তার দোতলার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে—নাকি অনেক কালের পুরনো একটি ভূতের আনাগোনা আছে। অবশ্য সেই ত্রিশ বছর আগে ভবতোষ মজুমদারের বন্ধু হলধর দত্তের মৃত্যুর পর আজ অবধি নাকি কেউ সে বাড়িতে রাত কাটায় নি। কিন্তু তাও রঘুনাথপুরের বাসিন্দারা ভূতের

অস্তিত্ব মনে-প্রাণে বিশ্বাস ক'রে বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে। আর বিশ্বাস করার কারণও আছে যথেষ্ট। একে তো হলধর দত্তের রহস্যজনক মৃত্যু, তার উপর এমনিতেই হালদারবংশের ইতিহাসে নাকি খুনখারাপি আত্মহত্যা ইত্যাদির অনেক নজির পাওয়া যায়।

মনে মনে হালদারবাড়ি সম্পর্কে বেশ খানিকটা কৌতূহল নিয়ে দোকানের বাইরে এসেই দেখি আমার ট্রেনের আলাপী অনাথবন্ধু মিত্র মশাই হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে বললেন, 'শুনছিলেন ওদের কথাবার্তা?'

বললাম, 'তা কিছুটা শুনেছি।'

'বিশ্বাস হয়?'

'কী? ভূত?'

'হ্যাঁ?'

'ব্যাপার কী জানেন—ভূতের বাড়ির কথা তো অনেকই শুনলাম, কিন্তু সেসব বাড়িতে থেকে নিজের চোখে ভূত দেখেছে, এমন লোক তো কই আজ অবধি একটিও মীট করলাম না। তাই ঠিক—'

অনাথবাবু একটু হেসে বললেন, 'একবার দেখে আসবেন নাকি?'

'কী?'

'বাড়িটা।'

'দেখে আসব মানে—'

'বাইরে থেকে আর কি। বেশি দূর তো নয়। বড় জোর মাইলখানেক। এই রাস্তা দিয়ে সোজা গিয়ে জোড়াশিবের মন্দির ছাড়িয়ে ডানহাতি রাস্তায় ঘুরে পোয়াটাক পথ।'

ভদ্রলোককে বেশ ইণ্টারেস্টিং লাগছিল। আর তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করব? তাই চললাম তাঁর সঙ্গে।

হালদারদের বাড়িটা দূর থেকে দেখা যায় না, কারণ বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল। তবে বাড়ির গেটের মাথাটি দেখা যেতে থাকে পৌঁছনোর প্রায় দশ মিনিট আগে থেকেই। বিরাট ফটক, মাথার উপর ভগ্নপ্রায় নহবতখানা। ফটকের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকদূর রাস্তা গিয়ে তবে সদর দালান। দু-তিনটে মূর্তি আর একটা ফোয়ারার ভগ্নাবশেষ দেখে বুঝলাম যে বাড়ি আর ফটকের মাঝখানের এই জায়গাটা আগে বাগান ছিল। বাড়িটি অদ্ভুত। কারুকার্যের কোন বাহার নেই তার কোনো জায়গায়। কেমন যেন একটা বেঢপ চৌকো-চৌকো ভাব। বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে তার শেওলাবৃত দেয়ালে।

মিনিট খানেক চেয়ে থাকার পর অনাথবাবু বললেন, 'আমি যতদূর জানি, রোদ থাকতে ভূত বেরোয় না।' তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, 'একবার চট করে সেই ঘরটা দেখে এলে হত না?'

'সেই উত্তর-পশ্চিমের ঘর? যে ঘরে—'

'হ্যাঁ। যে ঘরে হলধর দত্তের মৃত্যু হয়েছিল।'

ভদ্রলোকের তো এসব ব্যাপারে দেখছি একটু বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ!

অনাথবাবু বোধহয় আমার মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরেই বললেন, 'খুব আশ্চর্য লাগছে, না? আসলে কী জানেন? আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই—আমার রঘুনাথপুর আসার একমাত্র কারণই হল ওই বাড়িটা।'

'বটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা যে ভূতের বাড়ি, আমি কলকাতায় থাকতে সে খবরটা পেয়ে ওই ভূতটিকে দেখব বলে এখানে এসেছি। আপনি সেদিন ট্রেনে আমার আসার কারণটা জানতে চাইলেন। আমি উত্তর না দিয়ে অভদ্রতা করলাম বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করেছিলাম যে উপযুক্ত সময় এলে—অর্থাৎ আপনি কিরকম লোক সেটা আরেকটু জেনে নিয়ে, আসল কারণটা নিজে থেকেই বলব।'

'কিন্তু তাই বলে ভূতের পেছনে ধাওয়া করে একেবারে কলকাতা ছেড়ে—'

'বলছি, বলছি। ব্যস্ত হবেন না। আমার কাজটা সম্বন্ধেই তো বলা হয় নি এখনো আপনাকে। আসলে আমি ভূত সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। আজ পঁচিশ বছর ধরে এ-ব্যাপার নিয়ে বিস্তর রিসার্চ করেছি। শুধু ভূত কেন—ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউল্‌ফ, ভূডুইজম ইত্যাদি যা কিছু আছে তার সম্বন্ধে বইয়ে যা লেখে তার প্রায় সবই পড়ে ফেলেছি। সাতটা ভাষা শিখতে হয়েছে এসব বই পড়ার জন্য। পরলোকতত্ত্ব নিয়ে লন্ডনের প্রফেসার নর্টনের সঙ্গে আজ তিন বছর ধরে চিঠি লেখালিখি করছি। আমার লেখা প্রবন্ধ বিলেতের সব নামকরা কাগজে বেরিয়েছে। আপনার কাছে বড়াই করে কী লাভ, তবে এটুকু বলতে পারি যে এদেশে এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক বোধহয় আর নেই।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে তিনি যে মিথ্যে বলছেন বা বাড়িয়ে বলছেন এটা আমার একবারও মনে হল না। বরং তাঁর সম্বন্ধে খুব সহজেই একটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

অনাথবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভারতবর্ষের অন্তত তিনশো ভূতের বাড়িতে আমি রাত কাটিয়েছি।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ। আর সেসব কিরকম কিরকম জায়গায় জানেন? এই ধরুন—জব্বলপুর, কার্সিয়ং, চেরাপুঞ্জি, কাঁথি, কাটোয়া, যোধপুর, আজিমগঞ্জ, হাজারিবাগ, সিউড়ি, বারাসাত...আর কত চাই? ছাপ্পান্নোটা ডাকবাংলো আর কম করে ত্রিশটা নীল-কুঠিতে আমি রাত্রি যাপন করেছি। এ ছাড়া কলকাতা এবং তার কাছাকাছির

মধ্যে অন্তত পঞ্চাশখানা বাড়ি তো আছেই। কিন্তু—'

অনাথবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভূত আমায় ফাঁকি দিয়েছে। হয়তো, ভূতকে যারা চায় না, ভূত তাদের কাছেই আসে। আমি বার বার হতাশ হয়েছি। মাদ্রাজে ত্রিচিনপল্লীতে দেড়শ বছরের পুরনো একটা সাহেবদের পরিত্যক্ত ক্লাব বাড়িতে ভূত একবার কাছাকাছি এসেছিল। কিরকম জানেন? অন্ধকার ঘর, একফোঁটা বাতাস নেই, যতবারই মোমবাতি ধরাব বলে দেশলাই জ্বালাচ্ছি, ততবারই কে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে। শেষটায় তেরোটা কাঠি নষ্ট করার পর বাতি জ্বলল, এবং আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ভূতবাবাজী সেই যে গেলেন আর এলেন না। একবার কলকাতায় ঝামাপুকুরের এক হানাবাড়িতেও একটা ইণ্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার মাথায় তো এত চুল দেখছেন? অথচ, ওই বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে মাঝরাত্তির নাগাদ হঠাৎ ব্রহ্মতালুর কাছটায় একটা মশার কামড় খেলাম। কী ব্যাপার? অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি একটি চুলও নেই! একেবারে মসৃণ মাথাজোড়া টাক! এ কি আমারই মাথা, না অন্য কারুর মাথায় হাত দিয়ে নিজের মাথা বলে মনে করেছি? কিন্তু মশার কামড়টা তো আমিই খেলাম। টর্চটা জেবলে আয়নায় দেখি টাকের কোন চিহ্নমাত্র নেই। আমার যে-চুল সে-চুলই রয়েছে আমার মাথায়। ব্যস, এই দুটি ছাড়া আর কোন ভুতুড়ে অভিজ্ঞতা এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার হয় নি। তাই ভূত দেখার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম, এমন সময় একটা পুরনো বাঁধানো 'প্রবাসী'তে রঘুনাথপুরের এই বাড়িটার একটা উল্লেখ পেলাম। তাই ঠিক করলাম একটা শেষ চেষ্টা দিয়ে আসব।'

অনাথবাবুর কথা শুনতে শুনতে কখন যে বাড়ির সদর দরজায় এসে পড়েছি সে খেয়াল ছিল না। ভদ্রলোক তাঁর ট্যাঁকঘড়িটা দেখে বললেন, 'আজ পাঁচটা একত্রিশে সূর্যাস্ত। এখন সোয়া পাঁচটা। চলুন, রোদ থাকতে থাকতে একবার ঘরটা দেখে আসি।'

ভূতের নেশাটা বোধহয় সংক্রামক, কারণ আমি অনাথবাবুর প্রস্তাবে কোন আপত্তি করলাম না। বরঞ্চ বাড়ির ভিতরটা, আর বিশেষ করে দোতলার ওই ঘরটা দেখবার জন্য বেশ একটা আগ্রহ হচ্ছিল।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে দেখি বিরাট উঠোন ও নাটমন্দির। একশো-দেড়শো বছরে কত উৎসব কত অনুষ্ঠান কত পুজা পার্বণ যাত্রা কথকতা এইখানে হয়েছে, তার কোন চিহ্নই আজ নেই।

উঠোনের তিন দিকে বারান্দা। আমাদের ডাইনে বারান্দার যে অংশ, তাতে একটি ভাঙা পালকি পড়ে আছে, এবং পালকিটি ছাড়িয়ে হাত দশেক গিয়েই দোতলায় যাবার সিঁড়ি।

সিঁড়িটা এমনই অন্ধকার যে উঠবার সময় অনাথবাবুকে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটি টর্চ বার করে জ্বালতে হল। প্রায়-অদৃশ্য মাকড়সার জালের ব্যূহ ভেদ করে কোনরকমে দোতলায় পৌঁছনো গেল। মনে মনে বললাম, এ বাড়িতে ভূত থাকা অস্বাভাবিক নয়।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিসাব করে দেখলাম বাঁ দিক দিয়ে সোজা চলে গেলে ওই যে ঘর, ওটাই হল উত্তর-পশ্চিমের ঘর। অনাথবাবু বললেন, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলুন এগোই।'

এখানে বলে রাখি, বারান্দায় কেবল একটি জিনিস ছিল—সেটি একটি ঘড়ি। যাকে বলে গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। কিন্তু তার অবস্থা খুবই শোচনীয়—কাঁচ নেই, বড় কাঁটাটি উধাও, পেন্ডুলামটি ভেঙে কাত হয়ে পড়ে আছে।

উত্তর-পশ্চিমের ঘরের দরজাটি ভেজানো ছিল। অনাথবাবু যখন তাঁর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সন্তর্পণে ঠেলে দরজাটি খুলছিলেন, তখন বিনা কারণেই আমার গা-টা ছমছম করছিল।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করলাম না। দেখে মনে হয় এককালে বৈঠকখানা ছিল। ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট টেবিল, তার কেবল পায়া চারখানাই রয়েছে, উপরের তক্তাটা নেই। টেবিলের পাশে জানালার দিকে একটি আরামকেদারা। অবিশ্যি এখন আর সেটি আরামদায়ক হবে কিনা সন্দেহ, কারণ তার একটি হাতল ও বসবার জায়গায় বেতের খানিকটা অংশ লোপ পেয়েছে।

উপরের দিকে চেয়ে দেখি ছাত থেকে ঝুলছে একটি টানাপাখার ভগ্নাংশ। অর্থাৎ, তার দড়ি নেই, কাঠের ডান্ডাটি ভাঙা এবং ঝালরের অর্ধেকটা ছেঁড়া।

এ ছাড়া ঘরে আছে একটি খাঁজকাটা বন্দুক রাখার তাক, একটি নলবিহীন গড়গড়া, আর দুখানা সাধারণ হাতলভাঙা চেয়ার।

অনাথবাবু কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনে হল খুব মনোযোগ দিয়ে কী একটা অনুভব করার চেষ্টা করছেন। প্রায় মিনিটখানেক পরে বললেন, 'একটা গন্ধ পাচ্ছেন?'

'কী গন্ধ?'

'মাদ্রাজী ধূপ, মাছের তেল, আর মড়াপোড়ার গন্ধ মেশানো একটা গন্ধ?'

আমি বার দু-এক বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস টানলাম। অনেকদিনের বন্ধ ঘর খুললে যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়, সে গন্ধ ছাড়া আর কোন গন্ধই পেলাম না। তাই বললাম, 'কই, ঠিক বুঝতে পারছি না তো।'

অনাথবাবু আরো একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মেরে বললেন, 'বহুত আচ্ছা! এ গন্ধ আমার চেনা গন্ধ। এ বাড়িতে ভূত অবশ্যম্ভাবী। তবে বাবাজী দেখা দেবেন কি না দেবেন

সেটা কাল রাত্রের আগে বোঝা যাবে না। চলুন।'

•

অনাথবাবু স্থির করে ফেললেন যে পরদিনই তাঁকে এ ঘরে রাত্রিবাস করতে হবে। ফেরার পথে বললেন, 'আজ থাকলুম না কারণ কাল অমাবস্যা—ভূতের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত তিথি। তাছাড়া দু-একটা জিনিস সঙ্গে রাখা দরকার। সেগুলো বাড়িতে রয়ে গেছে, কাল নিয়ে আসব। আজ সার্ভেটা করে গেলুম আর কি।'

ভদ্রলোক আমায় বাড়ি অবধি পেঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, 'আর কাউকে আমার এই প্ল্যানের কথা বলবেন না যেন। এদের কথাবার্তা তো শুনলুম আজকে—যা ভয় আর যা প্রেজুডিস এদের, জানলে পরে হয়তো বাধাটাধা দিয়ে আমার প্ল্যানটাই ভেস্তে দেবে। আর—হ্যাঁ, আরেকটা কথা। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বললুম না বলে কিছু মনে করবেন না। এসব ব্যাপার, বুঝলেন কিনা, একা না হলে ঠিক জুতসই হয় না।'

পরদিন দুপুরে কাগজকলম নিয়ে বসলেও লেখা খুব বেশিদূর এগোল না। মন পড়ে রয়েছে হালদারবাড়ির ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটায়। আর রাত্রে অনাথবাবুর কী অভিজ্ঞতা হবে সেই নিয়ে একটা অশান্তি আর উদ্বেগ রয়েছে মনের মধ্যে।

বিকেলে অনাথবাবুকে হালদারবাড়ির ফটক অবধি পেঁছে দিলাম। ভদ্রলোকের গায়ে আজ একটা কালো গলাবন্ধ কোট, কাঁধে জলের ফ্লাস্ক আর হাতে সেই কালকের তিন সেলের টর্চ। ফটক দিয়ে ঢুকবার আগে কোটের দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে দুটো বোতল বার করে আমায় দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন—এটিতে রয়েছে আমার নিজের ফরমুলায় তৈরি তেল—শরীরের অনাবৃত অংশে মেখে নিলে আর মশা কামড়াবে না। আর এই দ্বিতীয়টিতে হল কারবলিক অ্যাসিড, ঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে দিলে সাপের উৎপাত থেকে নিশ্চিন্ত।' এই বলে বোতল দুটো পকেটে পুরে, টর্চটা মাথায় ঠেকিয়ে আমায় একটা সেলাম ঠুকে ভদ্রলোক বুট জুতো খটখটিয়ে হালদারবাড়ির দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে ভালো ঘুম হল না।

ভোর হতে না হতে ভরদ্বাজকে বললাম আমার থার্মস ফ্লাস্কে দুজনের

মতো চা ভরে দিতে। চা এলে পর ফ্লাস্কটি নিয়ে আবার হালদারবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

হালদারবাড়ির ফটকের কাছে পেঁছে দেখি চারিদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। অনাথবাবুর নাম ধরে ডাকব, না সটান দোতলায় যাব তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম—'ও মশাই, এই যে এদিকে।'

এবার দেখতে পেলাম অনাথবাবুকে—প্রাসাদের পূর্বদিকের জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে হেঁটে আসছেন। তাঁকে দেখে মোটেই মনে হয় না যে রাত্রে তাঁর কোন ভয়াবহ বা অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমার কাছে এসে হাসতে হাসতে হাতে একটা নিমের ডাল দেখিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না মশাই! আধ ঘণ্টা ধরে বনেবাদাড়ে ঘুরছি এই নিমডালের খোঁজে। আমার আবার দাঁতনের অভ্যেস কিনা!'

ফস করে রাত্রের কথাটা জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। বললাম, 'চা এনেছি। এখানেই খাবেন, না বাড়ি যাবেন?'

'চলুন না, ওই ফোয়ারার পাশটায় বসে খাওয়া যাক।'

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তিসূচক 'আঃ' শব্দ করে আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে অনাথবাবু বললেন, 'খুব কৌতূহল হচ্ছে, না?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে, তা একটু—'

'বেশ। তবে বলছি শুনুন। গোড়াতেই বলে রাখি—এক্সপিডিশন হাইলি সাক্সেসফুল। আমার এখানে আসা সার্থক হয়েছে।' অনাথবাবু এক মগ চা শেষ করে দ্বিতীয় মগ ঢেলে তাঁর কথা শুরু করলেন :

'আপনি যখন আমায় পেঁছে দিয়ে গেলেন তখন পাঁচটা। আমি বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে এই আশপাশটা একটু সার্ভে করে নিলুম। অনেক সময় ভূতের চেয়ে জ্যান্ত মানুষ বা জানোয়ার থেকে উপদ্রবের আশঙ্কা বেশি থাকে। যাই হোক, দেখলুম কাছাকাছির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নেই।

'বাড়িতে ঢুকে একতলার ঘরগুলোর মধ্যে যেগুলো খোলা রয়েছে সেগুলোও একবার দেখে নিলুম। জিনিসপত্তর তো আর অ্যাদ্দিন ধরে বিশেষ পড়ে থাকার কথা নয়। একটা ঘরে কিছু আবর্জনা, আর আরেকটার কড়িকাঠে গুটি চারেক ঝুলন্ত বাদুড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বাদুড়গুলো আমায় দেখেও নড়ল না। আমিও তাদের ডিসটার্ব করলুম না।

'সাড়ে ছটা নাগাদ দোতলার ওই আসল ঘরটিতে ঢুকে রাত কাটানোর আয়োজন শুরু করলুম। একটা ঝাড়ন এনেছিলুম, তাই দিয়ে প্রথম আরাম-কেদারাটিকে ঝেড়েপুঁছে সাফ করলুম। কদ্দিনের ধুলো জমেছিল তাতে কে জানে?

'ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ভাব ছিল, তাই জানালাটা খুলে দিলুম। ভূত-

বাবাজী যদি সশরীরে আসতে চান তাই বারান্দার দরজাটাও খোলা রাখলুম। তারপর টর্চ ও ফ্লাস্কটা মেঝেতে রেখে ওই বেতছেঁড়া আরামকেদারাতেই শুয়ে পড়লুম। অসোয়াস্তি হচ্ছিল বেশ, কিন্তু এর চেয়েও আরো অনেক বেয়াড়া অবস্থায় বহুবার রাত কাটিয়েছি, তাই কিছু মাইণ্ড করলুম না।

'আশ্বিন মাস, সাড়ে পাঁচটায় সূর্য ডুবেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা বেশ জমাট বেঁধে উঠল। আর সেই সঙ্গে সেই গন্ধটাও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি এমনিতে খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, সহজে বড় একটা এক্সাই-টেড হই না, কিন্তু কাল যেন ভেতর ভেতর বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলুম।

'সময়টা ঠিক বলতে পারি না, তবে আন্দাজ মনে হয় নটা কি সাড়ে নটা নাগাদ জানালা দিয়ে একটা জোনাকি ঘরে ঢুকেছিল। সেটা মিনিট খানেক ঘোরাঘুরি করে আবার জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল।

'তারপর কখন যে শেয়াল ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে, আর কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই।

'ঘুমটা ভাঙল একটা শব্দে। ঘড়ির শব্দ। ঢং ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। মিঠে অথচ বেশ জোর আওয়াজ। জাত ঘড়ির আওয়াজ, আর সেটা আসছে বাইরের বারান্দা থেকে।

'কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমটা ছুটে গিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে আরো দুটো জিনিস লক্ষ্য করলুম। এক—আমি আরামকেদারায় সত্যিই খুব আরামে শুয়ে আছি। ছেঁড়াটা তো নেইই, বরং উলটে আমার পিঠের তলায় কে যেন একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে গেছে। আর দুই—আমার মাথার উপর একটি চমৎকার ঝালর সমেত আস্ত নতুন টানাপাখা, তা থেকে একটি নতুন দড়ি দেয়ালের ফুটো দিয়ে বারান্দায় চলে গেছে, এবং কে জানি সে দড়িতে টান দিয়ে পাখাটি দুলিয়ে আমায় চমৎকার বাতাস করছে।

'আমি অবাক হয়ে এই সব দেখছি আর উপভোগ করছি, এমন সময় খেয়াল হল অমাবস্যার রাত্তিরে কী করে জানি ঘরটা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারপর নাকে এল একটা চমৎকার গন্ধ। পাশ ফিরে দেখি কে জানি একটি আলবোলা রেখে গেছে, আর তার থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে একেবারে সেরা অম্বুরী তামাকের গন্ধ।'

অনাথবাবু একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, 'বেশ মনোরম পরিবেশ নয় কি?'

আমি বললাম, 'শুনে তো ভালোই লাগছে। আপনার রাতটা তাহলে মোটামুটি আরামেই কেটেছে?'

আমার প্রশ্ন শুনে অনাথবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ

অপেক্ষা করে আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বললাম, 'তাহলে কি সত্যি আপনার কোন ভয়ের কারণ ঘটে নি? ভূত কি আপনি দেখেন নি?'

অনাথবাবু আবার আমার দিকে চাইলেন। এবার কিন্তু আর ঠোঁটের কোণে সে হাসিটি নেই। ধরা গলায় ভদ্রলোকের প্রশ্ন এল, 'পরশু যখন আপনি ঘরটায় গেলেন, তখন কড়িকাঠের দিকটা ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন কি?'

আমি বললাম, 'তেমন ভালো করে দেখি নি বোধহয়। কেন বলুন তো?'

অনাথবাবু বললেন, 'ওখানে একটা বিশেষ ব্যাপার রয়েছে, সেটা না দেখলে বাকি ঘটনাটা বোঝাতে পারব না। চলুন।'

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনাথবাবু কেবল একটি কথা বললেন : 'আমার আর ভূতের পেছনে ধাওয়া করতে হবে না সীতেশবাবু। কোনদিনও না। সে শখ মিটে গেছে।'

বারান্দা দিয়ে যাবার পথে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম সেরকমই ভাঙা অবস্থা।

ঘরের দরজার সামনে পেঁছে অনাথবাবু বললেন, 'চলুন।'

দরজাটা ভেজানো ছিল। আমি হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। তারপর দু'পা এগিয়ে মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আমার সমস্ত শরীরে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল।

বুট জুতো পরা ও কে পড়ে আছে মেঝেতে?

আর বারান্দার দিক থেকে কার অট্টহাসি হালদারবাড়ির আনাচেকানাচে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে আমার জ্ঞান বুদ্ধি চিন্তা সব লোপ পাইয়ে দিচ্ছে? তাহলে কি—?

আর কিছু মনে নেই আমার।

যখন জ্ঞান হল, দেখি ভরদ্বাজ আমার খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমায় হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন ভবতোষ মজুমদার। আমার চোখ খুলতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, 'ভাগ্যে সিধুচরণ আপনাকে দেখেছিল ও বাড়িতে ঢুকতে, নইলে যে কী দশা হত আপনার জানি না। ওখানে গেস্‌লেন কোন্ আক্কেলে?'

আমি বললাম, 'অনাথবাবু যে রাত্রে—'

ভবতোষবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আর অনাথবাবু! কাল যে অতগুলো কথা বললুম সেসব বোধহয় কিছুই বিশ্বাস করেন নি ভদ্রলোক। ভাগ্যে আপনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাত কাটাতে যান নি ও বাড়িতে। দেখলেন তো ওঁর অবস্থা। হলধরের যা হয়েছিল, এঁরও ঠিক তাই। মরে একেবারে কাঠ,

আর চোখ ঠিক সেইভাবে চাওয়া, সেই দৃষ্টি, সেই কড়িকাঠের দিকে।'...

আমি মনে মনে বললাম, না, মরে কাঠ নয়। মরে কী হয়েছেন অনাথবাবু তা আমি জানি। কালও সকালে গেলে দেখতে পাব তাঁকে—গায়ে কালো কোট, পায়ে বুট জুতো—হালদারবাড়ির পুব দিকের জঙ্গল থেকে নিমের দাঁতন হাতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন।

সত্যজিৎ রায়

শিবু আর রাক্ষসের কথা

'অ্যাই শিবু—এদিকে শোন!'

শিবুর ইস্কুল যাবার পথে ফটিকদা তাকে প্রায়ই এইভাবে ডাকে।

ফটিকদা মানে পাগলা ফটিক।

জয়নারায়ণ বাবুদের বাড়ি ছাড়িয়ে চৌমাথার কাছটায় যেখানে একটা পুরোনো মর্চে-ধরা ষ্টীম রোলার আজ দশ বছর ধরে পড়ে আছে, তার ঠিক সামনেই ফটিকদার ছোট্ট টিনের চালাওয়ালা বাড়ি। অষ্টপ্রহর দাওয়ায় বসে কী-যে খুটুর খাটুর কাজ করে ফটিকদা তা ও-ই জানে। শিবু শুধু জানে ফটিকদা খুব গরিব, আর লোকে বলে যে এককালে খুব বেশি পড়াশুনো করেই ফটিক পাগল হয়ে গেছে। শিবুর কিন্তু তার এক-একটা কথা শুনে মনে হয় যে তার মতো বুদ্ধিমান লোক খুব কমই আছে।

তবে এটা ঠিক যে ফটিকদার বেশির ভাগ কথাই আজগুবি আর পাগলাটে। 'হ্যাঁরে, কাল চাঁদের পাশ-টা লক্ষ্য করেছিলি—বাঁ দিকটায় কেমন একটা শিং-এর মতো বেরিয়েছিল?' 'ক'দিন থেকে কাকগুলো কেমন নাকি-নাকি সুরে ডাকচে শুনেচিস? সব হোলসেল সর্দি লেগেছে!'

শিবুর হাসিও পায়, আবার মাঝে মাঝে বিরক্তিও লাগে। যেসব কথার কোন জবাব নেই, যার সত্যি করে কোন মানে হয় না, সেসব কথা শুনে তো খালি সময় নষ্ট। তাই এক-একদিন ফটিক ডাকলেও শিবু যায় না। 'আজ সময় নেই ফটিকদা, আরেকদিন আসব,' বলে সে সটান চলে যায় ইস্কুলে।

আজও সে ভাবছিল যাবে না, কিন্তু ফটিকদা আজ যেন একটু বেশি চাপ দিল।

'তোকে যা বলতে চাই, সেটা না শুনলে তোর ক্ষতি হবে।'

শিবু শুনেছে পাগলারা নাকি মাঝে মাঝে এমন সব সত্যি কথা বলে যা এমনি লোকেদের পক্ষে সম্ভবই না। তাই সে ক্ষতির কথা ভেবে ভয়ে ভয়ে ফটিকদার দিকে এগিয়ে গেল।

একটা হুঁকোর মধ্যে ডাবের জল ভরতে ভরতে ফটিক বলল, 'জনার্দন-বাবুকে লক্ষ্য করেছিস্?'

জনার্দন বাবু শিবুদের নতুন অঙ্কের মাস্টার। দিন দশেক হল এসেছেন।

শিবু বলল, 'রোজই তো দেখছি। আজও তো প্রথমেই অঙ্কের ক্লাস।'

ফটিক জিভ দিয়ে ছিক্ করে একটা বিরক্ত হওয়ার শব্দ করে বলল, 'দেখা আর লক্ষ্য করা এক জিনিস নয়, বুঝেছিস? বল তো, তুই যে বেল্টটা পরেছিস তাতে ক'টা ফুটো, শার্টটার ক'টা বোতাম? না দেখে বল তো?'

শিবু কোনটারই ঠিকমতো জবাব দিতে পারল না।

ফটিক বলল, 'ওই দ্যাখ—তোর নিজের জিনিস, নিজে পরে আছিস, অথচ লক্ষ্যই করিস নি। তেমনি জনার্দন বাবুকেও লক্ষ্য করিস নি তুই।'

'কী লক্ষ্য করব? কোন্ জিনিসটা?'

হুঁকোতে কলকে লাগিয়ে গুড়ুক গুড়ুক করে দুটো টান দিয়ে ফটিক বলল, 'এই ধর—দাঁত।'

'দাঁত?'

'হুঁ, দাঁত।'

'কী করে লক্ষ্য করব? উনি যে হাসেন না।'

কথাটা ঠিক। রাগী না হলেও, ওরকম গম্ভীর মাস্টার শিবুদের ইস্কুলে আর নেই।

ফটিক বলল, 'ঠিক আছে। এরপর যেদিন হাসবেন সেদিন ওর দাঁত-গুলো খালি লক্ষ্য করিস। তারপর আমায় এসে বলে যাস কী দেখলি।'

আশ্চর্য ব্যাপার! ঠিক সেই দিনই অঙ্কের ক্লাসে জনার্দন বাবুর একটা হাসির কারণ ঘটে গেল।

জ্যামিতি পড়াতে পড়াতে শঙ্করকে চতুর্ভুজ মানে জিজ্ঞেস করাতে শঙ্কর বলল, 'ঠাকুর, স্যার! নারায়ণ, স্যার!'—আর তাই শুনে জনার্দন বাবু খ্যাক খ্যাক করে রাগী হাসি হেসে উঠলেন, আর শিবুর চোখ তৎক্ষণাৎ চলে গেল তাঁর দাঁতের দিকে।

বিকেলে ফেরার পথে ফটিকদার বাড়ির সামনে পৌঁছে শিবু দেখল সে হামানদিস্তায় কী যেন ছাঁচছে। শিবুকে দেখে ফটিক বলল, 'এই ওষুধটা যদি উতরে যায় তো দেখিস বহুরূপীর মতো রং চেঞ্জ করতে পারব।'

শিবু বলল, 'ফটিকদা, দেখেছি।'

'কী দেখেছিস?'

'দাঁত।'

'ও। কিরকম দেখলি?'

'এমনি সব ঠিক আছে, খালি পানের দাগ, আর দুটো দাঁত একটু বড়।'

'কোন্ দুটো?'

'পাশের। এইখানের।' শিবু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

'হুঁ। ওখানের দাঁতকে কী বলে জানিস?'

'কী?'

'শ্বদন্ত। কুকুরে দাঁত।'

'ও।'

'এত বড় কুকুরে দাঁত মানুষের পাটিতে দেখেছিস এর আগে?'

'না বোধহয়।'

'কুকুরে দাঁত কাদের বড় হয় জানিস?'

'কুকুরের?'

'ইডিয়ট! শুধু কুকুরের কেন? সব মাংসাশী জন্তু-জানোয়ারেরই শ্বদন্ত বড় হয়। ওই দাঁত দিয়েই তো কাঁচামাংস ছিঁড়ে হাড়গোড় চিবিয়ে খায় ওরা। বিশেষ করে হিংস্র জানোয়ারেরা।'

'ও।'

'আর কার বড় হয় শ্বদন্ত?'

শিবু আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। আর কার হবে আবার? মানুষ আর জন্তু-জানোয়ার—এ ছাড়া দাঁতওয়ালা জিনিস আর আছেই বা কী?

ফটিকদা তার হামানদিস্তায় একটা আখরোট আর এক চিমটে কালোজিরে ফেলে দিয়ে বলল, 'জানিস না তো? রাক্ষস।'

রাক্ষস? রাক্ষসের সঙ্গে জনার্দন বাবুর কী? আর আজকের দিনে রাক্ষসের কথা কেন? সে তো ছিল রূপকথার বই-এর পাতার মধ্যে। রাক্ষস-খোক্কসের গল্প তো শিবু কত শুনেছে, পড়েছে। তাদের মুলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো—

শিবু চমকে উঠল।

কুলোর মতো পিঠ!

জনার্দন বাবুর পিঠটা তো ঠিক সিধে নয়। কেমন যেন কুঁজো-কুঁজো কুলো-কুলো ভাব। শিবু কাকে যেন বলতে শুনেছে যে জনার্দন বাবুর বাতের রোগ, তাই পিঠ টেনে চলতে পারেন না।

মুলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো পিঠ—আর? আর যেন কী হয় রাক্ষসের?

আর ভাঁটার মতো চোখ।

জনার্দন বাবুর চোখ কি শিবু লক্ষ্য করেছে? না, করে নি। করা সম্ভব নয়।

কারণ জনার্দন বাবু চশমা পরেন, আর সে চশমার কাঁচ ঘোলাটে। চোখের রং লাল কি বেগুনি কি সবুজ তা বোঝবার কোন উপায় নেই।

শিবু অঙ্কেতে খুব ভালো। লসাগু, গসাগু, সিঁড়িভাঙা, বুদ্ধির অঙ্ক—কোনটাতেই সে ঠেকে না। অন্তত কিছুদিন আগে অবধি সে ঠেকত না। প্যারীচরণবাবু যখন অঙ্কের মাস্টার ছিলেন তখন তো রোজ সে দশে দশ পেয়েছে। কিন্তু এই দুদিন থেকে শিবুর একটু গণ্ডগোল হচ্ছে। কাল সে মনের জোরে অনেকটা সামলে নিয়েছিল নিজেকে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে মনে মনে বলতে আরম্ভ করেছিল, 'রাক্ষস হতে পারে না। মানুষ রাক্ষস হয় না। আগে হলেও, এখন হয় না। জনার্দন বাবু রাক্ষস নয়, জনার্দন বাবু মানুষ।' ক্লাসে বসে বসেও সে মনে মনে এই কথাগুলোই আওড়াচ্ছিল। এমন সময় একটা ব্যাপার হয়ে গেল।

জনার্দন বাবু ব্ল্যাকবোর্ডে একটা অঙ্ক লিখেই কেমন জানি অন্যমনস্ক হয়ে তাঁর চশমাটা খুলে সেটা চাদরের খুঁট দিয়ে মুছতে লাগলেন। আর ঠিক সেই সময় তাঁর সঙ্গে শিবুর চোখাচোখি হয়ে গেল।

শিবু যা দেখল তাতে তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল।

জনার্দন বাবুর চোখের সাদাটা সাদা নয়। সেটা লাল। টকটকে লাল। পল্টুর পেনসিলটার মতো লাল।

এটা দেখার পরে শিবুর পর পর তিনটে অঙ্ক ভুল হয়ে গেল।

এমনিতেই শিবু ছুটির পরে সোজা বাড়ি ফেরে না। সে প্রথমে যায় মিত্তিরদের বাগানে। ছাতিম গাছটার গুঁড়ির আশপাশটায় যে লজ্জাবতী লতাগুলো আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটাকে সে আঙুলে টোকা মেরে মেরে ঘুম পাড়ায়। তারপর সে যায় সরলদীঘির পাড়ে। দীঘির জলে রোজ সে খোলামকুচি দিয়ে ব্যাঙবাজি করে। সাত বারের বেশি লাফ খাইয়ে যদি খোলামকুচি ওপারে পোঁছতে পারে তবেই সে হরেনের রেকর্ড ব্রেক করবে। সরলদীঘির পরেই ইঁটখোলার মাঠ। সেখানে থরে থরে সাজানো ইঁটের পাঁজার উপর প্রায় দশ মিনিট জিমন্যাষ্টিক করে তারপর কোনাকুনিভাবে মাঠ পেরিয়ে সে বাড়ির খিড়কি দরজায় এসে পোঁছায়।

আজ সে মিত্তিরদের বাগানে এসে দেখল লজ্জাবতী লতাগুলো নেতিয়ে পড়ে আছে। এরকম হল কেন? কেউ কি হেঁটে গেছে লতাগুলোর উপর দিয়ে? এ পথে তো বড় একটা কেউ আসে না।

শিবুর আর ইচ্ছে করল না বাগানে থাকতে। কেমন যেন একটা থমথমে-ছমছমে ভাব। সন্ধেটা যেন আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসছে। কাকগুলো কি রোজই এত চেঁচায়—না আজ কোন কারণে ভয় পেয়েছে?

সরলদীঘির পাড়ে বইগুলো হাত থেকে নামিয়ে রেখেই শিবুর মনে হল

আজ আর ব্যাঙবাজি করা উচিত হবে না। আজ বেশিক্ষণ বাইরে থাকাই তার উচিত নয়। থাকলে হয়তো বিপদ হবে।

একটা বিরাট কী যেন মাছ দীঘির মাঝখানে ঘাই মেরে ঘপাৎ করে ডুবে গেল।

শিবু বইগুলো হাতে তুলে নিল। ওপারের অশ্বত্থগাছটায় বাদুড়গুলি ঝুলে গাছটা একেবারে কালো করে দিয়েছে। একটু পরেই ওদের ওড়ার সময় হবে। ফটিকদা বলেছে বাদুড়ের মাথায় কেন রক্ত ওঠে না সেটা একদিন বুঝিয়ে দেবে।

জামরুল গাছটার পেছনের ঝোপড়াটা থেকে একটা তক্ষক ডেকে উঠল—'খোক্কস! খোক্কস! খোক্কস!'

শিবু বাড়ির দিকে রওনা দিল।

ইঁটখোলার কাছাকাছি আসতেই সে দেখতে পেল জনার্দনবাবুকে।

ইঁটের পাঁজাগুলোর হাত বিশেক দূরেই একটা কুলগাছ। তার পাশেই দুটো ছাগলছানা খেলা করছে, আর জনার্দনবাবু বই আর ছাতা হাতে এক-দৃষ্টে ছাগলদুটোর খেলা দেখছেন।

শিবু প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে কোন শব্দ না করে একটা ইঁটের পাঁজার উপর উঠে দুটো ইঁটের মধ্যিখানের ফাঁক দিয়ে তার মাথাটা যতদূর যায় গলিয়ে জনার্দনবাবুকে দেখতে লাগল।

সে লক্ষ্য করল যে ছাগলগুলোকে দেখতে দেখতে জনার্দনবাবু দু'বার তাঁর ডান হাতটা উপুড় করে ঠোঁটের নীচে বুলোলেন।

জিভ দিয়ে জল না পড়লে মানুষ কক্ষনো ওভাবে ঠোঁটের নীচটা মোছে না।

তারপর শিবু দেখল জনার্দনবাবু ওত পাতার মতো করে নীচু হলেন।

তারপর হঠাৎ হাত থেকে বই ছাতা ফেলে দিয়ে খপ করে একটা ছাগলের বাচ্চাকে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিলেন। আর সেইসঙ্গে শিবু শুনতে পেল ছাগলছানার চীৎকার, আর জনার্দনবাবুর হাসি।

শিবু একলাফে ইঁটের পাঁজা থেকে নেমে আরেক লাফে আরেকটা পাঁজা টপকাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে চিৎপটাং।

'কে ওখানে?'

কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠতে গিয়ে শিবু দেখে জনার্দনবাবু হাত থেকে ছাগল নামিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছেন।

'কে, শিবরাম? চোট পেয়েছ নাকি? ওখানে কী করছিলে?'

শিবু কথা বলতে গিয়ে দেখল তার গলা শুকিয়ে গেছে। তার ইচ্ছে করছিল উল্টে জনার্দনবাবুকে জিজ্ঞেস করে—আপনি ওখানে কী করছিলেন? আপনার কোলে ছাগল কেন? আপনার জিভে জল কেন?

জনার্দনবাবু শিবুর কাছে এসে বললেন, 'ধরো, আমার হাত ধরো।'

শিবু কোনমতে হাত না ধরেই উঠে দাঁড়াল।

'তোমার বাড়ি তো কাছেই, না?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ওই লালবাড়িটা কী?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ও।'

'আমি যাই স্যার।'

'ও কি, রক্ত নাকি?'

শিবু দেখল তার হাঁটু ছড়ে গিয়ে সামান্য একটু রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, আর জনার্দনবাবু একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রয়েছেন, আর তাঁর চশমার কাঁচ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

'আমি যাই স্যার।'

শিবু কোনমতে বইগুলো খচমচিয়ে মাটি থেকে তুলে নিল।

'শোনো শিবরাম।'

জনার্দনবাবু এগিয়ে এসে শিবুর পিঠে একটা হাত রাখলেন। শিবুর বুকে কে যেন দুরমুশ পিটতে লাগল।

'তোমাকে একা পেয়ে ভালই হয়েছে। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। তোমার অঙ্কের ব্যাপারে কোন অসুবিধা হচ্ছে কি? আজ এত সহজ সহজ অঙ্ক ভুল হল কেন? যদি কোন অসুবিধে হয় তো ছুটির পর আমার বাড়িতে এসো না, আমি তোমায় দেখিয়ে দেব'খন। অঙ্কেতে যে ফুলমার্কস পাওয়া যায়! পরীক্ষায় ভালো করতে হলে অঙ্কেতে তো ভালো করতেই হবে। তুমি আসবে আমার বাড়ি?'

শিবু কোনমতে দু পা পিছিয়ে জনার্দনবাবুর হাত পিঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে ঢোক গিলে বলল, 'না স্যার। আমি নিজেই পারব স্যার। কালই ঠিক হয়ে যাবে!'

'বেশ। তবে অসুবিধে হলে বলো। আর আমাকে এত ভয় পাও কেন অ্যাঁ! এত ভয় পাও কেন? আমি কি রাক্ষস যে, কামড়ে দেব? অ্যাঁ? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ...

ইঁটখোলা থেকে এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে এসে শিবু দেখল সামনের ঘরে হীরেন জ্যাঠা এসেছেন। হীরেন জ্যাঠা কলকাতায় থাকেন, মাছ ধরার খুব শখ। বাবা আর হীরেন জ্যাঠা প্রায়ই রবিবার রবিবার মাছ ধরতে যান সরল-

দীঘিতে। এবারও বোধহয় যাবেন, কেননা শিবু দেখল পিঁপড়ের ডিম দিয়ে মাছের চার বানানো রয়েছে।

শিবু আরও দেখল যে হীরেন জ্যাঠা এবার বন্দুকও এনেছেন। সোনার-পুরের ঝিলে নাকি চখা মারতে যাবেন বাবা আর হীরেন জ্যাঠা। বাবাও বন্দুক চালান, তবে হীরেন জ্যাঠার মতো অত ভালো টিপ নেই।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে শিবু ভাবতে লাগল। জনার্দনবাবু যে রাক্ষস সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই তার মনে। ভাগ্যিস ফটিকদা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। নাহলে আজকে ইঁটখোলাতেই হয়তো...। শিবু আর ভাবতে পারল না।

বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ভজুদের বাড়ি অবধি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সামনে শিবুর পরীক্ষা, তাই রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে ভোরে উঠে পড়তে হয় ওকে। বাতি না নিভোলে ওর আবার ঘুম আসে না। অবিশ্যি চাঁদনি রাত না হলে আজ সে বাতি জ্বালিয়ে রাখত, কারণ তা না হলে বোধহয় তার ভয়ে ঘুম আসত না। মা-ও এখনো ঘরে আসেন নি। বাবা আর হীরেন জ্যাঠা সবে খেতে বসেছেন, মা তাঁদের খাওয়াচ্ছেন।

জানালার বাইরে জ্যোৎস্নার আলোয় চিকচিকে বেলগাছটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শিবুর ঘুম এসে গিয়েছিল, এমন সময় একটা জিনিস দেখে তার ঘুম ছুটে গিয়ে হাতের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল।

দূর থেকে একটা লোক তারই জানালার দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা একটু কুঁজো, আর তার চোখে চশমা। চশমার কাঁচটা চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে।

জনার্দনবাবু।

শিবুর গলা আবার শুকিয়ে এল।

জনার্দনবাবু পা টিপে টিপে বেলগাছটা পেরিয়ে ক্রমশ তার জানালার খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। শিবু তার পাশবালিশটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিকে চেয়ে একটু যেন ইতস্তত করে জনার্দনবাবু ডেকে উঠলেন, 'শিঁবরাম আঁছ?'

এ কী? গলাটা এমন খোনা কেন জনার্দনবাবুর? রাত্তিরে কি তাঁর রাক্ষুসে ভাবটা আরো বেড়ে যায়?

আবার ডাক এল—'শিঁবরাম!'

এবারে শিবুর মা দাওয়া থেকে বলে উঠলেন, 'অ শিবু! বাইরে কে ডাকচে যে! এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

জনার্দনবাবু জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মিনিটখানেক পর শিবু তাঁর গলা শুনতে পেল, 'শিবরাম তার জ্যামিতির বইটা ইঁটখোলায় ফেলে এসেছিল।

কাল আবার রবিবার তো, ইস্কুলে দেখা হবে না, আর ও তো আবার সকালে উঠে পড়বে, তাই—'

তারপর কিছুক্ষণ বিড়বিড় ফিসফিস কী কথা হল শিবু শুনতে পেল না। শুধু শেষটায় শুনল বাবার কথা, 'হ্যাঁ, তা যদি বলেন সে তো ভালই। আপনার ওখানেই না হয় পাঠিয়ে দেব।...হ্যাঁ কাল থেকে।'

শিবুর ঠোঁট নড়ল না, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না, কিন্তু তার মন চীৎকার করে বলতে লাগল, না, না, না! আমি যাব না, কিছুতেই না। তোমরা কিছু জান না। উনি যে রাক্ষস! গেলেই যে আমায় খেয়ে ফেলবেন!

পরদিন রবিবার হলেও শিবু সকালেই চলে গেল ফটিকদার বাড়ি। কত কী যে বলার আছে তার ফটিকদাকে!

ফটিকদা তাকে দেখে বলল, 'স্বাগতম্! তোর বাড়ির কাছে ফণীমনসা আছে না? আমায় কিছু এনে দিস তো দা দিয়ে কেটে। একটা নতুন রান্না মাথায় এসেছে।'

শিবু ধরা গলায় বলল, 'ফটিকদা!'

'কী?'

'তুমি যে বলছিলে না জনার্দনবাবু রাক্ষস—'

'কে বলল?'

'তুমিই তো বললে।'

'মোটেই না। তুই আমার কথাগুলোও লক্ষ্য করিস না।'

'কেন?'

'আমি বললাম তুই জনার্দনবাবুর দাঁতগুলো লক্ষ্য করিস। তারপর তুই এসে বললি তাঁর কুকুরে দাঁতগুলো বড় বড়। তারপর আমি বললাম ওরকম কুকুরে দাঁত রাক্ষসেরও হয় বলে শুনেছি। তার মানে কি জনার্দনবাবু রাক্ষস?'

'তাহলে উনি রাক্ষস নন?'

'তা তো বলি নি।'

'তবে?'

ফটিকদা দাওয়া থেকে উঠে একটা মস্ত হাই তুলে বলল, 'তোর জ্যাঠাকে যেন দেখলাম আজ। মাছ ধরতে এসেছেন বুঝি? ছিপ দিয়ে বাঘ ধরেছিল একবার ম্যাক্‌কার্ডি সাহেব। সে গল্প জানিস?'

শিবু মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'ফটিকদা, কী আজেবাজে বকছ তুমি? এদিকে জনার্দনবাবু যে সত্যিই রাক্ষস। আমি জানি তিনি রাক্ষস। আমি অনেক কিছু দেখেছি আর শুনেছি।'

তারপর শিবু গত দুদিনের ঘটনা ফটিককে বলল। ফটিক সব শুনে-টুনে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ। তা তুই এ ব্যাপারে কী করবি

কিছু ঠিক করেছিস?'

'তুমি বলে দাও না ফটিকদা। তুমি তো সব জান।'

ফটিক মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগল।

শিবু ফাঁক পেয়ে বলল, 'আমার বাড়িতে এখন একটা বন্দুক আছে।'

ফটিক দাঁত খিঁচিয়ে উঠল।

'তোর যেমন বুদ্ধি! বন্দুক আছে তো কী হয়েছে? বন্দুক দিয়ে রাক্ষস মারবি? গুলি রিবাউন্ড করে এসে যে মারছে তারই গায়ে লাগবে।'

'তাই বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বোকসন্দর!'

'তাহলে?' শিবুর গলা মিহি হয়ে আসছিল। 'তাহলে কী হবে ফটিকদা? আমাকে যে আবার বাবা আজ থেকে—'

'মেলা বকিস নি। বকে বকে কানের চিংড়ি নাড়িয়ে দিলি।'

প্রায় দু মিনিট ভাবার পর ফটিক শিবুর দিকে ফিরে বলল, 'যেতেই হবে।'

'কোথায়?'

'জনার্দনবাবুর বাড়ি।'

'সে কী?'

'ওর কুষ্ঠীটা জানতে হবে। আমি এখনো শিওর নই। কুষ্ঠী দেখলে সব বেরিয়ে যাবে। বাক্স-প্যাঁটরা ঘাঁটলে কুষ্ঠীটা বেরোবে নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু—'

'তুই থাম্। আগে প্ল্যানটা শোন্। আমরা দুজনে যাব দুপুরবেলা। আজ রোববার, লোকটা বাড়ি থাকবে। তুই বাড়ির পিছন দিকটায় গিয়ে জনার্দনবাবুকে ডাকবি। বাইরে এলে বলবি অঙ্ক বুঝতে এসেছিস। তারপর দু-একটা আজেবাজে বকে লোকটাকে আটকে রেখে দিবি। আমি সেই ফাঁকে বাড়ির সামনের দিক দিয়ে ভেতরে গিয়ে কুষ্ঠীটা বের করে নি' আসব। তারপর তুই এদিক দিয়ে পালাবি, আমি ওদিক দিয়ে পালাব। ব্যস্।'

'তারপর?' শিবুর যে প্ল্যানটা খুব ভালো লাগছিল তা নয়, কিন্তু ফটিকদার উপর নির্ভর করা ছাড়া তো তার আর কোন রাস্তাই নেই।

'তারপর তুই বিকেলে আবার আমার বাড়ি আসবি। আমি ততক্ষণে কুষ্ঠীটা দেখে কিছু পুরনো পুথিপত্তর ঘেঁটে একেবারে রেডি থাকব। যদি দেখি জনার্দনবাবু সত্যিই রাক্ষস, তাহলে তার ব্যবস্থা আমার জানা আছে। তুই ঘাবড়াস না। আর যদি দেখি রাক্ষস নয় তাহলে তো আর ভাববার কিছুই নেই।'

ফটিকদা বলেছিল দুপুরে বেরোবে। শিবু তাই খাওয়া-দাওয়া করে গিয়ে ফটিকের বাড়ি হাজির হল। মিনিট পাঁচেক পর ফটিকদা বেরিয়ে এসে বলল, 'আমার হুলোটার আবার নস্যির বাতিক হয়েছে। ঝামেলা কি কম?' শিবু লক্ষ্য করল ফটিকদার হাতে একজোড়া ছেঁড়া চামড়ার দস্তানা, আর একটা সাইকেলের ঘন্টা। ঘন্টাটা সে শিবুর হাতে দিয়ে বলল, 'এটা তুই রাখ। বিপদ হলে বাজাস। আমি এসে তোকে বাঁচাব।'

পুবপাড়ার একেবারে শেষ মাথায় দোলগোবিন্দবাবুদের বাড়ির পরেই জনার্দন মাস্টারের বাড়ি। একা মানুষ, বাড়িতে চাকর পর্যন্ত নেই। বাইরে থেকে বাড়িতে যে একটা রাক্ষস আছে সেটা বোঝবার কোন উপায় নেই।

কিছুটা রাস্তা বাকি থাকতেই শিবু আর ফটিক আলাদা হয়ে গেল।

বাড়ির পিছনে পেঁছে শিবু বুঝল যে তার আবার গলা শুকিয়ে আসছে। জনার্দনবাবুকে ডাকতে গিয়ে তার যদি গলা দিয়ে আওয়াজ না বেরোয়?

বাড়ির পিছনে পাঁচিল, তার গায়ে একটা দরজা, আর দরজার কাছেই একটা পেয়ারা গাছ। গাছের আশপাশ আগাছার জঙ্গলে ভরা।

শিবু পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। আর বেশি দেরি করলে কিন্তু ওদিকে ফটিকদার সব ভন্ডুল হয়ে যাবে।

আরেকটু বেশি সাহস পাবার জন্য শিবু পেয়ারা গাছটায় একটা হাত দিয়ে ভর করে 'মাস্টারমশাই' বলে ডাকতে যাবে, এমন সময় একটা খচমচ শব্দ পেয়ে সে চমকে নীচের দিকে চেয়ে দেখে একটা কালভৈরবী লতার ঝোপের ভিতর একটা গিরগিটি চলে গেল। আর গিরগিটিটা যেখান দিয়ে গেল তার ঠিক পাশেই সাদা সাদা কী যেন পড়ে রয়েছে।

একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঝোপটা ফাঁক করতেই শিবু দেখল—সর্বনাশ! এ যে হাড়! জন্তুর হাড়! কী জন্তু? বেড়াল, না কুকুর—না ছাগল?

'কী দেখছ ওখানে শিঁবরাম?'

শিবুর শিরদাঁড়ায় একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে পিছন ফিরে দেখল জনার্দনবাবু খিড়কি দরজা ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে তার দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে।

'কিঁছু হাঁরিয়েছ নাকি?'

'না স্যার...আ-আমি...'

'তুঁমি কি আমার কাঁছেই আঁসছিলে? তাহলে পেঁছনের দঁরজা দিয়ে কেন? এসো—ভেঁতরে এসো।'

শিবু পেছোতে গিয়ে দেখল তার একটা পা লতায় জড়িয়ে গেছে।

'আঁমার আবার কাঁল থেকে একটু সঁর্দিজ্বর হয়েছে। রাত্রে আবার তোঁমার বাড়ি গেঁলাম তো! তুমি তঁখন ঘুমোচ্ছিলে।'

শিবুর এত তাড়াতাড়ি পালানো চলবে না। ওদিকে ফটিকদার যে কাজই শেষ হবে না। মাঝখান থেকে হয়তো সে ধরাই পড়ে যাবে। একবার মনে হল ঘণ্টাটা বাজাবে। তারপর মনে হল, এখনও তো সত্যি করে তার বিপদ কিছু হয় নি। ফকিটদা হয়তো রেগেই যাবে।

'তুমি নীচু হয়ে কী দেখছিলে ব'ল তো?'

শিবু চট করে কোন উত্তর পেল না। জনার্দনবাবু এগিয়ে এসে বললেন, জায়গাটা বড় ময়লা। ওঁদিকে না যাওয়াই ভাঁলো। ভুলো কুকুরটা কোত্থেকে মাংসের হাড়গোড় এনে ফে'লে ওখানে। এ'ক-এ'কবার ভাবি ধমক দেব—কিন্তু পাঁরি না। আমার আবার জন্তু জানোয়ার ভীষণ ভাঁলো লাগে কিনা!'

জনার্দনবাবু তাঁর হাতের পিছন দিয়ে ঠোঁটের নীচটা মুছলেন।

'তুমি ভে'তরে চলো শিবু—তোমার অঙ্কের ব্যাঁপারটা—'

আর দেরি নয়! শিবু 'আজ থাক, কাল আসব' বলে, উলটোমুখো হয়ে এক দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে নীলুর বাড়ি, কার্তিকের বাড়ি, হরেনের বাড়ি পেরিয়ে একেবারে সা-বাবুদের পোড়োবাড়ির গেটের রোয়াকে এসে বসে হাঁফ ছাড়ল। আজকের ব্যাপারটা সে কোনদিন ভুলবে না। তার যে এত সাহস হতে পারে সে নিজেই ভাবতে পারে নি।

বিকেল হতে না হতে শিবু ফটিকের বাড়ি হাজির হল। না জানি কুষ্ঠী থেকে কী বার করেছে ফটিকদা!

শিবুকে দেখেই ফটিক মাথা নাড়ল।

'সব গোলমাল হয়ে গেছে রে!'

'কেন ফটিকদা? কুষ্ঠী পাও নি?'

'তা পেয়েছি। তোর অঙ্কের মাস্টার যে রাক্ষস সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু রাক্ষস নয়—পিরিণ্ডি রাক্ষস। সাংঘাতিক ব্যাপার। এরা পুরো-পুরি রাক্ষস ছিল সাড়ে-তিনশ পুরুষ আগে। কিন্তু এত তেজ যে এক-আধটা হাফ-রাক্ষস এখনও বেরিয়ে পড়ে এদের মধ্যে। পুরো রাক্ষস তো এখন সভ্য দেশে কোথাও নেই—এক আছে আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে, আর ব্রেজিল, বোর্নিও এইসব জায়গায়। তবে হাফ-রাক্ষস এখনও ক্বচিৎ-কদাচিৎ সভ্যদেশে পাওয়া যায়। জনার্দনবাবু ওই ওদের মধ্যে একজন।'

'তাহলে গোলমাল কেন?' শিবুর গলাটা একটু কে'পে গেল। ফটিকদা হাল ছেড়ে দিলে সে চোখে অন্ধকার দেখবে। 'তুমি যে সকালে বললে তোমার ব্যবস্থা জানা আছে?'

'আমার জানা নেই এমন জিনিস নেই।'

'তবে?'

ফটিকদা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, 'মাছের পেটে কী থাকে?'

এই রে! ফটিকদার আবার পাগলামি আরম্ভ হয়েছে। শিবু এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'ফটিকদা, রাক্ষসের কথা হচ্ছিল, তুমি আবার মাছ আনলে কেন?'

'কী থাকে?' ফটিক গর্জন করে উঠল।

'প-পট্‌কা?' ফটিকদার গলা শুনে শিবুর রীতিমতো ভয় লাগতে আরম্ভ করেছিল।

'তোর মাথা! এত কম বিদ্যে দিয়ে তো তুই বকের বকলসটাও লাগাতে পারবি না। শোন্। আড়াই বছর বয়সে একটা শ্লোক শিখেছিলাম, এখনও মনে আছে—

নর কি বানর কিম্বা অন্য জানোয়ার
জেনে রাখো হৃৎপিণ্ডে রহে প্রাণ তার।
রাক্ষসের প্রাণ জেনো মৎস্যের উদরে,
সেই হেতু রাক্ষস সহজে না মরে॥'

তাই তো! শিবু তো কত রূপকথার গল্পে পড়েছে মাছের পেটে থাকে রাক্ষসের প্রাণ। এটা তো তার মনে হওয়া উচিত ছিল!

শ্লোকটা আওড়ে ফটিক বলল, 'দুপুরে যখন গেলি ওর বাড়ি, জনার্দন রাক্ষসকে কেমন দেখলি?'

'বলল সর্দিজ্বর হয়েছে।'

'হবেই তো!' ফটিকদার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'হবে না? প্রাণ নিয়ে টানাটানি যে! যেই কাৎলা উঠেছে ছিপে, অমনি জ্বর। এ তো হবেই।'

তারপর শিবুর দিকে এগিয়ে এসে তার শার্টের সামনেটা খপ করে হাতের মুঠোয় খামচে ধরে ফটিক বলল, 'এখনও হয়তো সময় আছে। তোর জ্যাঠা এই আধঘণ্টা আগে সরলদীঘির ওই আধমনি কাৎলাটা ধরে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। আমি দেখেই আন্দাজ করেছি যে ওটার পেটের মধ্যেই আছে জনার্দন রাক্ষসের প্রাণ। এখন জ্বরের কথাটা শুনে আরো শিওর মনে হচ্ছে। ওই মাছটাকে চিরে দেখতে হবে।'

'কিন্তু সেটা কী করে হবে ফটিকদা?'

'সহজে হবে না। তোরই ওপর নির্ভর করছে। আর এটা না করতে পারলে যে তোর কী বিপদ হতে পারে সেটা ভাবতেও আমার ঘাম ছুটছে।'

ঘণ্টাখানেক পরে শিবু একটা দড়ির মাথায় সরলদীঘির আধমনি কাৎলাটাকে বেঁধে সেটাকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফটিকের বাড়ির সামনে এসে হাজির হল।

ফটিক বলল, 'কেউ জানতে পারে নি তো?'

শিবু বলল, 'না। বাবা চান করছিলেন, জ্যাঠামশাই শ্রীনিবাসকে দিয়ে দলাইমলাই করাচ্ছিলেন, আর মা সন্ধে দিচ্ছিলেন। নারকোলের দড়ি খুঁজতে দেরি হল। আর উঃ, যা ভারী!'

'কুছ পরোয়া নেই। মাস্‌ল হবে।'

ফটিক মাছ নিয়ে ভিতরে চলে গেল। শিবু ভাবল—কী আশ্চর্য বুদ্ধি আর জ্ঞান ফটিকদার। ওর জন্যই বোধ হয় শিবু এ যাত্রা রক্ষা পাবে। হে ভগবান—জনার্দন রাক্ষসের প্রাণটা যেন থাকে মাছটার পেটে।

মিনিট দশেক পরে ফটিক বেরিয়ে এসে শিবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'নে। এটা হাতছাড়া করবি না কক্ষনো। রাত্রে বালিশের নীচে নিয়ে শুবি। ইস্কুলে যাবার সময় প্যান্টের বাঁ পকেটে নিয়ে নিবি। এটা হাতে থাকলে রাক্ষস কেঁচো, আর হামানদিস্তায় গুঁড়িয়ে ফেললে রাক্ষস ডেড। আমার মতে গুঁড়োবার দরকার নেই, হাতে রাখলেই যথেষ্ট। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে পিরিণ্ডি রাক্ষস চুয়ান্ন বছর বয়সের পর থেকে পুরো মানুষ হয়ে গেছে। তোর জনার্দন মাস্টারের বয়স এখন তিপ্পান্ন বছর এগারো মাস ছাব্বিশ দিন।'

শিবু এবার সাহস করে তার হাতের তেলোর দিকে চেয়ে দেখল—একটা ভিজে-ভিজে মিছরির দানার মতো পাথর নতুন-ওঠা চাঁদের আলোয় চকচক করছে।

পাথরটাকে পকেটে নিয়ে শিবু বাড়ির দিকে ঘুরল। পিছন থেকে ফটিকদা বলল, 'হাতে আঁশটে গন্ধ রয়েছে তোর। ভালো করে ধুয়ে নিস। আর বোকা সেজে থাকিস, নইলে ধরা পড়ে যাবি।'

০

পরদিন অঙ্কের ক্লাসে জনার্দনবাবু ঠিক ঢোকবার আগে একটা হাঁচি দিলেন, আর তার পরেই চৌকাঠে ঠোক্কর খেয়ে তাঁর জুতোর সুকতলা হাঁ হয়ে গেল। শিবুর বাঁ হাত তখন তার প্যান্টের বাঁ পকেটের ভিতর।

ক্লাসের শেষে শিবু অনেকদিন পরে অঙ্কে দশে দশ পেল।

টেরোড্যাকটিলের ডিম

বদনবাবু আপিসের পর আর কার্জন পার্কে আসেন না।

আগে ছিল ভালো। সুরেন বাঁড়ুজ্যের স্ট্যাচুর পাশটায় ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে বিশ্রাম করে তারপর ট্রামের ভিড়টা একটু কমলে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় শিবঠাকুর লেনে বাড়ি ফিরতেন।

এখন ট্রামের লাইন ভিতরে এসে পড়ায় পার্কে বসার আর সে আনন্দ নেই। অথচ এই ভিড়ে গলদ্ঘর্ম অবস্থায় ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফেরাই বা যায় কী করে?

আর শুধু তাই নয়। দিনের মধ্যে একটা ঘণ্টা অন্তত একটু চুপচাপ বসে থেকে কলকাতার যেটুকু খোলামেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে সেটুকু উপভোগ করা—এ না হলে বদনবাবুর যেন জীবনই বৃথা। কেরানী হলেও কল্পনাপ্রবণ তিনি। এই কার্জন পার্কেই বসে মনে মনে তিনি কত গল্পই ফেঁদেছেন। কিন্তু লেখা হয়ে ওঠে নি কোনদিন। সময় কোথায়? লিখলে হয়তো নামটাম করতে পারতেন এমন বিশ্বাস তাঁর আছে।

অবিশ্যি গল্পগুলো যে সবই মাঠে মারা গেছে তা নয়।

তাঁর পঙ্গু ছেলে বিলটু এখন বড় হয়েছে। সাত বছর বয়স তার। সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ফলে তার অনেকখানি সময় হয় মা'র কাছে না-হয় বাবার কাছে গল্প শুনে কাটে। জানা গল্প, ছাপা গল্প, ভূতের গল্প, হাসির গল্প, দেশবিদেশের রূপকথা, উপকথা, প্রায় সবই তার গত তিন বছরে শোনা হয়ে গেছে। কম করে হাজার গল্প। ইদানীং বদনবাবু তাকে রোজ রাত্রে শোবার আগে একটি করে নতুন গল্প বানিয়ে বলেছেন। এ গল্প তাঁর কার্জন পার্কে বসেই বানানো।

কিন্তু গত একমাসে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে অনেকবার। যে-কটি গল্প বলেছেন তাও যে তেমন জমে নি তা বিলটুর মুখ দেখেই বোঝা গেছে। তা হবে না-ই বা কেন? একে তো এমনিতেই আপিসে কাজের চাপ, তার উপরে বিশ্রামের জায়গাটির সঙ্গে চিন্তার সুযোগটিও যে লোপ পেয়েছে।

কার্জন পার্ক ছাড়ার পর কদিন লালদিঘির ধারটায় গিয়ে বসেছিলেন। ভালো লাগে নি। টেলিফোনের ওই অতিকায় রাক্ষুসে বাড়িটা আকাশের অনেক-

খানি খেয়ে ফেলে সব মাটি করে দিয়েছে।

তারপরে অবিশ্যি লালদিঘির মাঠেও চলে এসেছে ট্রামের রাস্তা এবং বদনবাবুও বিশ্রামের অন্য জায়গা খুঁজতে বাধ্য হয়েছেন।

আজ তিনি এসেছেন গঙ্গার ধারে।

আউটরাম ঘাটের দক্ষিণে রেললাইনের ধার দিয়ে পোয়াটাক পথ গিয়ে এই বেঞ্চি। ওই দেখা যাচ্ছে তোপের কেল্লা। লোহার শিকের মাথায় বলটা এখনো রয়েছে। যেন কাঠির ডগায় আলুরদম।

বদনবাবুর ইস্কুলের কথা মনে পড়ে গেল। একটা বাজলেই গুড়ুম করে তোপের শব্দ, আর টিফিনের ছুটি, আর হেডমাস্টার হরিনাথবাবুর ট্যাঁকঘড়ি মেলানো।

জায়গাটা ঠিক নির্জন বলা চলে না। সামনেই নদীতে সার-সার নৌকো বাঁধা, আর তার উপরে মাঝিমাল্লাদের কথাবার্তা। দূরে একটা ছাই রঙের জাপানী জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে। আরো দূরে, খিদিরপুরের দিকটায়, সন্ধ্যার আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাস্তুল আর কপিকলের ঝাড়।

বাঃ, বেশ জায়গা।

বেঞ্চিটায় বসা যাক।

ওই যে শুকতারা, স্টীমারের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে আবছা আবছা দেখা যায়।

বদনবাবুর মনে হল যেন অনেকদিন তিনি এতখানি আকাশ একসঙ্গে দেখেন নি। আহা, কী বিরাট, কী বিশাল! এমন না হলে কল্পনার পাখি ডানা মেলে উড়বে কী করে?

বদনবাবু ক্যাম্বিসের জুতোটা খুলে পা তুলে বাবু হয়ে বসলেন।

আজ তিনি, একটা কেন, অনেকগুলো গল্পের প্লট ফাঁদবেন এখানে বসে। এতদিনের অভাব মিটিয়ে নেবেন।

বিলটুর খুশি-ভরা মুখটা তিনি যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন।

'নমস্কার!'

এই রে! এখানেও ব্যাঘাত?

বদনবাবু ফিরে দেখলেন একটি লিকলিকে রোগা লোক, বছর পঞ্চাশেক বয়স, পরনে খয়েরি কোট-প্যাণ্ট, কাঁধে চটের থলি। সন্ধ্যার ফিকে আলোয় মুখ ভালো বোঝা যাচ্ছে না, তবে চোখের দৃষ্টি যেন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ।

আর ওটা কী? স্টেথোস্কোপ নাকি?

ভদ্রলোকের বুকের কাছে একটি ঝোলায়মান যন্ত্র থেকে দুটি রবারের নল বেরিয়ে তাঁর কানের মধ্যে ঢুকেছে।

আগন্তুক মৃদু হেসে বললেন, 'ডিসটার্ব করছি না তো? কিছু মনে করবেন না। আপনাকে এখানে আগে কখনো দেখি নি, তাই...'

বদনবাবু বেজায় বিরক্ত হলেন। বেশ তো নিরিবিলি ছিলাম রে বাপু। কেন মিছে গায়ে পড়ে আলাপ করা? সব মাটি হয়ে গেল। বেচারি বিলটুকে কী কৈফিয়ত দেবেন তিনি?

মুখে বললেন, 'আগে আসি নি, তাই দেখেন নি আর কি। এত বড় শহরে দেখার চেয়ে না-দেখার লোকের সংখ্যাই বেশি নয় কি?'

আগন্তুক বদনবাবুর শ্লেষ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'আমি আসছি আজ চার বছর ধরে, সমানে।'

'ও।'

'ঠিক এইখানে। এই একই জায়গায়। এই বেঞ্চিতে। এটাই আমার এক্সপেরিমেন্টের জায়গা কিনা!'

এক্সপেরিমেন্ট? গঙ্গার ধারে খোলা মাঠে আবার এক্সপেরিমেন্ট কী? লোকটা ছিটগ্রস্ত নাকি?

কিংবা যদি অন্য কিছু হয়? গুন্ডা-টুন্ডা জাতীয় কিছু? কলকাতার শহর তো, কিছুই বলা যায় না।

সর্বনাশ! বদনবাবু আজই মাইনে পেয়েছেন। ট্যাঁকে রুমালে বাঁধা দুখানা কড়কড়ে একশো টাকার নোট। তাছাড়া পকেটে মানিব্যাগে নোট-খুচরো মিলিয়ে পঞ্চান্ন টাকা বত্রিশ নয়া পয়সা।

বদনবাবু উঠে পড়লেন। সাবধানের মার নেই।

'সে কী মশাই? চললেন? রাগ করলেন নাকি?'

'না, না।'

'তবে? এই তো বসলেন। এর মধ্যেই উঠছেন?'

সত্যিই তো! তিনি এমন ছেলেমানুষি করছেন কেন? ভয় কিসের? ত্রিশ গজ দূরে সামনের নৌকোগুলোতে অন্তত শ-খানেক লোক।

বদনবাবু তাও বললেন, 'যাই, দেরি হল।'

'দেরি? সবে তো সাড়ে-পাঁচটা।'

'অনেকখানি পথ যেতে হবে।'

'কতখানি?'

'সেই বাগবাজার।'

'আরে রাম রাম। তাও যদি বলতেন শ্রীরামপুর কি চুঁচড়ো—কি

নিদেনপক্ষে দক্ষিণেশ্বর।'

'তাও কম কী? ট্রামে করে পাক্কা চল্লিশ মিনিট। তার উপর দশ মিনিটের হাঁটা তো আছেই।'

'তা বটে।'

আগন্তুক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'চল্লিশ প্লাস দশ—পঞ্চাশ।...আমি আবার মিনিট-ঘণ্টার হিসেবটায় ঠিক অভ্যস্ত নই। আমাদের হচ্ছে...বসুন-না! একটুক্ষণ বসে যান।'

বদনবাবু বসলেন।

আগন্তুকের গলার স্বর আর চোখের চাহনির মধ্যে কী জানি একটা আছে যার জন্যে বদনবাবু তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন, একেই বোধহয় বলে হিপ্‌নটিজম।

আগন্তুক বললেন, 'আমি যাকে-তাকে আমার পাশে বসতে বলি না! আপনাকে দেখে মনে হল আপনি ভাবুক লোক। কেবলমাত্র টাকা-আনা-পাই-এর হিসেব নিয়ে পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন না, যেমন আর নিরানব্বুই পয়েন্ট নাইন রেকারিং পারসেন্ট লোকে থাকে।...কেমন, ঠিক বলি নি?'

বদনবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'আজ্ঞে মানে...'

'আপনি বিনয়ীও বটে। সেও ভালো। বড়াই আমি পছন্দ করি না। বড়াই করতে চাইলে আমার চেয়ে বেশি কেউ করতে পারত না।'

আগন্তুক থামলেন। তারপর কান থেকে নল দুটো খুলে যন্ত্রটা পাশে বেঞ্চির উপর রেখে বললেন, 'ভয় হয়। অন্ধকারে অসাবধানে সুইচে হাত পড়ে গেলেই কেলেঙ্কারি।'

বদনবাবুর ঠোঁটের ডগায় একটা প্রশ্ন এসে আটকে ছিল, এবার বেরিয়ে পড়ল।—

'আপনার ও যন্ত্রটা কি স্টেথোস্কোপ, না অন্য কিছু?'

ভদ্রলোক প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে গেলেন। ভারী অভদ্র তো! উত্তরের বদলে একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি লেখেন?"

'লিখি মানে—গল্প?'

'গল্প হোক, প্রবন্ধ হোক, যা-ই হোক। ব্যাপারটা হচ্ছে—ও জিনিসটা আমার ঠিক আসে না। অথচ এত সব কীর্তি, এত অভিজ্ঞতা, এত গবেষণা—এগুলো সব ভবিষ্যতের জন্য লিখে যেতে পারলে ভালো হতো।'

অভিজ্ঞতা? গবেষণা? লোকটা বলে কী?

'পর্যটক ক'রকম দেখেছেন?'

লোকটার প্রশ্নগুলোর সত্যিই কোন মাথামুণ্ডু নেই। পর্যটক একটা দেখারই বা সৌভাগ্য কতজনের হয়?

বদনবাবু বললেন, 'পর্যটক যে একরকমের বেশি হয় তাই তো জানতাম না।'

'সে কী! তিনরকম তো যে-কেউ বলতে পারে। জলচর, স্থলচর আর ব্যোমচর। প্রথম দলে ভাস্কো-ডা-গামা, ক্যাপ্টেন স্কট, কলম্বাস ইত্যাদি। স্থলে হিউয়েন সাং, মাঙ্গো পার্ক, লিভিংস্টোন, মায় আমাদের গ্লোব ট্রটার উমেশ ভট্‌চাজ্‌ পর্যন্ত। আর আকাশে—ধরুন, প্রফেসর পিকার্ড, যিনি বেলুনে পঞ্চাশ হাজার ফুট উঠেছিলেন, আর এই সেদিনের ছোকরা গাগারিন। অবিশ্যি এগুলো সবই খুব মামুলি। আমি যে ধরনের পর্যটকের কথা বলছি সেটা জলেও নয়, মাটিতেও নয়, আকাশেও নয়।'

'তবে?'

'কালে।'

'মানে?'

'কালের মধ্যে ঘোরাফেরা। অতীত কালে পাড়ি, আগামী কালে সফর। ইচ্ছেমত ভূতভবিষ্যতে বিচরণ। বর্তমানে তো আছিই, তাই ওটা নিয়ে আর মাথা ঘামাই না।'

এতক্ষণে বদনবাবুর কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। বললেন, 'এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর কথা বলছেন তো? টাইম মেশিন? সেই যে একটা সাইকেলের মত জিনিসে চেপে একটা হ্যান্ডেল টানলেই অতীত যুগে, আর আরেকটা টানলেই ভবিষ্যতে চলে যায়? সেই যে-গল্পটা নিয়ে একটা বিলিতি বায়োস্কোপ হয়েছিল?'

ভদ্রলোক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'সে তো গল্প। আমি বলছি সত্যি ঘটনা। আমার ঘটনা। আমার অভিজ্ঞতা। আমার মেশিন। কোনো সাহেব-লিখিয়ের মনগড়া গাঁজাখুরি গপ্প নয়।'

কোথায় যেন একটা স্টীমারের ভোঁ বেজে উঠল।

বদনবাবু ঈষৎ চমকে হাত দুটোকে চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে জড়সড় হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ বাদে নৌকোর বাতিগুলো ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাবে না।

ঘনায়মান অন্ধকারে আরেকবার আগন্তুকের মুখের দিকে চাইলেন বদনবাবু। সন্ধ্যার আকাশের শেষ রঙটুকু তাঁর চোখের মণিতে।

আগন্তুক আকাশের দিকে মুখটা তুলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'হাসি পায়। তিনশো বছর আগে, এইখানে, ঠিক এই বেঞ্চিটার জায়গায়, একটা কুমির ও তার মাথার উপর একটি বক বসে রোদ পোহাচ্ছিল। ওই খড়ের নৌকোটার জায়গায় একটা পাল-তোলা ওলন্দাজ জাহাজের ডেক থেকে এক নাবিক একটি গাদা বন্দুক দিয়ে কুমিরটিকে মারে। এক গুলিতেই কুমির শেষ। বকটি ঝটপটিয়ে উড়ে পালাবার সময় তার একটি পালক খসে আমার

পায়ের সামনে পড়ে। এই সেই পালক।'

আগন্তুক থলির ভিতর থেকে একটা ধবধবে সাদা পালক বার করে বদনবাবুর হাতে দিলেন।

'লাল ছিটেফোঁটাগুলো কী?'

বদনবাবুর গলা ধরে এসেছে।

আগন্তুক বললেন, 'কুমিরের রক্ত খানিকটা ছিটকে বকটার গায়ে পড়েছিল।'

বদনবাবু পালকটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

আগন্তুকের চোখের আলো মিলিয়ে আসছে। গঙ্গার স্রোতে কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছিল। এখন আর প্রায় দেখা যায় না। জল মাটি আকাশ সব ঘোলাটে একাকার হয়ে আসছে।

'এটা বুঝতে পারছেন কী জিনিস?'

বদনবাবু হাতে নিয়ে দেখলেন—একটা লোহার ছোট্ট তিনকোনা ফলক, মাথাটা ছুঁচোলো।

আগন্তুক বললেন, 'দু হাজার বছর আগে। নদীর মাঝামাঝি—ওই বয়াটার কাছ দিয়ে—একটা মকরমুখো জাহাজ বাহারের ফুলকাটা পাল তুলে সমুদ্রের দিকে চলেছে। সওদাগরি জাহাজ বোধহয়। বলিদ্বীপ-টলিদ্বীপ কোথাও বাণিজ্য করতে চলেছে। পশ্চিমের বাতাসে বত্রিশ দাঁড়ের ছপছপানি শুনতে পাচ্ছি এইখান থেকে।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ। আমি না তো কে? এইখানে—ঠিক এই বেঞ্চটার জায়গায়—একটা বটগাছের পাশে লুকিয়ে আছি।'

'লুকিয়ে কেন?'

'বাধ্য হয়ে। এত বিপদসংকুল জায়গা তা তো জানা ছিল না। ইতিহাসের পাতায় তো আর এসব লেখে নি।'

'বাঘ-টাঘের কথা বলছেন?'

'বাঘের বাড়া। মানুষ। আমার এই কোমর অবধি উঁচু নাকথ্যাবড়া মিশকালো বন্য মানুষ। কানে মাকড়ি, নাকে আংটা, গায়ে উল্কি। হাতে তীরধনুক। তীরের ডগায় বিষাক্ত ফলা।'

'বলেন কী?'

'ঠিকই বলছি। একবর্ণ মিথ্যে নেই।'

'আপনি দেখলেন?'

'শুনুন-না। বোশেখ মাস। ঝড় উঠল। আদিম ঝড়। এমন ঝড় আর ওঠে না। সেই মকরমুখো জাহাজ চোখের সামনে জলের তলায় তলিয়ে গেল।'

'তারপর?'

'তার থেকে একটি লোক ভাঙা তক্তায় চেপে হাঙর কুমিরের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কপালজোরে ডাঙায় এসে—ওরে ব্বাবা!...'

'কী?'

'সেই বন্য মানুষ তার কী দশা করল সে আপনি নিজের চোখে না দেখলে... অবিশ্যি আমিও শেষ পর্যন্ত দেখতে পারি নি। একটা তীর বটের গুঁড়িটায় এসে বিঁধেছিল। সেইটেকে নিয়ে সুইচ টিপে বর্তমানে ফিরে আসি।'

বদনবাবু হাসবেন না কাঁদবেন না অবাক হবেন তা বুঝতে পারলেন না। ওই সামান্য যন্ত্র আর ওই দুটো নলের মধ্যে এত জাদু আছে নাকি? এও কি সম্ভব?

আগন্তুক বদনবাবুর মনের প্রশ্নটা হয়তো আন্দাজ করেই বললেন, 'এই যে দেখছেন যন্ত্রটি—কানের ভিতর নল দুটো ঢুকিয়ে এই ডান দিকের সুইচ টিপলেই ভবিষ্যতে, আর বাঁ দিকের টিপলেই অতীতে চলে যাওয়া যায়। কোন্ যুগের কোন্ সময়টিতে যেতে চান সেটাও এই দাগ-কাটা সন-লেখা চাকার উপর কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক করে নেওয়া যায়। অবিশ্যি বিশ-ত্রিশ বছর এদিক-ওদিক হয়ে যায় মাঝে মাঝে—কিন্তু তাতে বিশেষ এসে যায় না। সস্তার জিনিস তো—তাই অত অ্যাকিউরেট নয় আর কি!'

'সস্তা বুঝি?' এবার বদনবাবু সত্যিই অবাক।

'সস্তা মানে অবিশ্যি কেবল পয়সার দিক দিয়েই। এর পেছনে রয়েছে পাঁচ হাজার বছরের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিদ্যে বুদ্ধি। আজকাল লোকে ভাবে বিজ্ঞানের যত কারসাজি সবই বুঝি পশ্চিমে, এদেশে আর কী হচ্ছে? আরে বাপু, এদেশে যা হচ্ছে তা কি আর ঢাক পিটিয়ে হচ্ছে? তা হচ্ছে সব গোপনে, অগোচরে, লোকচক্ষুর আড়ালে। নাম জাহির করার ব্যাপারটা আমাদের দেশে কোন কালেই ছিল না। এখনও নেই। আসল যারা গুণী তাদের হয়তো দেখাই পাবেন না কোনদিন। দেখুন-না ইতিহাসের দিকে। অজন্তা গুহার ছবি কে বা কারা এঁকেছেন তাঁদের নাম জানেন? হাজার বছরের পুরনো পাহাড়ের গা থেকে খোদা এলোরার মন্দির কে গড়ল তার নাম জানে কেউ? ভৈরবী রাগ কার সৃষ্টি? ঋগ্বেদ লিখল কে? মহাভারত বেদব্যাসের নামে চলেছে—আর আমরা বলি বাল্মীকির রামায়ণ। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে কত শতসহস্র নাম-না-জানা লোকের হাত আছে মাথা আছে তার হিসেব রাখে কেউ? এই যে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা বড় বড় অঙ্ক কষে ফরমুলা কষে সব বড় বড় আবিষ্কার করে নাম কিনছেন—এই অঙ্কের গোড়ার কথাটা জানেন?'

গোড়ার কথা? কী গোড়ার কথা? বদনবাবু তো জানেন না।

আগন্তুক বললেন, 'শূন্য।'

'শূন্য?'

'শূন্য। 'Zero' l

বদনবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

'ওয়ান টু থ্রী ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন্ এইট নাইন—জিরো। এই দশটার বেশি আর সংখ্যা নেই। শূন্য—অর্থাৎ ফক্কা। অথচ একের পিঠে শূন্য দিলে হল গিয়ে দশ, নয়ের এক বেশি। ম্যাজিক! ভাবলে কূলকিনারা পাবেন না। অথচ আমরা মেনে নিচ্ছি। কেন মানছি তাও বুঝতে পারবেন না। কিন্তু এই ন-টি সংখ্যা আর শূন্য এই দিয়ে রাজ্যির যত অঙ্ক, যত হিসেব, যত ফরমুলা। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ত্রৈরাশিক ভগ্নাংশ ডেসিম্যাল আলজেব্রা এরিথমেটিক ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যাস্ট্রনমি, মায় অ্যাটম রকেট রিলেটিভিটি—এর একটিও এই দশটি সংখ্যা ছাড়া হবার জো নেই। আর এই সংখ্যা এল কোত্থেকে জানেন? ভারতবর্ষ। এখান থেকে আরবদেশ, আরব থেকে ইউরোপ এবং তারপর সারা পৃথিবী। বুঝেছেন? এর আগে কী ছিল জানেন?'

বদনবাবু আবার ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। সত্যি, তাঁর জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ!

আগন্তুক বললেন, 'আগে ছিল রোম্যান কায়দা। সংখ্যা নেই। কেবল অক্ষর। এক হল I, দুই হল II, তিন হল III, কিন্তু চার হয়ে গেল আবার দু অক্ষর—IV। আর পাঁচ হল এক অক্ষর—V। নিয়মের কোন মাথামুণ্ডু নেই। বাংলায় উনিশশো বাষট্টি লিখতে চার অক্ষর লাগে। আর রোম্যানে কত জানেন?'

'কত?'

'সাত। MCMDCII। বুঝলেন কিছু? আটশো আটাশি লিখতে বাংলার তিন অক্ষরের জায়গায় রোম্যানে কত লাগে জানেন! এক ডজন। DCCCLXXXVIII। এই হালে বিজ্ঞানের বড় বড় ফরমুলা লিখতে বৈজ্ঞানিকদের কী অবস্থা হত ভাবতে পারেন? ত্রিশ পেরোতে না পেরোতে দেখতেন হয় সব চুল পেকে গেছে নাহয় টাক পড়ে গেছে। আর চাঁদে রকেট পাঠানোর ব্যাপারটা তো নির্ঘাত আরো হাজার বছর পিছিয়ে যেত। ভেবে দেখুন, আমাদেরই দেশের একটি অখ্যাত অজ্ঞাত লোকের আশ্চর্য বুদ্ধির জোরে অঙ্কের ভোল পালটে গেল।'

আগন্তুক দম নেবার জন্য থামলেন।

গির্জার ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ ভেসে আসছে। ছ-টা বাজল।

আলো হঠাৎ বাড়ল কেন?

বদনবাবু পুব দিকে চেয়ে দেখলেন গ্র্যাণ্ড হোটেলের ছাতের পিছন দিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে।

আগন্তুক বললেন, 'আগে যেমন, এখনও তাই। দেশে ঢের লোক আছে

যাদের নামধাম কেউ জানেও না, জানবেও না; কিন্তু তাদের বিদ্যেবুদ্ধি পশ্চিমের কোন বৈজ্ঞানিকের চেয়ে একচুল কম নয়। এঁদের সাধারণত কাগজ পেনসিল বইপত্তর ল্যাবরেটরি-ট্যাবরেটরির কোন দরকার হয় না। এঁরা নিরিবিলি চুপচাপ বসে ভাবেন, আর মাথার মধ্যে ভারী ভারী ফরমুলা কষে ভারী ভারী সমস্যার সমাধান করেন।'

আগন্তুক থামতে বদনবাবু মৃদুস্বরে বললেন, 'আপনি কি তাঁদেরই মধ্যে একজন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না। তবে এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ বরাতজোরে একবার আমি পেয়েছিলাম। এখানে নয় অবিশ্যি। এ তল্লাটেই নয়। জোয়ান বয়সে পায়ে হেঁটে অনেক ঘুরেছি পাহাড়ে-টাহাড়ে। তাদেরই একটাতে। অসাধারণ পুরুষ। নাম গণিতানন্দ। ইনি অবিশ্যি লিখেই অঙ্ক কষতেন। ইনি যেখানে থাকতেন তার আশেপাশে ত্রিশ মাইলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে যতগুলি পাথরের চাঁই ছিল তার প্রত্যেকটির পা থেকে মাথা অবধি অঙ্কের হিজি-বিজিতে ভরা। খড়ি দিয়ে লেখা। তাঁর যিনি গুরু, তাঁর কাছ থেকেই গণিতানন্দ অতীত-ভবিষ্যতে বিচরণের রহস্য জানতে পেরেছিলেন। আমি গণিতানন্দের কাছ থেকেই জেনেছিলুম যে এভারেস্টের চেয়েও পাঁচহাজার ফুট উঁচু একটি পাহাড়ের চুড়ো ছিল হিমালয়ে। আজ থেকে সাতচল্লিশ হাজার বছর আগে একটা প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে এই পাহাড়ের অর্ধেকটা নাকি মাটির ভেতর ঢুকে যায়। এবং এই একই ভূমিকম্পে নাকি উত্তর-হিমালয়ের একটি পাহাড়ে ফাটল ধরে তার থেকে একটি ঝরনা বেরিয়ে এই যে নদীটি বয়ে যাচ্ছে আমাদের সামনে দিয়ে, সেটির সৃষ্টি করে।'

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

বদনবাবু চাদরের খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'আপনার ওই যন্ত্রটি কি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া?'

আগন্তুক বললেন, 'হ্যাঁ। মানে, ঠিক পাওয়া নয়। উনি উপাদান বলে দিয়েছিলেন। আমি সেই সব মালমসলা সংগ্রহ করে যন্ত্রটি নিজেই তৈরি করে নিয়েছি। এই যে নলটা দেখছেন, এটা কিন্তু রবার নয়। এটা একরকম পাহাড়ী গাছের ডাল। এই যন্ত্রের একটি জিনিসের জন্যেও আমাকে কোন দোকানে বা কারিগরের কাছে যেতে হয় নি। এর সমস্তই প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি। ডায়ালটায় দাগ কেটে নম্বর বসিয়েছি আমি নিজে হাতে। তবে, নিজের হাতের তৈরি বলেই হয়তো মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। ভবিষ্যতের সুইচটা তো ক'দিন হল কাজই করছে না।'

'আপনি ভবিষ্যতে গেছেন?'

'একবারই। তবে বেশি দূরে না। ত্রিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি।'

'কেমন দেখলেন?'

'দেখব কী? এইখানে তখন বিরাট রাস্তা আর আমি একমাত্র মানুষ পায়ে হাঁটছি। এক উদ্ভট গাড়ির তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেস্‌লাম। তারপর আর যাই নি।'

'আর অতীতে কতদূর গেছেন?'

'ওই আরেকটা গোলমাল। আমার এই যন্ত্রে সৃষ্টির গোড়ায় পেঁছনো যায় না।'

'বটে?'

'না। আমি অনেক চেষ্টা করেও সবচেয়ে পেছন যা গেছি তখন অলরেডি সরীসৃপেরা এসে গেছে।'

বদনবাবুর গলা শুকিয়ে এল। বললেন, 'কী সরীসৃপ? সাপ...?'

'আরে না না। সাপ তো ছেলেমানুষ।'

'তবে?'

'এই ধরুন, ব্রণ্টোসরাস, টিরানোসরাস, ডাইনোসরাস, এই সব আর কি।'

'তার মানে আপনি কি ওদেশেও গেছেন নাকি?'

'ওই তো ভুল! ওদেশে কেন? আপনার কি ধারণা এসব জিনিস আমাদের দেশে ছিল না?'

'ছিল নাকি?'

'ছিল মানে? এই ঠিক এইখানটাতেই ছিল। এই বেঞ্চির পাশটাতেই।'

বদনবাবুর মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল।

আগন্তুক বললেন, 'গঙ্গা নামে নি তখনো। এই সব জায়গায় তখন ছিল এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ঢিপি, আর লতাপাতা গাছপালার জঙ্গল। সে দৃশ্য ভুলব না। ওই জেটির জায়গাটায় একটা শেওলাভরা ডোবা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। একটা আলেয়া ধক্ করে জ্বলে উঠে মিনিটখানেক দুলে দুলে নিভে গেল। তারই আলোয় দেখলাম দুটো ভাঁটার মত চোখ। চাইনীজ ড্রাগনের ছবি দেখেছেন তো? এও ঠিক তাই। বইএ ছবি দেখা ছিল। বুঝলুম এই সেই স্টেগোসরাস। কিসের জানি পাতা চিবুতে চিবুতে জলার উপর দিয়ে ছপছপ করে এগিয়ে আসছে। মানুষ খাবে না জানি, কারণ এরা উদ্ভিদ্‌জীবী, কিন্তু তাও দেখি ভয়ে ঢোক গিলতে পারছি না। বর্তমানে ফিরে আসার সুইচটা টিপতে যাব, এমন সময় আমার মাথার উপর হঠাৎ একটা ঝটাপট শব্দ শুনে চমকে চেয়ে দেখি একটা টেরোড্যাকটিল—সে না পাখি, না জানোয়ার, না বাদুড়—জন্তুটার দিকে গোঁত খেয়ে ধাওয়া করে গেল। এ আক্রোশের কারণ বুঝলাম হঠাৎ আমার পাশেই পাথরের ঢিবিটার দিকে চোখ পড়াতে। পাথরের গায়ে একটা বেশ বড় ফাটলে দেখি একটা সাদা গোল চকচকে ডিম।

টেরোড্যাকটিলের ডিম। দেখে ভয়ের মধ্যেও লোভ সামলাতে পারলুম না। ওদিকে লড়াই বেধেছে, আর এদিকে আমি দিব্যি ডিমটি বগলস্থ করে নিয়ে... হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।'

বদনবাবুর কিন্তু হাসি পেল না। গল্পের জগতের বাইরে হয় নাকি এসব?

'যন্ত্রটা আপনাকে পরীক্ষা করতে দিতাম, কিন্তু—'

বদনবাবুর কপালের শিরা দপদপ করে উঠল। ঢোঁক গিলে বললেন, 'কিন্তু কী?'

'ফল পাবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'কে-কেন?'

'তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। লাভ না-হলেও, ক্ষতির সম্ভাবনা তো নেই।'

বদনবাবু গলা বাড়িয়ে দিলেন। জয় মা জগত্তারিণী! নিরাশ কোরো না মা!

আগন্তুক নলের মুখ দুটি বদনবাবুর দু কানে গুঁজে দিয়ে সুইচটা টিপে খপ করে তাঁর ডান হাতের কবজিটা ধরে ফেললেন।

'নাড়ীটা দেখতে হবে।'

বদনবাবু বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে মিহি গলায় বললেন, 'অতীত, না ভবিষ্যৎ?'

আগন্তুক বললেন, 'অতীত। সিক্স থাউসেণ্ড বি. সি.। চোখটা চেপে বন্ধ করুন।'

বদনবাবু অধীর উৎকণ্ঠায় মিনিটখানেক চোখ বুজে বসে থেকে বললেন, 'কই কিছু হচ্ছে না তো।'

আগন্তুক যন্ত্রটা খুলে নিলেন।

'হবার সম্ভাবনা ছিল কোটিতে এক।'

'কেন?'

'আমার মাথার আর আপনার মাথার চুলের সংখ্যা যদি এক হত তাহলেই আপনার ক্ষেত্রে যন্ত্রটা কাজ করত।'

বদনবাবু ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেলেন। হায় হায় হায়! এমন সুযোগটা এভাবে নষ্ট হল?

আগন্তুক আবার থলির ভেতর হাত ঢোকালেন।

চাঁদের আলোয় এখন চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি?' বদনবাবু কথাটা জিজ্ঞেস করার লোভ সামলাতে পারলেন না।

আগন্তুক সাদা গোল চকচকে জিনিসটা এগিয়ে দিলেন।

বেশ ভারী। আর আশ্চর্য মসৃণ।

'দিন। এবার উঠতে হয়। রাত হল।'

বদনবাবু ডিমটা ফিরিয়ে দিলেন। আরো কত অভিজ্ঞতা আছে এ'র কে জানে। বললেন, 'কাল আবার আসছেন তো এইখানে?'

'দেখি। কাজ তো পড়ে আছে অনেক। বই-এ লেখা ঐতিহাসিক তথ্যগুলো তো এখনো কিছুই যাচাই করা হয় নি। কলকাতার গোড়াপত্তনের ব্যাপারটাও দেখতে হবে একবার। চার্নক বাবাজীকে নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করেছে এরা।......আজ আসি। জয় গুরু!'

*   *   *

ট্রামে উঠেই বদনবাবুকে একটা বাজে অজুহাতে আবার নেমে যেতে হল। কারণ পকেটে হাত দিয়েই তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন।

মানিব্যাগটা উধাও।

বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝেছি। যখন চোখ বন্ধ করেছিলাম, আর লোকটা হাত ধরল নাড়ী দেখতে...ইস্, ছি ছি ছি! কী বেকুবই না বনেছি আজ।'

বাড়ি যখন পেঁছলেন তখন আটটা।

বাবাকে দেখে বিলটুর মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এতক্ষণে কিন্তু বদনবাবুও অনেকটা হালকা বোধ করছেন।

জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, 'আজ তোকে একটা ভালো গল্প বলব।'

'সত্যিই তো? অন্যদিনের মত নয় তো?'

'না রে। সত্যিই।'

'কিসের গল্প বাবা?'

'টেরোড্যাকটিলের ডিম। আর তাছাড়া আরো অনেক। একদিনে ফুরোবে না।'

সত্যি বলতে কী, বিলটুর খুশির খোরাক আজ একদিনে যত পেয়েছেন তিনি, তার দাম কি অন্তত পঞ্চান্ন টাকা বত্রিশ নয়া পয়সাও হবে না?

বাদুড় বিভীষিকা

বাদুড় জিনিসটা আমার মোটেই ধাতে সয় না। আমার ভবানীপুরের ফ্ল্যাটের ঘরে মাঝে মাঝে যখন সন্ধের দিকে জানালার গরাদ দিয়ে নিঃশব্দে এক-একটা চামচিকে ঢুকে পড়ে, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। বিশেষত গ্রীষ্মকালে যখন পাখা ঘোরে, তখন যদি চামচিকে ঢুকে মাথার উপর বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকে আর খালি মনে হয় এই বুঝি ব্লেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে ছটফট শুরু করবে, তখন যেন আমি একেবারে দিশেহারা বোধ করি। প্রায়ই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। আর আমার চাকর বিনোদকে বলি, ওটাকে তাড়াবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করো। একবার তো বিনোদ আমার ব্যাডমিনটন র‍্যাকেটের এক বাড়িতে একটা চামচিকে মেরেই ফেলল। সত্যি বলতে কি, কেবলমাত্র যে অসোয়াস্তি হয় তা নয়; তার সঙ্গে যেন একটা আতঙ্কের ভাবও মেশানো থাকে। বাদুড়ের চেহারাটাই আমার বরদাস্ত হয় না—না পাখি, না জানোয়ার, তার উপরে ওই যে মাথা নীচু করে পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়িয়ে ঝুলে থাকা, এইসব মিলিয়ে মনে হয় বাদুড় জীবটার অস্তিত্ব না থাকলেই বোধহয় ভালো ছিল।

কলকাতায় আমার ঘরে চামচিকে এতবার ঢুকেছে যে আমার তো এক-এক সময় মনে হয়েছে আমার উপর বুঝি জানোয়ারটার একটা পক্ষপাতিত্ব রয়েছে! কিন্তু তাই বলে এটা ভাবতে পারি নি যে শিউড়িতে এসে আমার বাসস্থানটিতে ঢুকে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চেয়েই দেখব সেখানেও একটি বাদুড় ঝোলায়মান। এ যে রীতিমত বাড়াবাড়ি। ওটিকে বিদেয় না করতে পারলে তো আমার এ ঘরে থাকা চলবে না!

এই বাড়িটার খোঁজ পাই আমার বাবার বন্ধু তিনকড়িকাকার কাছ থেকে। এককালে ইনি শিউড়িতে ডাক্তারি করতেন। এখন রিটায়ার করে কলকাতায় আছেন। বলা বাহুল্য, শিউড়িতে এঁর অনেক জানাশোনা আছে। তাই আমার যখন দিন সাতেকের জন্য শিউড়িতে যাবার প্রয়োজন হল, আমি তিনকড়িকাকার কাছেই গেলাম। তিনি শুনে বললেন, 'শিউড়ি? কেন? শিউড়ি কেন? কী করা হবে সেখানে?'

আমি বললাম যে বাঙলাদেশের প্রাচীন পোড়াইঁটের মন্দিরগুলো সম্বন্ধে

আমি গবেষণা করছি। একটা বই লেখারও ইচ্ছে আছে। এমন সুন্দর সব মন্দির চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, অথচ সেই নিয়ে কেউ আজ অবধি একটা প্রামাণ্য বই লেখে নি।

'ওহো, তুমি তো আবার আর্টিস্ট। তোমার বুঝি ওই দিকে শখ? তা বেশ বেশ। কিন্তু শুধু শিউড়ি কেন? ওরকম মন্দির তো বীরভূমের অনেক জায়গাতেই রয়েছে। সুরুল, হেতমপুর, দুবরাজপুর, ফুলবেরা, বীরসিং-পুর—এ সব জায়গাতেই তো ভালো ভালো মন্দির আছে। তবে সে-সব কি এতই ভালো যে তাই নিয়ে বই লেখা যায়?'

যাই হোক—তিনকড়িকাকা একটা বাড়ির সন্ধান দিয়ে দিলেন আমায়।

'পুরোনো বাড়িতে থাকতে তোমার আপত্তি নেই তো? আমার এক পেশেণ্ট থাকত ও বাড়িতে। এখন কলকাতায় চলে এসেছে। তবে যতদূর জানি, দারোয়ান-গোছের লোক একটি থাকে সেখানে দেখাশোনা করবার। বেশ বড় বাড়ি। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। পয়সাকড়িও লাগবে না—কারণ পেশেণ্টটিকে আমি একেবারে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম, তিন-তিনবার। দিন সাতেকের জন্য তার বাড়ির একটা ঘরে একজন গেস্ট থাকবে, আমি এমন অনুরোধ করলে সে খুশী হয়েই রাজী হবে।'

হলও তাই। কিন্তু সাইক্‌ল্‌ রিকশ করে স্টেশন থেকে মালপত্র নিয়ে বাড়িটায় পৌঁছে ঘরে ঢুকেই দেখি বাদুড়।

বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বৃদ্ধ দারোয়ান-গোছের লোকটিকে হাঁক দিলাম:

'কী নাম হে তোমার?'

'আজ্ঞে, মধুসূদন।'

'বেশ, তা মধুসূদন—ওই বাদুড়বাবাজী কি বরাবরই এই ঘরে বসবাস করেন, না আজ আমাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন?'

মধুসূদন কড়িকাঠের দিকে চেয়ে মাথা চুলকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে তা তো খেয়াল করি নি বাবু। এ ঘরটা তো বন্ধই থাকে; আজ আপনি আসবেন বলে খোলা হয়েছে।'

'কিন্তু ইনি থাকলে তো আবার আমার থাকা মুশকিল।'

'ও আপনি কিছু ভাববেন না বাবু। ও সন্ধে হলে আপনিই চলে যাবে।'

'তা না হয় গেল। কিন্তু কাল যেন আবার ফিরে না আসে তার একটা ব্যবস্থা হবে কি?'

'আর আসবে না। আর কি আসে? এ তো আর বাসা বাঁধে নি যে আসবে। রাত্তিরে কোন্‌ সময় ফস করে ঢুকে পড়েছে। দিনের বেলা তো চোখে দেখতে পায় না, তাই বেরুতে পারে নি।'

চা-টা খেয়ে বাড়ির সামনের বারান্দাটায় একটা পুরোনো বেতের চেয়ারে

এসে বসলাম।

বাড়িটা শহরের এক প্রান্তে। সামনে উত্তর দিকে কার যেন মস্ত আম-বাগান। গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে দূরে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত দেখা যায়। পশ্চিম দিকে একটা বাঁশঝাড়ের উপর দিয়ে একটা গির্জের চুড়ো দেখা যায়। শিউড়ির এটি একটি বিখ্যাত প্রাচীন গির্জা। রোদটা পড়লে একটু ওদিকটায় ঘুরে আসব বলে স্থির করলাম। কাল থেকে আবার কাজ শুরু করব। খোঁজ নিয়ে জেনেছি শিউড়ি এবং তার আশপাশে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে অন্তত খান ত্রিশেক পোড়াইঁটের মন্দির আছে। আমার সঙ্গে ক্যামেরা আছে, এবং অপর্যাপ্ত ফিল্ম। এইসব মন্দিরের গায়ের প্রতিটি কারুকার্যের ছবি তুলে ফেলতে হবে। ইঁটের আয়ু আর কতদিন? এসব নষ্ট হয়ে গেলে বাঙলাদেশ তার এক অমূল্য সম্পদ হারাবে।

আমার রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে দেখি সাড়ে পাঁচটা। গির্জের মাথার পিছনে সূর্য অদৃশ্য হল। আমি আড় ভেঙে চেয়ার ছেড়ে উঠে সবে বারান্দার সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় আমার কান ঘেঁষে শন শন শব্দ করে কী যেন একটা উড়ে আমবনের দিকটায় চলে গেল।

শোবার ঘরে ঢুকে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দেখি—বাদুড়টা আর নেই।

যাক—বাঁচা গেল। সন্ধেটা অন্তত নির্বিঘ্নে কাটবে। হয়তো বা আমার লেখার কাজও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে। বর্ধমান, বাঁকুড়া আর চব্বিশ পরগনার মন্দিরগুলো এর আগেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো সম্পর্কে লেখার কাজটা শিউড়িতে থাকতে থাকতেই আরম্ভ করব ভেবেছিলাম।

রোদটা পড়তে আমার টর্চটা হাতে নিয়ে গির্জের দিকটা বেরিয়ে পড়লাম। বীরভূমের লাল মাটি, অসমতল জমি, তাল আর খেজুর গাছের সারি—এসবই আমার বড় ভালো লাগে। তবে শিউড়িতে আমার এই প্রথম আসা। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যে যদিও আসি নি—তবুও এই সন্ধেটায় লাল গির্জের আশপাশটা ভারি মনোরম লাগল। হাঁটতে হাঁটতে গির্জে ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে আরো খানিকটা পথ এগিয়ে গেলাম। সামনে দেখলাম খানিকটা জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা। দূর থেকে কারো বাগান বলে মনে হয়। একটা লোহার গেটও রয়েছে বলে মনে হল।

আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম—বাগান নয়, গোরস্থান। খান ত্রিশেক খ্রীষ্টানদের কবর রয়েছে গোরস্থানটায়। কোনোটির উপর কারু-কার্য-করা পাথর বা ইঁটের স্তম্ভ। আবার কোনোটিতে মাটিতে শোয়ানো পাথরের ফলক। এগুলো যে খুবই পুরোনো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্তম্ভগুলিতে ফাটল ধরেছে। আবার ফাটলের মধ্যে এক-একটাতে অশ্বথের চারা গজিয়েছে।

গেটটা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকে ফলকের উপর অস্পষ্ট লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করলাম। একটায় দেখলাম সন ১৭৯৩। আরেকটায় ১৭৮৮। সবই সাহেবদের কবর, ইংরেজ রাজত্বে গোড়ার যুগে ভারতবর্ষে এসে নানান মহামারীর প্রকোপে অধিকাংশেরই অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়েছে। একটা ফলকে লেখাটা একটু স্পষ্ট আছে দেখে আমার টর্চটা জ্বালিয়ে ঝুঁকে সেটা পড়তে যাব, এমন সময় আমার পিছনেই যেন একটা পায়ের শব্দ পেলাম। ঘুরে দেখি একটি মাঝবয়সী বেঁটে-গোছের লোক হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আমারই দিকে হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছে। লোকটার পরনে একটা কালো আলপাকার কোট, একটা ছাইরঙের পেন্টুলুন আর হাতে একটা তালি-দেওয়া ছাতা।

'আপনি বাদুড় জিনিসটাকে বিশেষ পছন্দ করেন না—তাই না?'

ভদ্রলোকের কথায় চমকে উঠলুম। এটা সে জানল কী করে? আমার বিস্ময় দেখে ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ভাবছেন কী করে জানলুম? খুবই সোজা। আপনি যখন আপনার বাড়ির দারোয়ানটিকে আপনার ঘরের বাদুড়-টাকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলছিলেন, তখন আমি কাছাকাছিই ছিলুম।'

'ওঃ, তাই বলুন।'

ভদ্রলোক এইবার আমাকে নমস্কার করলেন।

'আমার নাম জগদীশ পার্সিভ্যাল মুখার্জি। আমাদের চার পুরুষের বাস এই শিউড়িতে। খ্রীষ্টান তো—তাই সন্ধের দিকটা গির্জা-গোরস্থানের আশ-পাশটায় ঘুরতে বেশ ভালো লাগে।'

অন্ধকার বাড়ছে দেখে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা ফেরালুম। ভদ্রলোক আমার সঙ্গ নিলেন। কেমন যেন লাগছিল লোকটিকে। এমনিতে নিরীহ বলেই মনে হয়—কিন্তু গলার স্বরটা যেন কেমন কেমন—মিহি, অথচ রীতিমত কর্কশ। আর গায়ে পড়ে যেসব লোক আলাপ করে তাদের আমার এমনিতেই ভালো লাগে না।

টর্চের বোতাম টিপে দেখি সেটা জ্বলছে না। মনে পড়ল হাওড়া স্টেশনে একজোড়া ব্যাটারি কিনে নেব ভেবেছিলাম—সেটা আর হয় নি। কী মুশকিল! রাস্তায় সাপখোপ থাকলে তা দেখতেও পাব না।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি টর্চের জন্য চিন্তা করবেন না। অন্ধকারে চলাফেরার অভ্যাস আছে আমার। বেশ ভালোই দেখতে পাই। সাবধান—একটা গর্ত আছে কিন্তু সামনে!'

ভদ্রলোক আমার হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বাঁ দিকে সরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে জানেন?'

সংক্ষেপে বললুম, 'জানি।'

ভ্যাম্পায়ার কে না জানে? রক্তচোষা বাদুড়কে বলে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। ঘোড়া গোরু ছাগল ইত্যাদির গলা থেকে রক্ত চুষে খায়। আমাদের দেশে এ বাদুড় আছে কিনা জানি না, তবে বিদেশী বইএ ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথা পড়েছি। শুধু বাদুড় কেন—বিদেশী ভূতুড়ে গল্পের বইএ পড়েছি মাঝ রাত্তিরে কোনো কোনো কবর থেকে মৃতদেহ বেরিয়ে এসে জ্যান্ত ঘুমন্ত মানুষের গলা থেকে রক্ত চুষে খায়। তাদেরও বলে ভ্যাম্পায়ার। কাউণ্ট ড্র্যাকুলার রোমহর্ষক কাহিনী তো ইস্কুলে থাকতেই পড়েছি।

আমার বিরক্ত লাগল এই ভেবে যে বাদুড়ের প্রতি আমার বিরূপ মনোভাবের কথা জেনেও ভদ্রলোক আবার গায়ে পড়ে বাদুড়ের প্রসঙ্গ তুলছেন কেন।

এর পরে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আমবাগানটা পাশ কাটিয়ে বাড়ির কাছাকাছি পেঁছিতে ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ আনন্দিত হলুম। আছেন তো ক'দিন?'

বললুম, 'দিন সাতেক।'

'বেশ বেশ—তাহলে তো দেখা হবেই।' তারপর গোরস্থানের দিকটায় আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'সন্ধের দিকটায় ওদিক পানে এলেই আমার দেখা পাবেন। আমার বাপ-পিতেমহর কবরও ওইখানেই আছে। কাল আসবেন, দেখিয়ে দেব।'

মনে মনে বললুম, তোমার সঙ্গে যত কম দেখা হয় ততই ভালো। বাদুড়ের উৎপাত যেমন অসহ্য, বাদুড় সম্পর্কে আলোচনাও তেমনিই অতৃপ্তিকর। অনেক অন্য বিষয়ে চিন্তা করার আছে।

বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় পিছন ফিরে দেখলুম ভদ্রলোক অন্ধকার আমবনটার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বনের পিছনের ধানক্ষেতের দিক থেকে তখন শেয়ালের কোরাস আরম্ভ হয়ে গেছে।

আশ্বিন মাস—তাও যেন কেমন গুমোট করে রয়েছে। খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ভাবলুম বাদুড়ের ভয়ে জানালা-দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলুম—সেগুলো খুলে দিলে বোধহয় কিছুটা আরাম হতে পারে।

কিন্তু দরজাটা খুলতে ভরসা হল না। বাদুড়ের জন্য নয়। দারোয়ান বাবাজীর ঘুম যদি হালকা হয়, চোরের উপদ্রব থেকেও বোধ হয় রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সব মফস্বল শহরে মাঝে মাঝে দেখা যায়—দরজা খোলা রাখলে রাস্তার কুকুর ঘরে ঢুকে চটিজুতোর দফা রফা করে দিয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা আমার আগে অনেকবার হয়েছে। তাই অনেক ভেবে দরজা দুটো

না খুলে পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলে দিলুম। দেখলুম বেশ ঝিরঝির করে হাওয়া আসছে।

ক্লান্ত থাকায় ঘুম আসতে বেশি সময় লাগল না।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলুম জানালার গরাদে মুখ লাগিয়ে সন্ধেবেলার সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়ে হাসছেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ, আর দাঁতগুলো কেমন যেন সরু সরু আর ধারালো। তারপর দেখলুম ভদ্রলোক দু পা পিছিয়ে গিয়ে হাতদুটোকে উঁচু করে এক লাফ দিয়ে গরাদ ভেদ করে ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন। ভদ্রলোকের পায়ের শব্দেই যেন আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

চোখ মেলে দেখি ভোর হয়ে গেছে। কী বিদঘুটে স্বপ্ন রে বাবা!

বিছানা ছেড়ে উঠে মধুসূদনকে একটা হাঁক দিয়ে বললুম চা দিয়ে যেতে। সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে না পড়লে কাজের অসুবিধে হবে।

মধুসূদন বারান্দায় বেতের টেবিলে চা রেখে চলে যাবার সময় লক্ষ্য করলুম তাকে যেন কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বললুম, 'কী হল মধুসূদন? শরীর খারাপ নাকি? না রাত্রে ঘুম হয় নি?'

মধু বললে, 'না বাবু, আমার কিছুই হয় নি। হয়েছে আমার বাছুরটার।'

'কী হল আবার?'

'কাল রাত্তিরে সাপের কামড় খেয়ে মরে গেছে।'

'সে কী! মরেই গেল?'

'আজ্ঞে, তা আর মরবে না? এই সবে সাতদিনের বাছুর! গলার কাছটায় মেরেছে ছোবল, কী জানি গোখরো না কী!

মনটা কেমন জানি খচ করে উঠল। গলার কাছে? গলায় ছোবল? কালই যেন—

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। জন্তুজানোয়ারের গলা থেকে রক্ত শুষে নেয় ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল—সাপের ছোবলে বাছুর মরবে এতে আর আশ্চর্য কী? আর বাছুর যদি রাত্রে শুয়ে থাকে, তাহলে গলায় ছোবল লাগাটা তো কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়! আমি মিছিমিছি দুটো জিনিসের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছি।

মধুসূদনকে সান্ত্বনা দেবার মতো দু-একটা কথা বলে কাজের তোড়জোড় করব বলে ঘরে ঢুকতেই দৃষ্টিটা যেন আপনা থেকেই কড়িকাঠের দিকে চলে গেল।

কালকের সেই বাদুড়টা আবার কখন জানি তার জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছে।

ওই জানালাটা খোলাতেই এই কাণ্ডটা হয়েছে। ভুলটা আমারই। মনে

মনে স্থির করলুম আজ রাত্রে যত গুমোটই হোক না কেন, দরজা জানালা সব বন্ধ করেই রেখে দেব।

সারা দিন মন্দির দেখে বেশ আনন্দেই কাটল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর এই পোড়া ইঁটের মন্দিরের গায়ে কাজ দেখে সত্যিই স্তম্ভিত হতে হয়।

হেতমপুর থেকে বাসে করে ফিরে শিউড়ি এসে যখন পেঁছিলুম তখন সাড়ে চারটে।

বাড়ি ফেরার পথ ছিল গোরস্থানটার পাশ দিয়েই। সারাদিনের কাজের মধ্যে কালকের সেই ভদ্রলোকটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, তাই গোর-স্থানের বাইরে সজনেগাছটার নীচে হঠাৎ তাঁকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলুম। পরমুহূর্তেই মনে হল লোকটাকে না-দেখতে পাওয়ার ভান করে এড়িয়ে যেতে পারলে খুব সুবিধে হয়। কিন্তু সে আর হবার জো নেই। মাথা হেঁট করে হাঁটার স্পীডটা যেই বাড়িয়েছি, অমনি ভদ্রলোক লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এসে আমায় ধরে ফেললেন।

'রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল ভালো?

আমি সংক্ষেপে 'হ্যাঁ' বলে এগোতে আরম্ভ করলুম, কিন্তু দেখলুম আজও ভদ্রলোক আমার সঙ্গ ছাড়বেন না। আমার দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আমার আবার কী বাতিক জানেন? রাত্রে আমি একদম ঘুমোতে পারি না। দিনের বেলাটা কষে ঘুমিয়ে নিই, আর সন্ধে থেকে সারা রাতটা এদিক ওদিক বেড়িয়ে বেড়াই। এই ঘোরায় যে কী আনন্দ তা আপনাকে কী করে বোঝাব? এই গোরস্থানের ভেতরে এবং আশ-পাশে যে কত দেখবার ও শোনবার জিনিস আছে তা আপনি জানেন? এই যে এরা সব মাটির তলায় কাঠের বাক্সের মধ্যে বছরের পর বছর বন্দী অবস্থায় কাটিয়ে দিচ্ছে, এদের অতৃপ্ত বাসনার কথা কি আপনি জানেন? এরা কি কেউ এইভাবে বন্দী থাকতে চায়? কেউ চায় না। সকলেই মনে মনে ভাবে—একবারটি যদি বেরিয়ে আসতে পারি! কিন্তু মুশকিল কী জানেন?—এই বেরোনোর রহস্যটি সকলের জানা নেই। সেই শোকে তারা কেউ কাঁদে, কেউ গোঙায়, কেউ বা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মাঝ রাত্তিরে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়, শেয়াল যখন ঘুমিয়ে পড়ে, ঝিঁঝিপোকা যখন ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন যাদের শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ—এই যেমন আমার—তারা এইসব মাটির নীচে কাঠের বাক্সে বন্দী প্রাণীদের শোকোচ্ছ্বাস শুনতে পায়। অবিশ্যি—ওই যা বললাম—কান খুব ভালো

হওয়া চাই। আমার চোখ কান দুটোই খুব ভালো। ঠিক বাদুড়ের মতো...'

মনে মনে ভাবলুম, মধুসূদনকে এই লোকটির কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। এ'কে জিজ্ঞেস করে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে বলে ভরসা হয় না। কদ্দিনের বাসিন্দা ইনি? কী করেন ভদ্রলোক? কোথায় এ'র বাড়ি?

আমার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আমি সকলের সঙ্গে বিশেষ একটা এগিয়ে এসে আলাপ করি না, কিন্তু আপনার সঙ্গে করলাম। আশা করি যে-ক'টা দিন আছেন, আপনার সঙ্গ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

আমি এবার আর রাগ সামলাতে পারলুম না। হাঁটা থামিয়ে লোকটির দিকে ঘুরে বললুম, 'দেখুন মশাই, আমি সাত দিনের জন্য এসেছি এখানে। বিস্তর কাজ রয়েছে আমার। আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার সুযোগ হবে বলে মনে হয় না।'

ভদ্রলোক যেন প্রথমটা আমার কথা শুনে একটু মুষড়ে পড়লেন। তারপর মৃদু অথচ বেশ দৃঢ় কণ্ঠে ঈষৎ হাসি মাখিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে সঙ্গ না দিলেও, আমি তো আপনাকে দিতে পারি! আর আপনি যে সময়টা কাজ করেন—অর্থাৎ দিনের বেলা—আমি সে সময়টা কথা বলছিলাম না।'

আর বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সংক্ষেপে 'নমস্কার' বলে আমি বাড়ির দিকে পা চালালুম।

রাত্রে খাবার সময় মধুসূদনকে লোকটির কথা জিজ্ঞেস করলুম। মধু মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে জগদীশ মুখুজ্জে বলে কাউকে—' তারপর একটু ভেবে বললে, 'ও, হাঁ—দাঁড়ান। বেঁটে খাটো মানুষ? কোট প্যাণ্টুলুন পরেন? গায়ের রঙ ময়লা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ও—আরে, তার তো বাবু মাথা খারাপ। সে তো হাসপাতালে ছিল এই কিছুদিন আগে অবধি। তবে এখন শুনছি তার ব্যামো সেরেছে। তাকে চিনলেন কী করে বাবু? তাকে তো অনেক দিন দেখি নি! ওর বাপ নীলমণি মুখুজ্জে ছিলেন পাদ্রী সাহেব। খুব ভালো লোক। তবে তিনিও শুনেছিলুম মাথার ব্যামোতেই মারা গিয়েছিলেন।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না, কেবল বাদুড়টার কথা সকালে বলা হয় নি, সেটা বলে বললাম, 'অবিশ্যি দোষটা আমারই। জানালাটা খুলে দিয়েছিলাম। ওটার যে মাঝের গরাদটা আবার নেই, সেটা খেয়াল ছিল না।'

মধু বলল, 'এক কাজ করব বাবু। কাল ওই ফাঁকটা বন্ধ করে দেব।

আজকের রাতটা বরং জানালাটা ভেজানোই থাক।'

সারাদিন মন্দির নিয়ে যেসব কাজ করেছি, রাত্রে খাতা খুলে সেইগুলো সম্বন্ধে একপ্রস্থ লিখে ফেললাম। ক্যামেরায় আর ফিল্ম ছিল না। বাক্স খুলে আগামী কালের জন্য নতুন ফিল্ম ভরলাম। জানালার দিকে বাইরে তাকিয়ে দেখি গতকালের জমা মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলোয় বাইরেটা তকতক করছে।

লেখার কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারটায় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম। এগারোটার কাছাকাছি উঠে একগেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে বিছানায় এসে শুলাম। মনে মনে ভাবলাম, আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে জগদীশবাবুর কথাগুলো সত্যিই হাস্যকর। স্থির করলাম, হাসপাতালে জগদীশবাবুর কী চিকিৎসা হয়েছিল এবং কোন্ ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন সেটা একবার খোঁজ নিতে হবে।

মেঘ কেটে গিয়ে গুমোট ভাবটাও কেটে গিয়েছিল, তাই জানালা দরজা বন্ধ করাতেও কোনো অসুবিধা লাগছিল না। বরঞ্চ পাতলা চাদর যেটা এনেছিলাম সেটা আজ গায়ে দিতে হল। চোখ বোজার অল্পক্ষণের মধ্যেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ক'টার সময় যে ঘুমটা ভাঙল জানি না—আর ভাঙার কিছুক্ষণ পরে পর্যন্ত কেন যে ভাঙল সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তারপর হঠাৎ পুবদিকের দেয়ালে একটা চতুষ্কোণ চাঁদের আলো দেখেই বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল।

জানালাটা কখন জানি খুলে গেছে, সেই জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে দেয়ালে পড়েছে।

তারপর দেখলাম, চতুষ্কোণ আলোটার উপর দিকে একটা কিসের জানি ছায়া বার বার ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে ঘাড়টা ফিরিয়ে উপর দিকে চাইতেই বাদুড়টাকে দেখতে পেলাম।

আমার খাটের ঠিক উপরেই বাদুড়টা বন বন করে চরকি পাক ঘুরছে এবং ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ নীচে আমার দিকে নামছে।

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে যতটা সাহস সঞ্চয় করা যায় করলাম। এ অবস্থায় দুর্বল হলে অনিবার্য বিপদ। বাদুড়টার দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে আমার ডানহাতটা খাটের পাশের টেবিলের দিকে বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে আমার শক্তবাঁধাই খাতাটা তুলে নিলাম।

তিন-চার হাতের মধ্যে বাদুড়টা যেই আমার কণ্ঠনালীর দিকে তাক করে একটা ঝাঁপ দিয়েছে—আমিও সঙ্গে সঙ্গে খাতাটা দিয়ে তার মাথায়

প্রচণ্ড একটা আঘাত করলাম।

বাদুড়টা ছিটকে গিয়ে জানালার গরাদের সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে একেবারে ঘরের বাইরে মাঠে গিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই একটা খচমচ শব্দে মনে হল কে যেন ঘাসের উপর দিয়ে দৌড়ে পালাল।

জানালার কাছে গিয়ে ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখলাম—কোথাও কিচ্ছু নেই, বাদুড়টারও চিহ্নমাত্র নেই।

বাকি রাতটা আর ঘুমোতে পারলাম না।

সকালে রোদ উঠতেই রাত্রের বিভীষিকা মন থেকে অনেকটা কেটে গেল। এ বাদুড় যে ভ্যাম্পায়ার, এখনো পর্যন্ত তার সঠিক কোনো প্রমাণ নেই। আমার দিকে বাদুড়টা নেমে আসছিল মানেই যে আমার রক্ত খেতে আসছিল, তারও সত্যি কোনো প্রমাণ নেই। ওই বিদঘুটে লোকটি ভ্যাম্পায়ারের প্রসঙ্গ না তুললে কি আর আমার ও কথা মনেও আসত? কলকাতায় যেমন বাদুড় ঘরে ঢোকে, এ বাদুড়কেও তারই সমগোত্রীয় বলে মনে হত।

যাই হোক, হেতমপুরে কাজ বাকি আছে। চা-পান সেরে সাড়ে ছটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম।

গোরস্থানের কাছাকাছি আসতে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। স্থানীয় কয়েকটি লোক জগদীশ বাবুকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। দেখে মনে হল জগদীশবাবু অজ্ঞান, আর তাঁর কপালে যেন চাপ-বাঁধা রক্তের দাগ। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে সামনের লোকটি হেসে বললে, 'বোধ হয় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মাথাটি ফাটিয়ে অজ্ঞান।'

বললাম, 'সে কী—গাছ থেকে পড়বেন কেন?'

'আরে মশাই—এ লোক বদ্ধ পাগল। মাঝে একটু সুস্থ হয়েছিল—তার আগে সন্ধেবেলা এগাছে সেগাছে উঠে মাথা নীচু করে ঝুলে থাকত—ঠিক বাদুড়ের মতো।

সত্যজিৎ রায়

পটলবাবু ফিল্মস্টার

পটলবাবু সবে বাজারের থলিটা কাঁধে ঝুলিয়েছেন এমন সময় বাইরে থেকে নিশিকান্তবাবু হাঁক দিলেন, 'পটল আছ নাকি হে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দাঁড়ান, আসছি।'

নিশিকান্ত ঘোষ মশাই নেপাল ভট্‌চাজ্যি লেনে পটলবাবুর তিনখানা বাড়ি পরেই থাকেন। বেশ আমুদে লোক।

পটলবাবু থলে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার? সক্কাল-সক্কাল?'

'শোনো, তুমি ফিরছ কতক্ষণে?'

'এই, ঘন্টাখানেক। কেন?'

'তারপর আর বেরোনোর ব্যাপার নেই তো? আজ তো ট্যাগোর্‌স্ বার্থডে। আমার ছোটশালার সঙ্গে কাল নেতাজী ফার্মেসিতে দেখা হল। সে ফিলিমে কাজ করে—লোকজন যোগাড় করে দেয়। বললে কী জানি একটা ছবির একটা সীনের জন্য একজন লোকের দরকার। যেরকম চাইছে, বুঝেছ—বছর পঞ্চাশ বয়স, বেঁটেখাটো, মাথায় টাক—আমার টক করে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তাই তোমার হদিস দিয়ে দিলুম। বলেছি সোজা তোমার সঙ্গে এসে কথা বলতে। আজ সকালে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে। তোমার আপত্তি নেই তো? ওদের রেট হিসেবে কিছু পেমেন্টও দেবে অবিশ্যি...'

সক্কালবেলা ঠিক এই ধরনের একটা খবর পটলবাবু আশাই করেন নি। বাহান্ন বছর বয়সে ফিল্মে অভিনয় করার প্রস্তাব আসতে পারে এটা তাঁর মতো নগণ্য লোকের পক্ষে অনুমান করা কঠিন বৈকি। এ যে একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার!

'কী হে, হ্যাঁ কি না বলে ফেলো। তুমি তো অভিনয়-টভিনয় করেছ এক-কালে, তাই না?'

'হ্যাঁ, মানে, 'না' বলার আর কী আছে? সে আসুক, কথাটথা বলে দেখি! কী নাম বললেন আপনার শালার?'

'নরেশ। নরেশ দত্ত। বছর ত্রিশেক বয়স, লম্বা দোহারা চেহারা। দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে।'

বাজার করতে গিয়ে আজ পটলবাবু গিন্নীর ফরমাশ গুলিয়ে ফেলে কালোজিরের বদলে ধানিলঙ্কা কিনে ফেললেন। আর সৈন্ধব নুনের কথাটা তো বেমালুম ভুলেই গেলেন। এতে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এককালে পটলবাবুর রীতিমত অভিনয়ের শখ ছিল। শুধু শখ কেন—নেশাই বলা চলে। যাত্রায়, শখের থিয়েটারে, পুজোপার্বণে পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানে তাঁর বাঁধা কাজ ছিল অভিনয় করা। হ্যান্ডবিলে কতবার নাম উঠেছে পটলবাবুর। একবার তো নীচের দিকে আলাদা করে বড় অক্ষরে নাম বেরুল তাঁর—"পরাশরের ভূমিকায় শ্রীশীতলাকান্ত রায় (পটলবাবু)।" তাঁর নামে টিকিট বিক্রি হয়েছে বেশি, এমনও সময় গেছে এককালে।

তখন অবিশ্যি তিনি থাকতেন কাঁচরাপাড়ায়। সেখানেই রেলের কারখানায় চাকরি ছিল তাঁর। উনিশ শ চৌত্রিশ সনে কলকাতার হাডসন অ্যান্ড কিম্বার্লি কোম্পানিতে আরেকটু বেশি মাইনের একটা চাকরি, আর নেপাল ভট্চাজ্যি লেনে এই বাড়িটা পেয়ে পটলবাবু সস্ত্রীক কলকাতায় চলে আসেন। ক-টা বছর কেটেছিল ভালোই। আপিসের সাহেব বেশ স্নেহ করতেন পটলবাবুকে। তেতাল্লিশ সনে পটলবাবু সবে একটা পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়ব-গড়ব করছেন এমন সময় যুদ্ধের ফলে আপিসে হল ছাঁটাই, আর পটলবাবুর ন' বছরের সাধের চাকরিটি কর্পূরের মতো উবে গেল।

সেই থেকে আজ অবধি বাকি জীবনটা রোজগারের ধান্দায় কেটে গেছে পটলবাবুর। গোড়ায় একটা মনিহারি দোকান দিয়েছিলেন, সেটা বছর পাঁচেক চলে উঠে যায়। তারপর একটা ছোট বাঙালি আপিসে কেরানিগিরি করেছিলেন কিছুদিন, কিন্তু বড়কর্তা বাঙালি সাহেব মিস্টার মিটারের ঔদ্ধত্য আর অকারণ চোখ-রাঙানি সহ্য করতে না পারায় নিজেই ছেড়ে দেন সে চাকরি। তারপর এই দশটা বছর ইনসিওরেন্সের দালালি থেকে শুরু করে কী-না করেছেন পটলবাবু! কিন্তু যে-অভাব, যে-টানাটানি, সে আর দূর হয় নি কিছুতেই। সম্প্রতি তিনি একটা লোহালক্কড়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করছেন; তাঁর এক খুড়তুতো ভাই বলেছে সেখানে একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

আর অভিনয়? সে তো যেন আর-এক জন্মের কথা! অজান্তে এক-একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবছা আবছা মনে পড়ে যায়, এই আর কি। নেহাত পটলবাবুর স্মরণশক্তি ভালো, তাই কিছু ভালো ভালো পার্টের ভালো ভালো অংশ এখনো মনে আছে!—'শুন পুনঃপুনঃ গাণ্ডীবঝঙ্কার, স্বপক্ষ আকুল মহারণে। জিনি শত পবন-হুঙ্কার, পর্বত-আকার গদা করিছে ঝঙ্কার—বৃকোদর সঞ্চালনে!'...ওঃ! ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

নরেশ দত্ত এলেন ঠিক সাড়ে-বারোটার সময়। পটলবাবু প্রায় আশা ছেড়ে দিয়ে নাইতে যাবার তোড়জোড় করছিলেন, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

'আসুন, আসুন!' পটলবাবু দরজা খুলে আগন্তুককে প্রায় ঘরের ভিতর টেনে এনে তাঁর হাতলভাঙা চেয়ারটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন—'বসুন!'

'না, না। বসব না। নিশিকান্তবাবু আপনাকে আমার কথা বলেছেন বোধহয়...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি অবিশ্যি খুবই অবাক হয়েছি। এতদিন বাদে...'

'আপনার আপত্তি নেই তো?'

পটলবাবুর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

'আমাকে দিয়ে...হেঁ হেঁ...মানে, চলবে তো?'

নরেশবাবু গম্ভীরভাবে একবার পটলবাবুর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'বেশ চলবে। খুব চলবে। কাজটা কিন্তু কালই।'

'কাল? রবিবার?'

'হ্যাঁ।...কোন স্টুডিওতে নয় কিন্তু। জায়গাটা বলে দিচ্ছি আপনাকে। মিশন রো আর বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ে ফ্যারাডে হাউসটা দেখেছেন তো? সাততলা বিল্ডিং একটা? সেইটের সামনে ঠিক সাড়ে-আটটায় পেঁছে যাবেন। ওইখানেই কাজ। বারোটার মধ্যে ছুটি হয়ে যাবে আপনার।'

নরেশবাবু উঠে পড়লেন। পটলবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কিন্তু পার্টটা কী বললেন না?'

'পার্ট হল গিয়ে আপনার...একজন পেডেস্ট্রিয়ানের, মানে পথচারী আর কি! একজন অন্যমনস্ক, বদমেজাজী পেডেস্ট্রিয়ান।...ভালো কথা, আপনার গলাবন্ধ কোট আছে কি?'

'তা আছে বোধহয়।'

'ওটাই পরে আসবেন। ডার্ক রং তো?'

'বাদামী গোছের। গরম কিন্তু।'

'তা হোক না। আর আমাদের সীনটাও শীতকালের, ভালোই হবে...কাল সাড়ে-আটটা, ফ্যারাডে হাউস!'

পটলবাবুর ধাঁ করে আরেকটা জরুরী প্রশ্ন মাথায় এসে গেল।

'পার্টটায় ডায়ালগ আছে তো? কথা বলতে হবে তো?'

'আলবত! স্পীকিং পার্ট!...আপনি আগে অভিনয় করেছেন তো?'

'হ্যাঁ...তা, একটু-আধটু...'

'তবে! শুধু হেঁটে যাবার জন্য আপনার কাছে আসব কেন? সে তো রাস্তা থেকে যে-কোন একটা পেডেস্ট্রিয়ান ধরে নিলেই হল!...ডায়ালগ আছে বৈকি এবং সেটা কাল ওখানে গেলেই পেয়ে যাবেন। আসি...'

নরেশ দত্ত চলে যাবার পর পটলবাবু তাঁর গিন্নীর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন।

'যা বুঝছি—বুঝলে গিন্নী—এ পার্টটা হয়তো তেমন একটা বড় কিছু নয়; অর্থপ্রাপ্তি অবিশ্যি আছে সামান্য, কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, থিয়েটারে আমার প্রথম পার্ট কী ছিল মনে আছে তো?—মৃত সৈনিকের পার্ট। স্রেফ হাঁ করে চোখ বুঁজে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা; আর তার থেকেই আস্তে আস্তে কোথায় উঠেছিলাম মনে আছে তো? ওয়াট্স্ সাহেবের হ্যান্ড-শেক মনে আছে? আর আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান চারু বিশ্বাসের দেওয়া সেই মেডেল? অ্যাঁ? এ তো সবে সিঁড়ির প্রথম ধাপ! কী বল? অ্যাঁ? মান যশ প্রতিপত্তি খ্যাতি, যদি বেঁচে থাকি ভবে, হে মোর গৃহিণী, এ সবই লভিব আমি!...'

পটলবাবু বাহান্ন বছর বয়সে হঠাৎ তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে উঠলেন। গিন্নী বললেন, 'কর কী?'

'কিচ্ছু ভেবো না গিন্নী। শিশির ভাদুড়ী সত্তর বছর বয়সে চাণক্যের পার্টে কী লাফখানা দিতেন মনে আছে? আজ যে পুনর্যৌবন লাভ করেছি!'

'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল! সাধে কি তোমার কোনদিন কিচ্ছু হয় না?'

'হবে হবে! সব হবে! ভালো কথা—আজ বিকেলে একটু চা খাব, বুঝেছ? আর সঙ্গে একটু আদার রস, নইলে গলাটা ঠিক...'

পরদিন সকালে মেট্রোপোলিটান কোম্পানির ঘড়িতে যখন আটটা বেজে সাত মিনিট তখন পটলবাবু এস্‌প্লানেডে এসে পেঁছোলেন। সেখান থেকে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট ও মিশন রো-র মোড়ে ফ্যারাডে হাউসে পেঁছতে লাগল আরো মিনিট দশেক।

বিরাট তোড়জোড় চলেছে আপিসের গেটের সামনে। তিন-চারখানা গাড়ি, তার একটা বেশ বড়—প্রায় বাস-এর মতো—তার মাথায় আবার সব জিনিসপত্তর। রাস্তার ঠিক ধারটায় ফুটপাথের উপর একটা তেপায়া কালো যন্ত্রের মতো জিনিস; তার পাশে কয়েকজন লোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। গেটের ঠিক মুখটাতে একটা তেপায়া লোহার ডান্ডার মাথায় আরেকটা লোহার ডান্ডা আড়াআড়িভাবে শোয়ানো রয়েছে, আর তার ডগা থেকে ঝুলছে একটা মৌমাছির চাকের মত দেখতে জিনিস। এ ছাড়া ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে জনা ত্রিশেক লোক, যাদের মধ্যে অবাঙালিও লক্ষ্য করলেন পটলবাবু; কিন্তু এদের যে কী কাজ সেটা ঠাহর করতে পারলেন না।

কিন্তু নরেশবাবু কোথায়? একমাত্র তিনি ছাড়া তো পটলবাবুকে কেউই

চেনেন না!

দুরুদুরু বুকে পটলবাবু এগিয়ে চললেন আপিসের গেটের দিকে।

বৈশাখ মাস; গলাবন্ধ খদ্দরের কোটটা গায়ে বেশ ভারী বোধ হচ্ছিল। গলার কলারের চারপাশ ঘিরে বিন্দু বিন্দু ঘাম অনুভব করলেন পটলবাবু।

'এই যে অতুলবাবু—এদিকে!'

অতুলবাবু? পটলবাবু ঘুরে দেখেন আপিসের বারান্দার একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে নরেশবাবু তাঁকেই ডাকছেন। নামটা ভুল করেছেন ভদ্রলোক। অস্বাভাবিক নয়। একদিনের আলাপ তো! পটলবাবু এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নামটা বোধহয় ঠিক নোট করা নেই আপনার। শ্রীশীতলাকান্ত রায়। অবিশ্যি পটলবাবু বলেই জানে সকলে। থিয়েটারেও ওই নামেই জানত।'

'ও! তা আপনি তো বেশ পাংচুয়াল দেখছি।'

পটলবাবু মৃদু হাসলেন।

'ন' বচ্ছর হাডসন কিম্বার্লিতে চাকরি করিছি; লেট হই নি একদিনও। নট এ সিঙ্গল্ ডে।'

'বেশ, বেশ। আপনি এক কাজ করুন। ওই ছায়াটায় গিয়ে একটু ওয়েট করুন। আমরা এদিকে একটু কাজ এগিয়ে নিই।'

তেপায়া যন্ত্রটার পাশ থেকে একজন ডেকে উঠল, 'নরেশ!'

'স্যার?'

'উনি কি আমাদের লোক?'

'হ্যাঁ স্যার। ইনিই...মানে, ওই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

'ও। ঠিক আছে। এখন জায়গাটা ক্লিয়ার করো তো; শট্ নেব।'

পটলবাবু আপিসের পাশেই একটা পানের দোকানের ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বায়স্কোপ তোলা তিনি এর আগে কখনো দেখেন নি। তাঁর কাছে সবই নতুন। থিয়েটারের সঙ্গে কোন মিলই তো নেই! আর কী পরিশ্রম করে লোকগুলো। ওই ভারী যন্ত্রটাকে পিঠে করে নিয়ে এখান থেকে ওখানে রাখছে একটি একুশ-বাইশ বছরের ছোকরা। বিশ-পঁচিশ সের ওজন তো হবেই যন্ত্রটার।

কিন্তু তাঁর ডায়ালগ কই? আর তো সময় নেই বেশি। অথচ এখনো তাঁকে যে কী কথা বলতে হবে তাই জানেন না পটলবাবু।

হঠাৎ যেন একটু নার্ভাস বোধ করলেন পটলবাবু। এগিয়ে যাবেন নাকি? ওই তো নরেশবাবু; একবার তাঁকে গিয়ে বলা উচিত নয় কি? পার্ট ছোটই হোক আর বড়ই হোক, ভালো করে করতে হলে তাঁকে তো তৈরি করতে হবে সে পার্ট! নাহলে এতগুলো লোকের সামনে তাঁকে যদি কথা গুলিয়ে ফেলে অপদস্থ হতে হয়? আজ প্রায় বিশ বচ্ছর অভিনয় করা হয় নি যে!

পটলবাবু এগিয়ে যেতে গিয়ে একটা চীৎকার শুনে চমকে থেমে গেলেন।

'সাইলেন্স!'

তারপর নরেশবাবুর গলা পাওয়া গেল—'এবার শট্ নেওয়া হবে! আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন! কথাবার্তা বলবেন না, জায়গা ছেড়ে নড়বেন না, ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসবেন না!'

তারপর আবার সেই প্রথম গলায় চীৎকার এল—'সাইলেন্স! টেকিং!' এবার পটলবাবু লোকটিকে দেখতে পেলেন। মাঝারি গোছের মোটাসোটা ভদ্রলোকটি তেপায়া যন্ত্রটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন; গলার একটা চেন থেকে দূরবীনের মতো একটা জিনিস ঝুলছে। ইনিই কি পরিচালক নাকি? কী আশ্চর্য, পরিচালকের নামটাও যে তাঁর জেনে নেওয়া হয় নি!

এবারে পর পর আরো কতগুলো চীৎকার পটলবাবুর কানে এল—'স্টার্ট সাউন্ড!' 'রানিং!' 'অ্যাকশন!'

অ্যাকশন কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই পটলবাবু দেখলেন চৌমাথার কাছ থেকে একটা গাড়ি এসে আপিসের সামনে থামল, আর তার থেকে একটি মুখে-গোলাপী-রং-মাখা স্যুট-পরা যুবক দরজা খুলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে নেমে হন-হনিয়ে আপিসের গেট পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। পরক্ষণেই পটলবাবু চীৎকার শুনলেন 'কাট্', আর অমনি সাইলেন্স ভেঙে গিয়ে জনতার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

পটলবাবুর পাশেই এক ভদ্রলোক তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোকরাটিকে চিনলেন তো?'

পটলবাবু বললেন, 'কই, না তো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'চঞ্চলকুমার। তরতরিয়ে উঠছে ছোকরা। একসঙ্গে চার-খানা বইয়ে অভিনয় করছে।'

পটলবাবু বায়স্কোপ খুবই কম দেখেন, কিন্তু এই চঞ্চলকুমারের নাম যেন শুনেছেন দু-একবার। কটিবাবু বোধহয় এই ছেলেটিরই প্রশংসা করছিলেন একদিন। বেশ মেক-আপ করেছে ছেলেটি! ওই বিলিতি স্যুটের বদলে ধুতি-চাদর পরিয়ে ময়ূরের পিঠে চড়িয়ে দিলেই একেবারে কার্তিক ঠাকুর। কাঁচরা-পাড়ার মনোতোষ ওরফে চিনুর চেহারা কতকটা ওইরকমই ছিল বটে; বেড়ে ফীমেল পার্ট করত চিনু!

পটলবাবু এবার পাশের ভদ্রলোকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আর পরিচালকটির নাম কী মশাই?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী, আপনি তাও জানেন না? উনি যে বরেন মল্লিক—তিনখানা ছবি পর পর হিট করেছে!'

যাক। কতগুলো দরকারী জিনিস জানা হয়ে গেল। নইলে গিন্নী যদি

জিজ্ঞেস করতেন কার ছবিতে কার সঙ্গে অভিনয় করে এলে, তাহলে মুশকিলেই পড়তেন পটলবাবু।

নরেশ একভাঁড় চা নিয়ে পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন স্যার, গলাটা একটু ভিজিয়ে আলগা করে নিন। আপনার ডাক পড়ল বলে!'

পটলবাবু এবার আসল কথাটা না বলে পারলেন না।

'আমার ডায়ালগটা যদি এই বেলা দিতেন তো—'

'ডায়ালগ? আসুন আমার সঙ্গে।'

নরেশ তেপায়া যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল, পিছনে পটলবাবু।

'এই শশাঙ্ক!'

একটি হাফশার্ট-পরা ছোকরা এগিয়ে এল নরেশের দিকে। নরেশ তাকে বলল, 'এই ভদ্রলোক ওঁর ডায়ালগ চাইছেন। একটা কাগজে লিখে দে তো। সেই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

শশাঙ্ক পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন দাদু...এই জ্যোতি, তোর কলমটা একটু দে তো। দাদুকে ডায়ালগটা দিয়ে দিই।'

জ্যোতি ছেলেটি তার পকেট থেকে একটা লাল কলম বার করে শশাঙ্কর দিকে এগিয়ে দিল। শশাঙ্ক তার হাতের খাতা থেকে একটা সাদা পাতা ছিঁড়ে কলম দিয়ে তাতে কী জানি লিখে কাগজটা পটলবাবুকে দিল।

পটলবাবু কাগজটার দিকে চেয়ে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে—'আঃ'।

আঃ?

পটলবাবুর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কোটটা খুলে ফেলতে পারলে ভালো হয়। গরম হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠেছে।

শশাঙ্ক বলল, 'দাদু যে গুম মেরে গেলেন? কঠিন মনে হচ্ছে?'

এরা কি তাহলে ঠাট্টা করছে? সমস্ত ব্যাপারটাই কি একটা বিরাট পরিহাস? তাঁর মতো নিরীহ নির্বিবাদী মানুষকে ডেকে এনে এত বড় শহরের এত বড় রাস্তার মাঝখানে ফেলে রংতামাশা? এত নিষ্ঠুরও কি মানুষ হতে পারে?

পটলবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন বলুন তো?'

'শুধু "আঃ"? আর কোন কথা নেই?'

শশাঙ্ক চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলেন কী দাদু? এ কি কম হল নাকি? এ তো রেগুলার স্পীকিং পার্ট! বরেন মল্লিকের ছবিতে স্পীকিং পার্ট—আপনি বলছেন কী? আপনি তো ভাগ্যবান লোক মশাই! জানেন, আমাদের এই

ছবিতে আজ অবধি প্রায় দেড়শ লোক পার্ট করে গেছে যারা কোন কথাই বলে নি। শুধু ক্যামেরার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। অনেকে আবার হাঁটেও নি, স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকেছে। কারুর কারুর মুখ পর্যন্ত দেখা যায় নি। আজকেও দেখুন না—এই যে ওঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন, ল্যাম্পপোস্টটার পাশে; ওঁরা সবাই আছেন আজকের সীনে, কিন্তু একজনেরও একটিও কথা নেই। এমনকি আমাদের যে নায়ক—চঞ্চলকুমার—তারও আজ কোন ডায়ালগ নেই। কেবলমাত্র আপনার কথা, বুঝেছেন?'

এবার জ্যোতি বলে ছেলেটি এগিয়ে এসে পটলবাবুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'শুনুন দাদু—ব্যাপারটা বুঝে নিন। চঞ্চলকুমার হলেন এই আপিসের বড় চাকুরে। সীনটায় আমরা দেখাচ্ছি যে আপিসে একটা ক্যাশ ভাঙার খবর পেয়ে উনি হন্তদন্ত হয়ে এসে দৌড়ে আপিসে ঢুকছেন। ঠিক সেই সময় সামনে পড়ে গেছেন আপনি—একজন পেডেস্ট্রিয়ান—বুঝেছেন? লাগছে ধাক্কা—বুঝেছেন? আপনি ধাক্কা খেয়ে বলছেন 'আঃ', আর চঞ্চল আপন্যর দিকে দৃক্‌পাত না করে ঢুকে যাচ্ছে আপিসে। আপনাকে অগ্রাহ্য করাতে তার মানসিক অবস্থাটা ফুটে বেরুচ্ছে—বুঝেছেন? ব্যাপারটা কত ইম্পর্ট্যাণ্ট ভেবে দেখুন!'

এবার শশাঙ্ক এগিয়ে এসে বলল, 'শুনলেন তো? যান, এবার একটু ওদিকটায় যান দিকি! এদিকটায় ভিড় করলে কাজের অসুবিধে হবে। আরেকটা শট্ আছে, তারপর আপনার ডাক পড়বে।'

পটলবাবু আস্তে আস্তে আবার পানের দোকানটার দিকে সরে গেলেন। ছাউনির তলায় পৌঁছে হাতের কাগজটার দিকে আড়দৃষ্টিতে দেখে আশপাশের কেউ তাঁর দিকে দেখছে কিনা দেখে কাগজটা কুণ্ডলী পাকিয়ে নর্দমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'আঃ!'

একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস পটলবাবুর বুকের ভিতর থেকে উপরে উঠে এল। শুধু একটি মাত্র কথা—কথাও না, শব্দ—আঃ!

গরম অসহ্য হয়ে আসছে। গায়ের কোটটার মনে হয় যেন মনখানেক ওজন। আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না; পা অবশ হয়ে গেছে।

পটলবাবু এগিয়ে গিয়ে পানের দোকানের ওদিকের আপিসটার দরজার সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন। সাড়ে-নটা বাজে। করালীবাবুর বাড়িতে শ্যামা-সংগীত হয় রোববার সকালে; পটলবাবু নিয়মিত গিয়ে শোনেন। বেশ লাগে। সেইখানেই যাবেন নাকি চলে? গেলে ক্ষতিটা কী? এইসব বাজে, খেলো লোকের সংসর্গে রবিবারের সকালটা মাটি করে লাভ আছে কিছু? আর অপমানের বোঝাটাও যে বইতে হবে সেই সঙ্গে।

'সাইলেন্স!'

দূর্! নিকুচি করেছে তোর সাইলেন্সের। যা-না কাজ, তার বত্রিশ গুণ ফুটুনি আর ভড়ং। এর চেয়ে থিয়েটারের কাজ—

থিয়েটার...থিয়েটার...

অনেক কাল আগের একটা ক্ষীণ স্মৃতি পটলবাবুর মনের মধ্যে জেগে উঠল। একটা গম্ভীর সংযত অথচ সুরেলা কণ্ঠস্বরে বলা কতগুলো অমূল্য উপদেশের কথা...'একটা কথা মনে রেখো পটল। যত ছোট পার্টই তোমাকে দেওয়া হোক, তুমি জেনে রেখো তাতে কোন অপমান নেই। শিল্পী হিসেবে তোমার কৃতিত্ব হবে সেই ছোট্ট পার্টটি থেকেও শেষ রসটুকু নিংড়ে বার করে তাকে সার্থক করে তোলা। থিয়েটারের কাজ হল পাঁচজনে মিলেমিশে কাজ। সকলের সাফল্য জড়িয়েই নাটকের সাফল্য।'

পাকড়াশী মশাই দিয়েছিলেন এ উপদেশ পটলবাবুকে। গগন পাকড়াশী। পটলবাবুর নাট্যগুরু ছিলেন তিনি। আশ্চর্য অভিনেতা ছিলেন গগন পাকড়াশী, অথচ দম্ভের লেশমাত্র ছিল না তাঁর মনে। ঋষিতুল্য মানুষ, আর শিল্পীর সেরা শিল্পী।

আরো একটা কথা বলতেন পাকড়াশী মশাই—'নাটকের এক-একটি কথা হল এক-একটি গাছের ফল। সবাই নাগাল পায় না সে-ফলের। যারা পায় তারাও হয়তো তার খোসা ছাড়াতে জানে না। কাজটা আসলে হল তোমার—অভিনেতার। তোমাকে জানতে হবে কী করে সে ফল পেড়ে তার খোসা ছাড়িয়ে তার থেকে রস নিংড়ে বার করে সেটা লোকের কাছে পরিবেশন করতে হয়।'

গগন পাকড়াশীর কথা মনে হতে পটলবাবুর মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে এল।

সত্যিই কি তাঁর আজকের পার্টটার মধ্যে কিছুই নেই? একটিমাত্র কথা তাঁকে বলতে হবে—'আঃ'। কিন্তু একটি কথা বলেই কি এক কথায় তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ—পটলবাবু বার বার নানান সুরে কথাটাকে আওড়াতে লাগলেন। আওড়াতে আওড়াতে ক্রমে তিনি একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলেন। ওই আঃ কথাটাই নানান সুরে নানান ভাবে বললে মানুষের মনের নানান অবস্থা প্রকাশ করছে। চিমটি খেলে মানুষে যেভাবে আঃ বলে, গরমে ঠাণ্ডা শরবত খেয়ে মোটেই সেভাবে আঃ বলে না। এ-দুটো আঃ একেবারে আলাদা রকমের; আবার আচমকা কানে সুড়সুড়ি খেলে বেরোয় আরো আরেক রকম আঃ। এ ছাড়া আরো কতরকম আঃ রয়েছে—দীর্ঘশ্বাসের আঃ, তাচ্ছিল্যের আঃ, অভিমানের আঃ, ছোট করে বলা আঃ, লম্বা করে বলা আ—ঃ, চেঁচিয়ে বলা আঃ, মৃদুস্বরে আঃ, চড়া গলায় আঃ, খাদে গলায় আঃ, আবার

'আ'-টা খাদে শুরু করে বিসর্গটায় সুর চড়িয়ে আঃ—আশ্চর্য! পটলবাবুর মনে হল তিনি যেন ওই একটি কথা নিয়ে একটা আস্ত অভিধান লিখে ফেলতে পারেন।

এত নিরুৎসাহ হচ্ছিলেন কেন তিনি? এই একটা কথা যে একেবারে সোনার খনি। তেমন তেমন অভিনেতা তো এই একটা কথাতেই বাজিমাত করে দিতে পারে!

'সাইলেন্স!'

পরিচালক মশাই ওদিকে আবার হুংকার দিয়ে উঠেছেন। পটলবাবু দেখলেন জ্যোতি ছোকরাটি তাঁর কাছেই ভিড় সরাচ্ছে। ছোকরাকে একটা কথা বলা দরকার। পটলবাবু দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তার কাছে।

'আমার কাজটা হতে আর কতক্ষণ দেরি ভায়া?'

'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন দাদু? একটু ধৈর্য ধরতে হয় এসব ব্যাপারে। আরো আধ ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করুন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! অপেক্ষা করব বইকি! আমি এই কাছাকাছিই আছি।'

'দেখবেন আবার সটকাবেন না যেন।'

জ্যোতি চলে গেল।

'স্টার্ট সাউন্ড!'

পটলবাবু পা টিপে টিপে শব্দ না করে রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকের একটা নিরিবিলি গলিতে ঢুকে পড়লেন। ভালোই হল। হাতে সময় পাওয়া গেছে কিছুটা! এরা যখন রিহার্সাল-টিহার্সালের বিশেষ ধার ধারছে না, তখন তিনি নিজেই নিজের অংশটা কিছুটা অভ্যাস করে নেবেন। গলিটা নির্জন। একে আপিসপাড়া—বাসিন্দা এমনিতেই কম—তায় রবিবার। যে-ক'জন লোক ছিল সবাই ফ্যারাডে হাউসের দিকে বায়স্কোপের তামাশা দেখতে চলে গেছে।

পটলবাবু গলা খাঁকরে নিয়ে আজকের এই বিশেষ দৃশ্যের বিশেষ 'আঃ' শব্দটি আয়ত্ত করতে আরম্ভ করলেন। আর সেই সঙ্গে আচমকা ধাক্কা খেলে মুখটা কিরকম বিকৃত হতে পারে, হাতদুটো কতখানি বেঁকে কিরকম ভাবে ছিটিয়ে উঠতে পারে, আঙুলগুলো কতখানি ফাঁক হতে পারে, আর পায়ের অবস্থা কিরকম হতে পারে—এই সবই একটা কাঁচের জানালায় নিজের ছায়া দেখে ঠিক করে নিতে লাগলেন।

ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই পটলবাবুর ডাক পড়ল; এখন আর তাঁর মনে কোন নিরুৎসাহের ভাব নেই। উদ্বেগও কেটে গেছে তাঁর মন থেকে। রয়েছে কেবল একটা চাপা উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ; পঁচিশ বছর আগে স্টেজে অভিনয় করার সময় একটা বড় দৃশ্যে নামবার আগে যে ভাবটা তিনি অনুভব করতেন, সেই ভাব।

পরিচালক বরেন মল্লিক পটলবাবুকে কাছে ডেকে বললেন, 'আপনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ। আমি প্রথমে বলব "স্টার্ট সাউন্ড"। তার উত্তরে ভেতর থেকে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট বলবে "রানিং"। বলামাত্র ক্যামেরা চলতে আরম্ভ করবে। তারপর আমি বলব "অ্যাকশন"! বললেই আপনি ওই থামের কাছটা থেকে এই-দিকে হেঁটে আসতে শুরু করবেন, আর নায়ক এই গাড়ির দরজা থেকে যাবে ওই আপিসের গেটের দিকে। আন্দাজ করে নেবেন যাতে ফুটপাথের এই এরকম জায়গাটায় কলিশনটা হয়। নায়ক আপনাকে অগ্রাহ্য করে ঢুকে যাবে আপিসে, আর আপনি বিরক্ত হয়ে 'আঃ' বলে আবার হাঁটতে শুরু করবেন। কেমন?'

পটলবাবু বললেন, 'একটা রিহার্সাল...?'

'না না,' বরেনবাবু বাধা দিলেন। 'মেঘ করে আসছে মশাই। রিহার্সালের টাইম নেই। রোদ থাকতে থাকতে নেওয়া দরকার শট্‌টা।'

'কেবল একটা কথা...'

'আবার কী?'

গলিতে রিহার্সাল দেবার সময় পটলবাবুর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল, সেটা সাহস করে বলে ফেললেন।

'আমি ভাবছিলাম—ইয়ে, আমার হাতে যদি একটা খবরের কাগজ থাকে, আর আমি যদি সেটা পড়তে পড়তে ধাক্কাটা খাই...মানে, অন্যমনস্কতার ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে—'

বরেন মল্লিক তাঁর কথাটা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, 'বেশ তো...ও মশাই, আপনার যুগান্তরটা এই ভদ্রলোককে দিন তো।...হ্যাঁ। এইবার ওই থামের পাশে আপনার জায়গায় গিয়ে রেডি হয়ে যান। চঞ্চল, তুমি রেডি?'

গাড়ির পাশ থেকে নায়ক উত্তর দিলেন, 'ইয়েস স্যার।'

'গুড। সাইলেন্স!'

বরেন মল্লিক হাত তুললেন, তারপর হঠাৎ তক্ষুনি হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওহো-হো, এক মিনিট। কেষ্টো, ভদ্রলোককে একটা গোঁফ দিয়ে দাও তো চট করে। ক্যারেক্টারটা পুরোপুরি আসছে না।'

'কিরকম গোঁফ স্যার? ঝুঁপো, না চাড়া-দেওয়া, না বাটারফ্লাই? রেডি আছে সবই।'

'বাটারফ্লাই, বাটারফ্লাই। চট করে দাও, দেরি কোরো না।'

একটি কালো বেঁটে ব্যাকব্রাশ-করা ছোকরা পটলবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতের একটা টিনের বাক্স থেকে একটা ছোট্ট চৌকো কালো গোঁফ বার করে আঠা লাগিয়ে পটলবাবুর নাকের নীচে সেঁটে দিল।

পটলবাবু বললেন, 'দেখো বাপু, ধাক্কাধুক্কিতে খুলে যাবে না তো?' ছোকরা হেসে বলল, 'ধাক্কা কেন? আপনি দারা সিংএর সঙ্গে কুস্তি করুন না—তাও খুলবে না।'

লোকটার হাতে একটা আয়না ছিল; পটলবাবু টুক করে তাতে একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিলেন। সত্যিই তো! বেশ মানিয়েছে তো! খাসা মানিয়েছে। পটলবাবু পরিচালকের তীক্ষ্ন দৃষ্টিকে মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না।

'সাইলেন্স! সাইলেন্স!'

পটলবাবুর গোঁফ পরা দেখে দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, বরেন মল্লিকের হুঙ্কারে সেটা থেমে গেল।

পটলবাবু লক্ষ্য করলেন সমবেত জনতার বেশির ভাগ লোকই তাঁরই দিকে চেয়ে আছে।

'স্টার্ট সাউন্ড!'

পটলবাবু গলাটা খাঁকরিয়ে নিলেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ পা আন্দাজ হাঁটলে পর পটলবাবু ধাক্কার জায়গাটায় পেঁছবেন। আর চঞ্চলকুমারের হাঁটতে হবে বোধহয় চার পা। সুতরাং দুজনে যদি একসঙ্গে রওনা হন, তাহলে পটলবাবুকে একটু বেশি জোরে হাঁটতে হবে, তা না হলে—

'রানিং।'

পটলবাবু খবরের কাগজটা তুলে মুখের সামনে ধরলেন। দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে ছ আনা বিস্ময় মিশিয়ে আঃ-টা বললে পরেই—

'অ্যাকশন!'

জয় গুরু!

খচ খচ খচ খচ খচ—ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্‌! পটলবাবু হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলেন। নায়কের মাথার সঙ্গে তাঁর কপালের ঠোকাঠুকি লেগেছে। একটা তীব্র যন্ত্রণা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই এক প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে আশ্চর্যভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে পটলবাবু দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে তিন আনা বিস্ময় ও তিন আনা যন্ত্রণা মিশিয়ে 'আঃ' শব্দটা উচ্চারণ করে কাগজটা সামলে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলেন।

'কাট!'

'ঠিক হল কি?' পটলবাবু গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বরেনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন।

'বেড়ে হয়েছে! আপনি তো ভালো অভিনেতা মশাই!...সুরেন, কালো কাঁচটা একবার চোখে লাগিয়ে দেখো তো মেঘের কী অবস্থা।'

শশাঙ্ক এসে বলল, 'দাদুর চোট লাগে নি তো?'

চঞ্চলকুমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে এসে বললেন, 'ধন্যি মশাই আপনার টাইমিং! বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়—ওঃ!'

নরেশ ভিড় ঠেলে এসে বলল, 'আপনি ওই ছায়াটায় দাঁড়ান একটু। আরেকটা শট্ নিয়েই আপনার ব্যাপারটা করে দিচ্ছি।'

পটলবাবু ভিড় ঠেলে ঘাম মুছতে মুছতে আবার পানের দোকানের ছায়াটায় এসে দাঁড়ালেন। মেঘে সূর্য ঢেকে গরমটা একটু কমেছে; কিন্তু পটলবাবু তাও কোটটা খুলে ফেললেন। আঃ, কী আরাম! একটা গভীর আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির ভাব ধীরে ধীরে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তাঁর আজকের কাজ সত্যিই ভালো হয়েছে। এতদিন অকেজো থেকেও তাঁর শিল্পীমন ভোঁতা হয়ে যায় নি। গগন পাকড়াশী আজ তাঁকে দেখলে সত্যিই খুশী হতেন। কিন্তু এরা কি সেটা বুঝতে পেরেছে? পরিচালক বরেন মল্লিক কি তা বুঝেছেন? এই সামান্য কাজ নিখুঁতভাবে করার জন্য তাঁর যে আগ্রহ আর পরিশ্রম, তার কদর কি এরা করতে পারে? সে ক্ষমতা কি এদের আছে? এরা বোধহয় লোক ডেকে এনে কাজ করিয়ে টাকা দিয়েই খালাস। টাকা! কত টাকা? পাঁচ, দশ, পঁচিশ? টাকার তাঁর অভাব ঠিকই—কিন্তু আজকের এই যে আনন্দ, তার কাছে পাঁচটা টাকা আর কী?...

মিনিট দশেক পরে নরেশ পানের দোকানের কাছে পটলবাবুর খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোককে আর পেল না। সে কী, টাকা না নিয়েই চলে গেল নাকি লোকটা? আচ্ছা ভোলা মন তো!

বরেন মল্লিক হাঁক দিলেন, 'রোদ বেরিয়েছে! সাইলেন্স! সাইলেন্স!... ওহে নরেশ, চলে এসো, ভিড় সামলাও!'
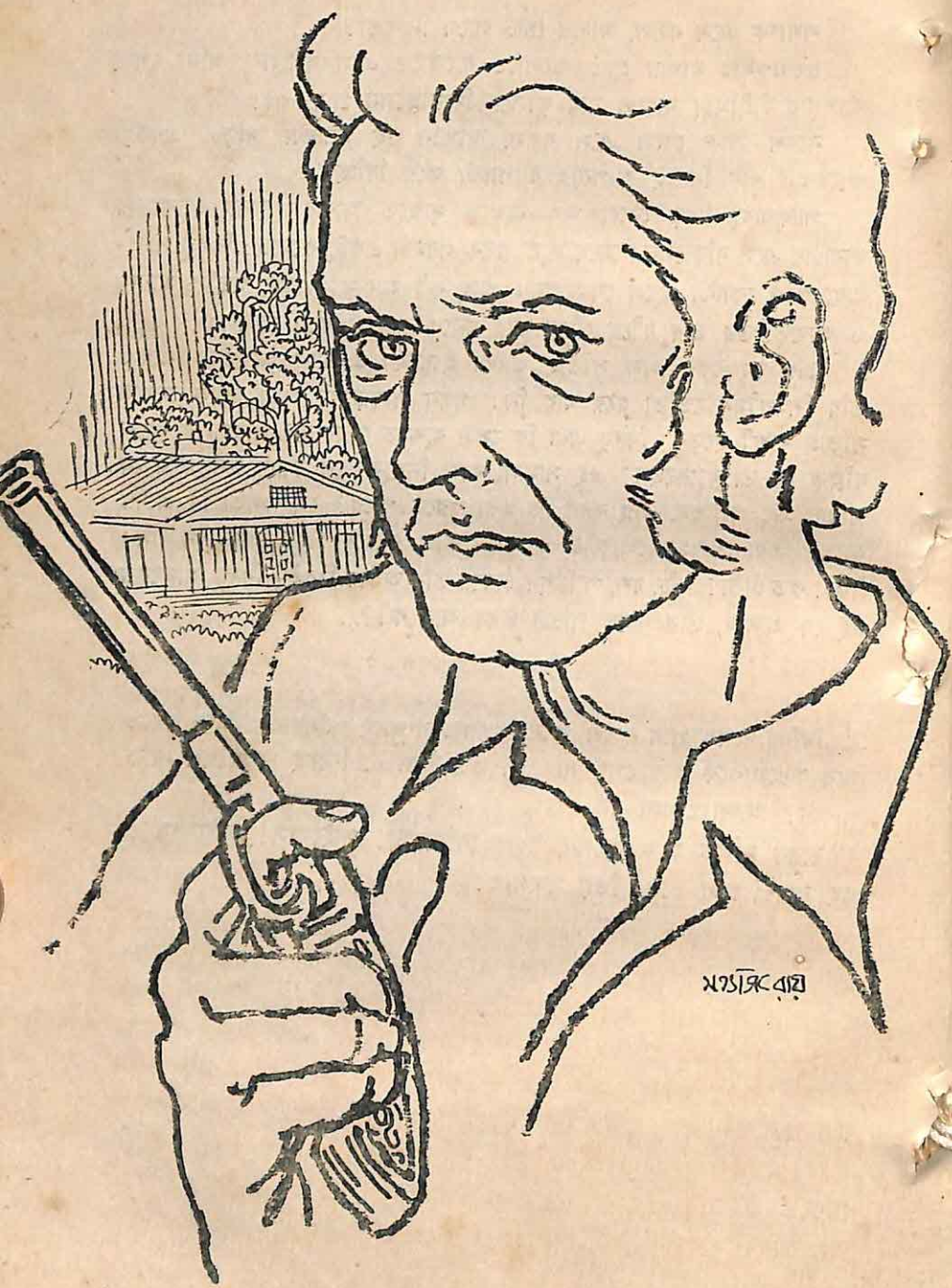
নীল আতঙ্ক

আমার নাম অনিরুদ্ধ বোস। আমার বয়স ঊনত্রিশ। এখনো বিয়ে করিনি। আজ আট বছর হল আমি কলকাতার একটা সদাগরী আপিসে চাকরি করছি। মাইনে যা পাই তাতে একা মানুষের দিব্যি চলে যায়। সর্দার শঙ্কর রোডে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছি, দোতলায় দুখানা ঘর, দক্ষিণ খোলা। দুবছর হল একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি কিনেছি—সেটা আমি নিজেই চালাই। আপিসের কাজের বাইরে একটু-আধটু সাহিত্য করার শখ আছে। আমার তিনখানা গল্প বাংলা মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছে, চেনা মহলে প্রশংসাও পেয়েছে। তবে এটা আমি জানি যে, কেবলমাত্র লিখে রোজগার করার মত ক্ষমতা আমার নেই। গত কয়েক মাসে লেখা একদম হয়নি, তবে বই পড়েছি অনেক। আর তার সবই বাংলাদেশে নীলের চাষ সম্পর্কে। এ বিষয় এখন আমাকে একজন অথরিটি বলা চলে। কবে সাহেবরা এসে আমাদের দেশে প্রথম নীলের চাষ শুরু করল, আমাদের গ্রামের লোকেদের উপর তারা কিরকম অত্যাচার করত, কীভাবে 'নীল বিদ্রোহ' হল, আর সব শেষে কীভাবে জার্মানি কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরি করার ফলে এদেশ থেকে নীলের পাট উঠে গেল—এসবই এখন আমার নখদর্পণে। যে সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার ফলে আমার মনে নীল সম্পর্কে এই কৌতূহল জাগল, সেটা বলার জন্যই আজ লিখতে বসেছি।

এখানে আগে আমার ছেলেবেলার কথা একটু বলা দরকার।

আমার বাবা মুঙ্গেরে নামকরা ডাক্তার ছিলেন। ওখানেই আমার জন্ম আর ওখানের এক মিশনারি স্কুলে আমার ছেলেবেলার পড়াশুনা। আমার এক দাদা আছেন, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। তিনি বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি পাশ করে লণ্ডনের কাছেই গোল্ডার্স গ্রীন বলে একটা জায়গায় হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন; দেশে ফেরার বিশেষ ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। আমার যখন ষোল বছর বয়স তখন বাবা মারা যান। তার কয়েকমাস পরেই আমি মা-কে নিয়ে কলকাতায় এসে আমার বড় মামার বাড়িতে উঠি। মামাবাড়িতে থেকেই আমি সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে বি.এ. পাশ করি। তারপর একটা সাময়িক ইচ্ছে হয়েছিল সাহিত্যিক হবার, কিন্তু

মা-র ধমকানিতে চাকরির চেষ্টা দেখতে হল। বড় মামার সুপারিশেই চাকরিটা হল, তবে আমারও যে কিছুটা কৃতিত্ব ছিল না তা নয়। ছাত্র হিসেবে আমার রেকর্ডটা ভালোই, ইংরিজিটাও বেশ গড় গড় করে বলতে পারি, আর তাছাড়া আমার মধ্যে একটা আত্মনির্ভরতা ও স্মার্টনেস আছে যেটা ইণ্টারভিউ-এর সময় আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছিল।

মুঙ্গেরে ছেলেবেলার কথাটা বললে হয়ত আমার চরিত্রের একটা দিক বুঝতে সাহায্য করবে। কলকাতায় একনাগাড়ে বেশিদিন থাকতে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এত লোকের ভীড়, ট্রামবাসের ঘরঘরানি, এত হৈ হল্লা, জীবনধারণের এত সমস্যা—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এইসবের থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে যাই। আমার বাড়িটা কেনার পর কয়েকবার এটা করেওছি। ছুটির দিনে একবার ডায়মণ্ড হারবার, একবার পোর্টক্যানিং, আর একবার দমদমের রাস্তা দিয়ে সেই একেবারে হাসনাবাদ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। একাই গিয়েছি প্রতিবার, কারণ এ ধরনের আউটিং-এ উৎসাহ প্রকাশ করার মত কাউকে খুঁজে পাইনি।

এ থেকে বোঝাই যাবে যে কলকাতা শহরে সত্যি করে বন্ধু বলতে আমার তেমন কেউ নেই। তাই প্রমোদের চিঠিটা পেয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। প্রমোদ ছিল আমার মুঙ্গেরের সহপাঠী। আমি কলকাতায় চলে আসার পর বছর চারেক আমাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলেছিল, তারপর বোধহয় আমার দিক থেকেই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন আপিস থেকে ফিরতেই চাকর গুরুদাস বলল মামাবাড়ি থেকে লোক এসে একটা চিঠি দিয়ে গেছে। খামের উপর লেখা দেখেই বুঝলাম প্রমোদ। দুমকা থেকে লিখছে—'জংলি আপিসে চাকরি করছি...কোয়ারটার্স আছে...দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে চলে আয়...'।

ছুটি পাওনা ছিল বেশ কিছুদিনের, তাই যত শীঘ্র সম্ভব আপিসের কাজ গুছিয়ে নিয়ে, গত ২৭শে এপ্রিল—তারিখটা আজীবন মনে থাকবে—তল্পিতল্পা গুটিয়ে, কলকাতার জঞ্জাল ও ঝঞ্ঝাট পিছনে ফেলে রওনা দিলাম দুমকার উদ্দেশে।

প্রমোদ অবিশ্যি মোটরযোগে দুমকা যাবার কথা একবারও বলেনি। ওটা আমারই আইডিয়া। দু'শ মাইল রাস্তা, বড় জোর পাঁচ-সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার ধাক্কা। দশটার মধ্যে ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ব, দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছে যাবো, এই ছিল মতলব।

কাজের বেলা গোড়াতেই একটা হোঁচট খেতে হল। রান্না তৈরি ছিল ঠিক সময়, কিন্তু ভাত খেয়ে সবে মুখে পানটা পুরেছি, এমন সময় বাবার পুরোন বন্ধু মোহিত কাকা এসে হাজির। একে ভারভার্তিক লোক, তার

উপর প্রায় দশ বছর পরে দেখা; মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারলাম না আমার তাড়া আছে। ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে হল, তারপর ঝাড়া একঘণ্টা ধরে তার সুখদুঃখের কাহিনী শুনতে হল।

মোহিত কাকাকে বিদায় দিয়ে গাড়িতে মাল তুলে যখন নিজে উঠতে যাচ্ছি, তখন দেখি আমার একতলার ভাড়াটে ভোলাবাবু তার চার বছরের ছেলে পিণ্টুর হাত ধরে কোত্থেকে যেন বাড়ি ফিরছেন। আমায় দেখে বললেন, 'একা একা কোথায় পাড়ি দিচ্ছেন?'

আমার উত্তর শুনে ভদ্রলোক একটু উদ্বিগ্নভাবেই বললেন, 'এতটা পথ মোটরে একা যাবেন? অন্তত এই ট্রিপটার জন্য একটা ড্রাইভার-ট্রাইভারের বন্দোবস্ত করলে হত না?'

আমি বললাম, 'চালক হিসেবে আমি খুব হুঁশিয়ার, আর আমার যত্নের ফলে গাড়িটাও প্রায় নতুনই রয়েছে, তাই ভাবনার কিছু নেই।' ভদ্রলোক 'বেস্ট্ অফ লাক' বলে ছেলের হাত ধরে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন।

গাড়িতে বসে স্টার্ট দেবার আগে হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি—পৌনে এগারটা।

হাওড়া দিয়ে না গিয়ে বালি ব্রিজের রাস্তা নেওয়া সত্ত্বেও, চন্দননগর পৌঁছতেই লাগল দেড় ঘণ্টা। এই তিরিশটা মাইল পেরোতে এত ঝক্কি, রাস্তা এত বাজে ও আন্‌রোমাণ্টিক যে, মোটরযাত্রার প্রায় ষোলআনা উৎসাহ উবে যায়। কিন্তু তার ঠিক পরেই শহর পিছনে ফেলে গাড়ি যখন ছোটে মাঠের মধ্যে দিয়ে, তখন সেটা কাজ করে একেবারে ম্যাজিকের মত। মন তখন বলে—এর জন্যেই তো আসা! কোথায় ছিল অ্যাদ্দিন এই চিমনির ধোঁয়া-বর্জিত মসৃণ আকাশ, এই মাটির গন্ধ মেশানো মনমাতানো বিশুদ্ধ মেঠো বাতাস?

দেড়টা নাগাত যখন বর্ধমানের কাছাকাছি পৌঁছেছি, তখন পেটে একটা খিদের ভাব অনুভব করলাম। সঙ্গে কমলালেবু আছে, ফ্লাস্কে গরম চা আছে, কিন্তু মন চাইছে অন্য কিছু। রাস্তার পাশেই স্টেশন; গাড়ি থামিয়ে রেষ্টোর‍্যাণ্টে গিয়ে দুটো টোস্ট, একটা অমলেট ও এক পেয়ালা কফি খেয়ে আবার রওনা দিলাম। পথ বাকি এখনো একশো তিরিশ মাইল।

বর্ধমান থেকে পঁচিশ মাইল গিয়ে পানাগড় পড়ে। সেখান থেকে গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে ইলামবাজারের রাস্তা নিতে হবে। ইলামবাজার থেকে শিউড়ি হয়ে ম্যাসানজোর পেরিয়ে দুমকা।

পানাগড়ের মিলিটারি ক্যাম্পগুলো সবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, এমন সময়

আমার গাড়ির পিছনের দিক থেকে একটা বেলুন ফাটার মত শব্দ হল, আর সেই সঙ্গে গাড়িটা একপাশে একটু কেদ্‌রে গেল। কারণ অবিশ্যি সহজেই বোধগম্য।

গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম শহর এখনও কয়েক মাইল দূরে। কাছাকাছির মধ্যে মেরামতির দোকানের আশাটা মন থেকে মুছে ফেলতে হল। সঙ্গে যে 'স্টেপ্‌নী' ছিল না তা নয়, আর জ্যাক্‌ দিয়ে গাড়ি তুলে ফাটা টায়ার খুলে ফেলে তার জায়গায় নতুন টায়ার পরানো আমার অসাধ্য কিছু নয়। তবু, এক্ষেত্রে পরিশ্রম এড়ানোর ইচ্ছেটা অস্বাভাবিক নয়। আর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়িতে টায়ার পরাব—পাশ দিয়ে হুশ্‌ হুশ্‌ করে অন্য কত গাড়ি বেরিয়ে যাবে, আর আমার শোচনীয় হাস্যকর অবস্থাটা তারা দেখে ফেলবে—এটা ভাবতে মোটেই ভালো লাগছিল না। কিন্তু কী আর করা? দশ মিনিট এদিক ওদিক চেয়ে ঘোরাফেরা করে গঙ্গা বলে কাজে লেগে পড়লাম।

নতুন টায়ার লাগিয়ে ফাটা টায়ার ক্যারিয়ারে ভরে ডালা বন্ধ করে যখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, তখন সার্টটা ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেছে। ঘড়িতে দেখি আড়াইটা বেজে গেছে। আবহাওয়াতে একটা গুমোট ভাব। ঘণ্টাখানেক আগেও সুন্দর হাওয়া বইছিল; গাড়ি থেকে দেখছিলাম বাঁশঝাড়ের মাথাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। এখন চারিদিক থমথমে। গাড়িতে ওঠার সময় পশ্চিমের আকাশের নীচের দিকে দূরের গাছপালার মাথায় একটা কালচে নীলের আভাস লক্ষ্য করলাম। মেঘ। ঝড়ের মেঘ কি? কালবৈশাখী? ভেবে লাভ নেই। স্পীডোমিটারের কাঁটা আরো চড়াতে হবে। ফ্লাস্ক্‌টা খুলে খানিকটা গরম চা মুখে ঢেলে আবার রওনা দিলাম।

ইলামবাজার পেরোতে না পেরোতেই ঝড়টা এসে পড়ল। ঘরে বসে যে জিনিস চিরকাল সানন্দে উপভোগ করেছি—যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছি, গান করেছি—সেই জিনিসই খোলা মাঠের মধ্যে পিচের রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে যে কী বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে তা কল্পনা করতে পারিনি। আর বাজ জিনিসটাকে কেন জানি কোনদিনই আমি বরদাস্ত করতে পারি না। ওটাকে প্রকৃতির একটা শয়তানি বলে মনে হয়। অসহায় মানুষকে এক নির্মম রসিকতায় নাজেহাল করার ভাব নিয়ে যেন এই বাজের খেলা। এদিকে ওদিকে আচমকা বৈদ্যুতিক শর-নিক্ষেপ, আর পরমুহূর্তেই কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করা দামামা গর্জন—গুড় গুড় গুড় গুড় কড়কড় কড়াৎ! এক এক সময় মনে হচ্ছে যে আমার এই নিরীহ

অ্যাম্ব্যাসাডার গাড়িকেই তাগ করে বিদ্যুৎবাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, এবং আরেকটু মনোযোগ দিয়ে কাজটা করলেই লক্ষ্যভেদ হয়ে যাবে।

এই দুর্যোগের মধ্যেই কোনোমতে যখন শিউড়ি ছাড়িয়ে ম্যাসানজোরের পথে পড়েছি, তখন হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল যেটাকে কোনোমতেই বজ্রপাত বলে ভুল করা চলে না। বুঝলাম আমার গাড়ির আরেকটি টায়ার কাজে ইস্তফা দিলেন।

হাল ছেড়ে দিলাম। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। গত বিশ মাইল স্পীডোমিটারের কাঁটাকে পনর থেকে পঁচিশের মধ্যে রাখতে হয়েছে। নাহলে এতক্ষণে ম্যাসানজোর ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। কোথায় এসে পৌঁছলাম? সামনের দিকে চেয়ে কিছু বোঝার উপায় নেই। কাঁচের উপর জলপ্রপাত। ওয়াইপারটা সপাৎ সপাৎ শব্দ করে চলেছে, কিন্তু সেটাকে কাজ না বলে খেলা বলাই ভালো। নিয়মমত এপ্রিলমাসে এখনো সূর্যের আলো থাকার কথা, কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় রাত হল বলে।

আমার ডানপাশের দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে চাইলাম। যা দেখলাম তাতে মনে হল কাছাকাছির মধ্যে ঘন বসতি না থাকলেও, দু-একটা পাকাবাড়ি যেন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে যে একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখব তার উপায় নেই। তবে সেটা না দেখেও যে জিনিসটা বলা যায় সেটা হল এই যে, মাইল খানেকের মধ্যে বাজার বা দোকান বলে কোন পদার্থ নেই।

আর আমার সঙ্গে বাড়তি টায়ারও আর নেই।

মিনিট পনের গাড়িতে বসে থাকার পর একটা প্রশ্ন মনে জাগল : এত-খানি সময়ের মধ্যে একটি গাড়ি বা একটি মানুষও আমার গাড়ির পাশ দিয়ে গেল না। তবে কি ভুল পথে এসে পড়েছি? সঙ্গে রোড ম্যাপ আছে। শিউড়ি পর্যন্ত ঠিকই এসেছি জানি, কিন্তু তারপরে যদি কোনো ভুল রাস্তায় মোড় ঘুরে থাকি? এই চোখধাঁধানো বৃষ্টিতে সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু যদি বা ভুল হয়ে থাকে—এটা তো আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল নয় যে, দিশেহারা হয়ে পড়তে হবে! যেখানেই এসে থাকি না কেন, এটা বীরভূমেরই মধ্যে, শান্তিনিকেতন থেকে মাইল পঞ্চাশের বেশি দূর নয়, বৃষ্টি থামলেই সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে, এমনকি হয়ত মাইল খানেকের মধ্যে একটা গাড়ি মেরামতের দোকানও পেয়ে যাবো।

পকেট থেকে উইলস-এর প্যাকেট আর দেশলাই বার করে একটা সিগারেট ধরালাম। ভোলাবাবুর কথা মনে পড়ল। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ভুক্তভোগী—নইলে এমন খাঁটি উপদেশ দেন কী করে? ভবিষ্যতে—

প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্!

একটা তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল, হর্নের শব্দে সজাগ হয়ে উঠে বসলাম। বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। তবে অন্ধকার গাঢ়তর।

প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক্ প্যাঁ—ক!

পিছন ফিরে দেখি একটা লরি এসে দাঁড়িয়েছে। হর্ন দিচ্ছে কেন? আমি কি রাস্তার পুরোটা দখল করে আছি নাকি?

দরজা খুলে নেমে দেখি লরির দোষ নেই। টায়ার ফাটার সময় গাড়িটা খানিকটা ঘুরে গিয়ে রাস্তার পুরোটা না হলেও প্রায় আধখানা আটকে রেখেছে—লরি যাবার জায়গা নেই।

'গাড়ি সাইড কীজিয়ে—সাইড কীজিয়ে!'

আমার অসহায় ভাব দেখেই বোধ হয় পাঞ্জাবী ড্রাইভারটি নেমে এলেন।

'কেয়া হুয়া? পাংচার?'

আমি ফরাসী কায়দায় কাঁধ দুটোকে একটু উঁচিয়ে আমার শোচনীয় অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, 'আপনি যদি একটু হাত লাগান তাহলে এটাকে এক পাশে সরিয়ে আপনার যাবার জায়গা করে দিতে পারি।'

এবার লরি থেকে পাঁইজীর সহকারী নেমে এলেন। তিনজনে ঠেলে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে একপাশে করে দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করে জানলাম যে এটা দুমকার রাস্তা নয়। আমি ভুল পথে এসে গেছি, তবে সেটা মাইল তিনেকের বেশি নয়। কাছাকাছির মধ্যে গাড়ি সারানোর কোন দোকান নেই।

লরি চলে গেল। তার ঘর ঘর শব্দ মিলিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশাল নৈঃশব্দ্যের সৃষ্টি হল, আর আমি বুঝলাম যে আমি অকূল পাথারে পড়েছি।

আজ রাত্রের মধ্যে দুমকা পেঁছানর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, এবং রাতটা কীভাবে কাটবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই।

আশেপাশের ডোবা থেকে ব্যাঙের কোরাস আরম্ভ হয়েছে। বৃষ্টিটা কমের দিকে। অন্য সময় হলে মাটির সোঁদা গন্ধে মনটা মেতে উঠত, কিন্তু এ অবস্থায় নয়।

আবার গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু তাতেই বা কী লাভ? হাত পা ছড়িয়ে আরাম করার পক্ষে অ্যাম্বাসাডার গাড়ির মত অনুপযুক্ত আর কিছু আছে কি? বোধ হয় না।

আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাব, এমন সময় হঠাৎ পাশের জানালা দিয়ে একটা ক্ষীণ আলো এসে স্টিয়ারিং হুইলটার উপর পড়ল। আবার দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে দেখি গাছের ফাঁক দিয়ে একটা আলোর চতুষ্কোণ দেখা যাচ্ছে। বোধহয় জানালা। ধোঁয়ার কারণ আগুন, কেরোসিনের আলোর

কারণ মানুষ। কাছাকাছি বাড়ি আছে, এবং তাতে মানুষ আছে।

টর্চটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। আলোর দূরত্ব বেশি নয়। আমার উচিত এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করা। একটা রাস্তাও রয়েছে, অপরিসর পথ, সেটা বোধহয় আলোরই দিক থেকে, আমি যে রাস্তায় আছি সেটায় এসে পড়েছে। পথের দু'পাশে গাছপালার বন, তলার দিকে আগাছার জঙ্গল।

কুছ পরোয়া নেহি। গাড়ির দরজা লক্ করে রওনা দিলাম।

যতদূর সম্ভব খানাখন্দ বাঁচিয়ে জলকাদার মধ্যে দিয়ে ছপাৎ ছপাৎ করে খানিকদূর হেঁটে একটা তেঁতুলগাছ পেরোতেই বাড়িটা চোখে পড়ল। বাড়ি বলা ভুল হবে—একখানা কি দেড়খানা ইঁটের ঘরের উপর একটা টিনের চালা। ফাঁক করা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর একটা জ্বালানো লণ্ঠন, একটা ধোঁয়াটে ভাব, আর একটা খাটিয়ার কোণ লক্ষ্য করলাম।

'কোই হ্যায়?'

একটা মাঝবয়সী বেঁটে গোঁফওয়ালা লোক বেরিয়ে এসে আমার টর্চের আলোর দিকে ভুরু কুঁচকে চাইল। আমি আলোটা নামিয়ে নিলাম।

'কাঁহাসে আয়া বাবু?'

আমার দুর্ঘটনার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বললাম, 'এখানে কাছাকাছির মধ্যে রাত কাটানোর কোন বন্দোবস্ত হতে পারে? যা পয়সা লাগে আমি দেবো।'

'ডাক বাংলামে?'

ডাক বাংলো? সে আবার কোথায়?

প্রশ্নটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বোকামোটা বুঝতে পারলাম। এতক্ষণ কেবল লন্ঠন আর টর্চের আলোর দিকে দৃষ্টি থাকার ফলে আশে-পাশে কী আছে দেখিইনি। এবার টর্চটাকে ঘুরিয়ে আমার বাঁ দিকে ফেলতেই একটা বেশ বড় একতলা পুরোন বাড়ি চোখে পড়ল। সেটা দেখিয়ে বললাম, 'এটাই ডাক বাংলো?'

'হাঁ বাবু। লেকিন বিস্তারা উস্তারা কুছ্ নেহি হ্যায়, খানা ভি নেহি মিলেগা।'

'বিছানা আমার সঙ্গে আছে। খাট হবে তো?'

'খাটিয়া হোগা।'

'আর তোমার ঘরে তো উনুন ধরিয়েছ দেখছি। তুমি নিজে খাবে নিশ্চয়ই।'

লোকটা হেসে ফেলল। তার হাতের সেঁকা মোটা রুটি, আর তার বৌয়ের রান্না উরুৎ কা ডাল কি আমার চলবে? বললাম, খুব চলবে। সব রকম রুটিই আমার চলে, আর উরুৎ কা ডাল তো আমার অতি প্রিয় খাদ্য!

এককালে কী ছিল জানি না, এখন নামেই ডাক বাংলো। তবে পুরোন

সাহেবী আমলের বাড়ি, তাই ঘরের সাইজ বড়, আর সীলিংটা পেল্লায় উঁচু। আসবাব বলতে একটি পুরোন নেয়ারের খাট, একপাশে একটা টেবিল, আর তার সামনের হাতল ভাঙা একটা চেয়ার।

চৌকিদার আমার জন্য একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল। বললাম, 'তোমার নাম কী হে?'

'সুখনরাম, বাবুজী।'

'এ বাংলোয় লোকজন কোনোকালে এসেছে, না আমিই প্রথম?'

সুখনরামের রসবোধ আছে। সে হেসে ফেলল। বললাম, 'ভূতটুত নেই তো?'

আরে রাম, রাম! কত লোকা তো এসে থেকে গেছে—কই, এমন অপবাদ তো কেউ দেয়নি।

এ কথায় একটু যে আশ্বস্ত হইনি তা বলতে পারি না। ভূতে বিশ্বাস করি বা না করি, এটুকু অন্তত জানি যে ভূত যদি থাকেই এ বাংলোতে, তাহলে সে সব সময়ই থাকবে, আর না থাকলে কোন সময়ই থাকবে না। বললাম, 'এটা কদ্দিনের পুরোন বাড়ি?'

সুখন আমার বেডিং খুলে দিতে দিতে বলল, 'পহিলে ইয়ে নীল কোঠি থা। এক নীলকা ফেক্টরি ভি থা নজদিগমে। উস্‌কা এক চিমনি আভি তক্ খাড়া হ্যায়; আউর সব টুট গিয়া।'

এ অঞ্চলে যে এককালে নীলের চাষ হত সেটা জানতাম। মুঙ্গেরের আশেপাশেও ছেলেবেলায় পুরোন ভাঙা নীলকুঠি দেখেছি।

সুখনের তৈরি রুটি আর কলাইয়ের ডাল খেয়ে নেয়ারের খাটে বিছানা পেতে যখন শুলাম তখন রাত সাড়ে দশটা। প্রমোদকে আজ বিকেলে পেঁছব বলে টেলিগ্রাম করেছিলাম, ও একটু চিন্তিত হবে অবশ্যই। কিন্তু সে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। একটা আস্তানা যে পেয়েছি, এবং বেশ সহজেই পেয়েছি, সেটা কম ভাগ্যের কথা নয়। ভবিষ্যতে ভোলাবাবুর উপদেশ মেনে চলব। উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার। তবে এটাও ঠিক যে এমনি শেখার চেয়ে ঠেকে শেখার দাম অনেক বেশি।

লণ্ঠনটা পাশের বাথরুমে রেখে এসেছি। দরজার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আলো আসছে তাই যথেষ্ট। ঘরে বেশি আলো থাকলে আমার ঘুম আসে না, অথচ এখন যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হল ঘুম। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র সব বার করে নিয়ে সেটা লক্ করে এসেছি, বলাই বাহুল্য। এটুকু জোর গলায় বলতে পারি যে, আজকালকার দিনে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি ফেলে রাখা যতটা বিপজ্জনক, গ্রামের রাস্তায় তার চেয়ে হয়ত কিছুটা কমই।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ থেমে গেছে। ব্যাঙ আর ঝিঁঝির সমবেত কণ্ঠস্বরে রাত মুখর হয়ে উঠেছে। শহরের জীবনটা এত দূরে আর এত পিছনে সরে গেছে যে, সেটাকে একটা প্রাগৈতিহাসিক পর্ব বলে মনে হচ্ছে। নীলকুঠি!... দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের কথা মনে পড়ল। কলেজে থাকতে অভিনয় দেখেছিলাম...কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের কোন এক পেশাদারী থিয়েটারে...

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। কতক্ষণ পরে তা জানি না।

দরজায় একটা খচ্ মচ্ শব্দ হচ্ছে। ভেতরে হুড়কো দেওয়া; বুঝলাম বাইরে থেকে কুকুর বা শেয়াল জাতীয় একটা কিছু নখ দিয়ে সেটাকে আঁচড়াচ্ছে। মিনিট খানেক পরে আওয়াজটা থেমে গেল। আবার সব চুপ-চাপ।

চোখ বুজলাম, কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। একটা কুকুরের ডাকে ঘুমটা একেবারে গেল।

বাংলার গ্রাম্য নেড়িকুত্তার ডাক এটা নয়। এ হল বিলিতি হাউন্ডের হুঙ্কার। এ ডাক আমার অচেনা নয়। মুঙ্গেরে আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরেই মার্টিন সাহেবের বাড়ি থেকে রাত্রে এ ডাক শুনতে পেতাম। এ তল্লাটে এমন কুকুর কে পুষবে? একবার মনে হল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি—কারণ কুকুরটা ডাক বাংলোর খুব কাছেই রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তারপর মনে হল, সামান্য একটা কুকুরের ডাক নিয়ে এতটা মাথা ঘামানোর কোন মানেই হয় না। তার চেয়ে আবার ঘুমনোর চেষ্টা দেখা যাক্। রাত ক'টা হল?

জানলা দিয়ে অল্প চাঁদের আলো আসছে। শোয়া অবস্থাতেই বাঁ হাতটা তুলে মুখের সামনে আনতেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল।

হাতে ঘড়ি নেই।

অথচ অটোম্যাটিক ঘড়ি যত প'রে থাকা যায় ততই ভালো বলে ওটা শোবার সময়ও কক্ষনো খুলে শুই না। ঘড়ি কোথায় গেল? শেষটায় কি ডাকাতের আস্তানায় এসে পড়লাম নাকি? তাহলে আমার গাড়ির কী হবে?

বালিশের পাশে হাতড়িয়ে টর্চটা খুঁজতে গিয়ে দেখি সেটাও নেই।

একলাফে বিছানা থেকে উঠে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে খাটের নীচে তাকিয়ে দেখি সুটকেশটাও উধাও।

মাথা গরম হয়ে এল। এর একটা বিহিত করতেই হবে। হাঁক দিলাম—'চৌকিদার!'

কোন উত্তর নেই।

বারান্দায় যাবো বলে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে খেয়াল হল যে

হুড়কোটাকে যেমন ভাবে লাগিয়ে শুয়েছিলাম, ঠিক তেমনিই আছে। জানালাতেও গরাদ—তবে চোর এল কোথা দিয়ে?

দরজার হুড়কোটা খুলতে আমার নিজের হাতের উপর চোখ পড়ে কেমন জানি খট্‌কা লাগল।

হাতে কি দেয়াল থেকে চুণ লেগেছে—না পাউডার জাতীয় কিছু? এমন ফ্যাকাসে লাগছে কেন?

আর আমি তো গেঞ্জি পরে শুয়েছিলাম—তাহলে আমার গায়ে লম্বাহাতা সিল্কের সার্ট কেন?

মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। দরজা খুলে বাইরে এলাম।

'ছাউখিডা-র!'

নিজের গলার স্বর চিনতে পারলাম না। উচ্চারণও না। যতই মিশনারি ইস্কুলে পড়ি না কেন—বাংলা উচ্চারণে উগ্র সাহেবিয়ানা আমার কোন দিন ছিল না।

আর চৌকিদারই বা কোথায়, আর কোথায়ই বা তার ঘর। বাংলোর সামনে ধু ধু করছে মাঠ। দূরে আবছা একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তার পাশে একটা চিমনির মতন স্তম্ভ। চারিদিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা।

আমার পরিবেশ বদলে গেছে।

আমি নিজেও বদলে গেছি।

ঘর্মাক্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে এলাম। চোখটা অন্ধকারে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। ঘরের সব কিছুই এখন দেখতে পাচ্ছি। খাট আছে—তাতে মশারি নেই—অথচ আমি মশারি টাঙিয়ে শুয়েছিলাম। বালিশ যেটা রয়েছে সেটাও আমার নয়। আমারটা ছিল সাধারণ, এটার পাশে বাহারের কুঁচি দেওয়া বর্ডার। খাটের ডান দিকের দেওয়ালের সামনে সেই টেবিল, সেই চেয়ার—কিন্তু তাতে প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন নেই। আবছা আলোতেও তার বার্ণিশ করা কাঠটা চক্‌ চক্‌ করছে। টেবিলের উপর রাখা রয়েছে—লণ্ঠন নয়—বাহারের শেড-ওয়ালা কাজ করা কেরোসিন ল্যাম্প।

আরো জিনিসপত্র রয়েছে ঘরে—সেগুলো ক্রমে দৃষ্টিগোচর হল। এক কোণায় দুটো ট্রাঙ্ক। দেওয়ালে একটা আলনা, তা থেকে ঝুলছে একটা কোট, একটা অদ্ভুত অচেনা ধরনের টুপি, আর একটা হাণ্টার চাবুক। আলনার নীচে এক জোড়া হাঁটু অবধি উঁচু জুতো—যাকে বলে goloshes।

জিনিসপত্র ছেড়ে আরেকবার আমার নিজের দিকে দৃষ্টি দিলাম। এর আগে শুধু সিল্কের সার্টটা লক্ষ্য করেছিলাম। এখন দেখলাম তার নীচে রয়েছে সরু চাপা প্যাণ্ট। আরো নিচে মোজা। পায়ে জুতো নেই, তবে খাটের পাশেই দেখলাম এক জোড়া কালো চামড়ার বুট রাখা রয়েছে।

আমার ডান হাতটা এবার আমার মুখের উপর বুলিয়ে বুঝতে পারলাম, শুধু গায়ের রং ছাড়াও আমার চেহারার আরো পরিবর্তন হয়েছে। এত চোখা নাক, এত পাতলা ঠোঁট আর সরু চোয়াল আমার নয়। মাথায় হাত দিয়ে দেখি ঢেউ খেলানো চুল পিছনে কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। কানের পাশে ঝুলপি নেমে এসেছে প্রায় চোয়াল পর্যন্ত।

বিস্ময় ও আতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র কৌতূহল হল আমার নিজের চেহারাটা দেখার জন্য। কিন্তু আয়না? আয়না কোথায়?

রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে এক ধাক্কায় বাথরুমের দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

আগে দেখেছিলাম একটিমাত্র বালতি ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। এখন দেখি মেঝের এক কোণে একটা টিনের বাথটাব, তার পাশে চৌকি আর এনামেলের মগ। যে জিনিসটা খুঁজছিলাম সেটা রয়েছে আমার ঠিক সামনেই—একটা কাঠের ড্রেসিং টেবিলের উপর লাগানো একটা ওভাল-শেপের আয়না। আমি জানি আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি—কিন্তু যে চেহারাটা তাতে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা আমার নয়। কোনো এক বীভৎস ভৌতিক ভেল্‌কির ফলে আমি হয়ে গেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন সাহেব—তার গায়ের রং ফ্যাকাশে ফরসা, চুল সোনালি, চোখ কটা এবং সে চোখের চাহনিতে ক্লেশের সঙ্গে কাঠিন্যের ভাব অদ্ভুত ভাবে মিশেছে। কত বয়স এ সাহেবের? ত্রিশের বেশি নয়, তবে দেখে মনে হয় অসুস্থতা কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অকালেই বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে।

কাছে গিয়ে আরো ভালো করে 'আমার' মুখটা দেখলাম। চেয়ে থাকতে থাকতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর থেকে উঠে এল।

'ওঃ!'

এ কণ্ঠস্বর আমার নয়। এই দীর্ঘশ্বাসও সাহেবেরই মনের ভাব ব্যক্ত করছে—আমার নয়।

এর পরে যা ঘটল, তাতে বুঝলাম যে শুধু গলার স্বর নয়, আমার হাত পা সবই অন্য কারুর অধীনে কাজ করছে। কিন্তু আশ্চর্য এই, যে আমি—অনিরুদ্ধ বোস—যে বদলে গেছি—সে জ্ঞানটা আমার আছে। অথচ এই পরিবর্তনটা ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী, এ থেকে নিজের অবস্থায় ফিরে আসার কোন উপায় আছে কিনা, তা আমার জানা নেই।

বাথরুম থেকে শোবার ঘরে ফিরে এলাম।

আবার রাইটিং টেবিলের দিকে চোখ পড়ল। ল্যাম্পটা এখন জ্বলছে। ল্যাম্পের নীচে খোলা অবস্থায় একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতা। তার পাশে একটা দোয়াতে ডোবানো রয়েছে একটা খাগের কলম।

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। খাতার খোলা পাতায় কিছু লেখা হয়নি। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দোয়াত থেকে কলমটা আমার ডান হাত দিয়ে তুলিয়ে দিল। সে হাত এবার খাতার বাঁ দিকে সাদা পাতার দিকে অগ্রসর হল। ঘরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে খস্‌খস্‌ শব্দ করে খাগের কলম লিখে চললঃ

২৭শে এপ্রিল, ১৮৬৮

কানের কাছে আবার সেই রাক্ষুসে মশার বিনবিনুনি আরম্ভ হয়েছে। শেষটায় এই সামান্য একটা পোকার হাতে আমার মত একটা জাঁদরেল ব্রিটিশারকে পরাহত হতে হল? ভগবানের এ কেমন বিধি? এরিক পালিয়েছে। পার্সি আর টোনিও আগেই ভেগেছে। আমার বোধহয় ওদের চেয়েও বেশি টাকার লোভ, তাই বার বার ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সত্ত্বেও নীলের মোহ কাটাতে পারিনি। না—শুধু তাই নয়। ডায়রিতে মিথ্যে কথা বলা পাপ। আরেকটা কারণ আছে। আমার দেশের লোক আমাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। সেখানে থাকতেও তো কম কুকীর্তি করিনি—আর তারা সেকথা ভোলেও নি। তাই ইংলন্ডে ফিরে যাবার সাহস নেই। বুঝতে পারছি এখানেই থাকতে হবে। আর এখানেই মরতে হবে। মেরি আর আমার তিন বছরের শিশু সন্তান টোবির কবরের পাশেই আমার স্থান হবে। এত অত্যাচার করেছি এখানকার স্থানীয় নেটিভদের উপর যে, আমার মৃত্যুতে চোখের জল ফেলার মত একটি লোকও নেই এখানে। এক যদি মীরজান কাঁদে। আমার বিশ্বস্ত অনুগত বেয়ারা মীরজান!

আর রেক্স? আসল ভাবনা তো রেক্সকে নিয়েই। হায় প্রভুভক্ত কুকুর! আমি মরে গেলে তোকে এরা আস্ত রাখবে না রে! হয় ঢিল মেরে না হয় লাঠির বাড়ি মেরে তোর প্রাণ শেষ করবে এরা। তোর যদি একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারতাম!...

আর লিখতে পারলাম না। হাত কাঁপছে। আমার হাত নয়—ডায়রি-লেখকের।

কলম রেখে দিলাম।

এবার আমার ডান হাতটা টেবিলের উপর থেকে নেমে কোলের কাছে এসে ডান দিকে গেল।

একটা দেরাজের হাতল।

হাতের টানে দেরাজ খুলে গেল।

ভিতরে একটা পিনকুশন, একটা পিতলের পেপার ওয়েট, একটা পাইপ,

কিছু কাগজপত্তর।

আরো খানিকটা খুলে গেল দেরাজ। একটা লোহার জিনিস চক্ চক্ করে উঠল। পিস্তল! তার হাতলে হাতির দাঁতের কাজ।

আমার হাত পিস্তলটাকে বার করে নিল। হাতের কাঁপুনি থেমে গেল।

বাইরে শেয়াল ডাকছে। সেই শেয়ালের ডাকের প্রত্যুত্তরেই যেন গর্জিয়ে উঠল হাউন্ডের কণ্ঠস্বর—ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে গেলাম। দরজা খুলে বাইরে।

সামনের মাঠে চাঁদের আলো।

বাংলোর বারান্দা থেকে হাত বিশেক দূরে ছাই রং-এর একটা প্রকান্ড গ্রে হাউন্ড ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি বাইরে আসা মাত্র আমার দিকে ফিরে লেজ নাড়তে লাগল।

'রেক্স!'

সেই গম্ভীর ইংরেজ কণ্ঠস্বর। দূরে বাঁশবন ও নীলের ফ্যাক্টরির দিক থেকে ডাকটা প্রতিধ্বনিত হয়ে এল—রেক্স!...রেক্স!...

রেক্স এগিয়ে এল—তার লেজ নড়ছে।

ঘাস থেকে বারান্দায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাত কোমরের কাছে উঠে এল—পিস্তলের মুখ কুকুরের দিকে। রেক্স যেন থমকে গেল। তার জ্বলন্ত চোখে একটা অবাক ভাব।

আমার ডান তর্জনী পিস্তলের ঘোড়া টিপে দিল।

বিস্ফোরণের সঙ্গে একটা চোখ ঝলসানো আলো, একটা ধোঁয়া আর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া বারুদের গন্ধ।

রেক্সের দেহের সামনের অংশ বারান্দার উপর ও পিছনটা ঘাসের উপর এলিয়ে পড়েছে।

পিস্তলের শব্দ শুনে কাক ডেকে উঠেছে দূরের গাছপালা থেকে। ফ্যাক্টরির দিক থেকে কিছু লোক যেন ছুটে আসছে বাংলোর দিকে।

ঘরে ফিরে এসে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে খাটের উপর এসে বসলাম। বাইরে লোকের গোলমাল এগিয়ে আসছে।

পিস্তলের নলটা আমার কানের পাশে ঠেকাতে বুঝলাম সেটা বেশ গরম।

তারপর আর কিছু জানি না।

* * *

দরজা ধাক্কানিতে ঘুম ভেঙে গেল।

'চা লিয়ায়া বাবুজী!'

ঘরে দিনের আলো। চিরকালের অভ্যাসমত দৃষ্টি আপনা থেকে বাঁ হাতের কবজির দিকে চলে গেল।

ছ'টা বেজে তেরো মিনিট। ঘড়ি চোখের আরো কাছে আনলাম—কারণ তারিখটাও দেখা যায় এতে।

আটাশে এপ্রিল।

বাইরে থেকে সুখলাল বলছে, 'আপকা গাড়ি ঠিক হো গিয়া বাবুজী।

বীরভূমের নীলকর সাহেবের মৃত্যুশতবার্ষিকীতে আমার অভিজ্ঞতার কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি

রাজেনবাবুকে রোজ বিকেলে ম্যাল্-এ আসতে দেখি। মাথার চুল সব পাকা, গায়ের রং ফরসা, মুখের ভাব হাসিখুশি। পুরোনো নেপালি আর তিব্বতী জিনিসটিনিসের যে দোকানটা আছে, সেটায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাইরে এসে বেঞ্চিতে আধঘন্টার মত বসে সন্ধে হব-হব হলে জালাপাহাড়ে বাড়ি ফিরে যান। আমি আবার একদিন ওঁর পেছন পেছন গিয়ে ওঁর বাড়িটাও দেখে এসেছি। গেটের কাছাকাছি যখন পেঁছেছি, হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে হে তুমি, পেছু নিয়েছ?' আমি বললাম, 'আমার নাম তপেশ-রঞ্জন বোস।' 'তবে এই নাও লজঞ্চুস' বলে পকেট থেকে সত্যিই একটা লেমনড্রপ বার করে আমায় দিলেন, আর দিয়ে বললেন, 'একদিন সকাল সকাল এসো আমার বাড়িতে—অনেক মুখোশ আছে; দেখাবো।'

সেই রাজেনবাবুর যে এমন বিপদ ঘটতে পারে তা কেউ বিশ্বাস করবে? ফেলুদাকে কথাটা বলতেই সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল।

'পাকামো করিসনে। কার কী করে বিপদ ঘটবে না-ঘটবে সেটা কি মানুষকে দেখলে বোঝা যায়?'

আমি দস্তুরমত রেগে গেলাম।

'বারে, রাজেনবাবু যে ভালো লোক সেটা বুঝি দেখলে বোঝা যায় না? তুমি তো তাকে দেখোইনি। দার্জিলিং-এ এসে অবধি তো তুমি বাড়ি থেকে বেরোওইনি। রাজেনবাবু নেপালি বস্তীতে গিয়ে গরীবদের কত সেবা করেছেন জান?'

'আচ্ছা বেশ বেশ, এখন বিপদটা কী তাই শুনি। আর তুই কাঁচ খোকা, সে বিপদের কথা তুই জানলি কী করে?'

কাঁচ খোকা অবিশ্যি আমি মোটেই না, কারণ আমার বয়স সাড়ে তেরো বছর। ফেলুদার বয়স আমার ঠিক ডবল।

সত্যি বলতে কি—ব্যাপারটা আমার জানার কথা নয়। ম্যাল্-এ বেঞ্চিতে বসেছিলাম—আজ রবিবার, ব্যান্ড বাজাবে, তাই শুনব বলে। আমার পাশে বসেছিলেন তিনকড়িবাবু, যিনি রাজেনবাবুর বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে দার্জিলিং-এ গরমের ছুটি কাটাতে এসেছেন। তিনকড়িবাবু আনন্দবাজার

পড়ছিলেন, আর আমি কোনরকমে ডাঁকঝুঁকি মেরে ফুটবলের খবরটা দেখার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্যাকাশে মুখ করে রাজেনবাবু এসে ধপ্ করে তিনকড়িবাবুর পাশে বসে গায়ের চাদরটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন।

তিনকড়িবাবু কাগজ বন্ধ করে বললেন, 'কী হল, চড়াই উঠে এলেন নাকি?'

রাজেনবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'আরে না মশাই। এক ইন্ক্রেডিব্ল ব্যাপার!'

ইন্ক্রেডিব্ল কথাটা আমার জানা ছিল। ফেলুদা ওটা প্রায়ই ব্যবহার করে। ওর মানে 'অবিশ্বাস্য'।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'এই দেখুন না।'

রাজেনবাবু পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা নীল কাগজ বার করে তিনকড়িবাবুর হাতে দিলেন। বুঝতে পারলাম সেটা একটা চিঠি।

আমি অবিশ্যি চিঠিটা পড়িনি, বা পড়ার চেষ্টাও করিনি; বরঞ্চ আমি উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে গুণগুণ করে গান গেয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন বুড়োদের ব্যাপারে আমার কোন ইণ্টারেস্টই নেই। কিন্তু চিঠিটা না পড়লেও, তিনকড়িবাবুর কথা আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

'সত্যিই ইন্ক্রেডিব্ল। আপনার ওপর কার এমন আক্রোশ থাকতে পারে যে আপনাকে এ ভাবে শাসিয়ে চিঠি লিখবে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'তাইতো ভাবছি। সত্যি বলতে কি, কোনদিন কারুর অনিষ্ট করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

তিনকড়িবাবু এবার রাজেনবাবুর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, 'হাটের মাঝখানে এসব ডিসকাস না করাই ভালো। বাড়ি চলুন।'

দুই বুড়ো উঠে পড়লেন।

ফেলুদা ঘটনাটা শুনে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে গুম্ হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, 'তুই তাহলে বলছিস যে একবার তলিয়ে দেখা চলতে পারে?'

'বা রে—তুমিই তো রহস্যজনক ঘটনা খুঁজছিলে। বললে অনেক ডিটেক্-টিভ বই পড়ে তোমারও ডিটেক্টিভ বুদ্ধিটা খুব ধারালো হয়ে উঠেছে।'

'তা তো বটেই। এই ধর—আমি তো আজ ম্যালে যাইনি, তবু বলে দিতে পারি তুই কোনদিকের বেঞ্চে বসেছিলি।'

'কোন দিক?'

'রাধা রেস্টুরাণ্টের ডান পাশের বেঞ্চগুলোর একটাতে।'

'আরেব্বাস! কী করে বুঝলে?'

'আজ বিকেলে রোদ ছিল। তোর বাঁ গালটা রোদে ঝল্‌সেছে, ডানটা ঝলসায়নি। একমাত্র ওই বেঞ্চগুলির একটাতে বসলেই পশ্চিমের রোদটা বাঁ গালে পড়ে।'

'ইন্‌ক্রেডিব্‌ল!'

'যাক্‌ গে। এখন কথা হচ্ছে—রাজেন মজুমদারের বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার।

*　　　　*　　　　*

'আর সাতাত্তর পা।'

'আর যদি না হয়?'

'হবেই, ফেলুদা। আমি সেবার গুনেছিলাম।'

'না হলে গাঁট্টা তো?'

'হ্যাঁ—কিন্তু বেশি জোরে না। জোরে মারলে মাথার ঘিলু এদিক ওদিক হয়ে যায়।'

কী আশ্চর্য—সাতাত্তরে রাজেনবাবুর বাড়ি পৌঁছলাম না। আরো তেইশ পা গিয়ে তবে ওর বাড়ির গেটের সামনে পড়লাম।

ফেলুদা ছোট্ট করে একটা গাঁট্টা মেরে বলল, 'আগের বার ফেরার সময় গুনেছিলি, না আসার সময়?'

'ফেরার সময়।'

'ইডিয়ট! ফেরার সময় তো ঢালু নামতে হয়। তুই নিশ্চয়ই ধাঁই ধাঁই করে ইয়া বড়া বড়া স্টেপস্‌ ফেলেছিলি!'

'তা হবে।'

'নিশ্চয়ই তাই। আর তাই স্টেপস্‌ সেবার কম হয়েছিল, এবার বেশি হয়েছে। জোয়ান বয়সে ঢালু নামতে মানুষে বড় বড় পা ফেলে প্রায় দৌড়নর মত। আর বুড়ো হলে ঢালুর বেলা ব্রেক ক'ষে ক'ষে ছোট ছোট পা ফেলতে হয়—তা নাহলে মুখ থুবড়ে পড়ে।'

কাছাকাছি কোন বাড়ি থেকে রেডিওতে গান শোনা যাচ্ছে। ফেলুদা এগিয়ে কলিং বেল টিপ্‌ল।

'কী বলবে সেটা ঠিক করেছ ফেলুদা?'

'যা খুশি তাই বলব। তুই কিন্তু স্পীক-টি-নট। যতক্ষণ থাকবি এ বাড়িতে, একটি কথা বলবিনে।'

'কিছু জিজ্ঞেস করলেও না?'

'শাটাপ্!'

একটা নেপালি চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

'অন্দর আঈয়ে।'

বৈঠকখানায় ঢুকলাম। বেশ সুন্দর পুরোনো প্যাটার্নের কাঠের বাড়ি। শুনেছি রাজেনবাবু দশ বছর হল রিটায়ার করে দার্জিলিং-এ আছেন। কলকাতায় বেশ নাম-করা উকিল ছিলেন।

চেয়ার টেবিল যা আছে ঘরে সব বেতের। যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে চারিদিকে দেয়ালে টাঙানো সব অদ্ভুত দাঁত খিঁচোনো চোখ রাঙানো মুখোশের সারি। আর আছে পুরোনো ঢাল, তলোয়ার, ভোজালি, থালা, ফুলদানি এইসব। কাপড়ের উপর রং করা বুদ্ধের ছবিও আছে—কত পুরোনো কে জানে? কিন্তু তাতে যে সোনালি রংটা আছে সেটা এখনও ঝলমল করছে।

আমরা দুজনে দুটো বেতের চেয়ারে বসলাম।

ফেলুদা দেয়ালের এদিক ওদিক দেখে বলল, 'পেরেকগুলো সব নতুন, মর্চে ধরেনি। ভদ্রলোকের প্রাচীন জিনিসের শখটা বোধহয় বেশি প্রাচীন নয়।'

রাজেনবাবু ঘরে ঢুকলেন।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা উঠে গিয়ে ঢিপ্ করে এক পেন্নাম ঠুকে বলল, 'চিনতে পারছেন? আমি জয়কৃষ্ণ মিত্তিরের ছেলে ফেলু।'

রাজেনবাবু প্রথমে চোখ কপালে তুললেন, তারপর চোখের দুপাশ কুঁচকিয়ে এক গাল হেসে বললেন, 'বা-বা! কত বড় হয়েছো তুমি, অ্যাঁ? কবে এলে এখানে? বাড়ির সব ভালো? বাবা এসেছেন?'

ফেলুদা জবাব দিচ্ছে, আর আমি মনে মনে বলছি—কী অন্যায়, এত কথা হল, আর ফেলুদা একবারও বলল না সে রাজেনবাবুকে চেনে?

এবার ফেলুদা আমার পরিচয়টাও দিয়ে দিল। রাজেনবাবুর মুখ দেখে মনেই হল না যে এই সাতদিন আগে আমাকে লজঞ্চুস দেবার কথাটা ওঁর মনে আছে।

ফেলুদা এবার বলল, 'আপনার খুব প্রাচীন জিনিসের শখ দেখছি।'

রাজেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এখন তো প্রায় নেশায় দাঁড়িয়েছে।'

'কদ্দিনের ব্যাপার?'

'এইতো—মাস ছ'য়েক হবে। কিন্তু এর মধ্যেই অনেক কিছু সংগ্রহ করে ফেলেছি।'

ফেলুদা এবার একটা গলা খাঁক্‌রানি দিয়ে, আমার কাছ থেকে শোনা ঘটনাটা বলে বলল, 'আপনি আমার বাবার মামলার ব্যাপারে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার প্রতিদানে আপনার এই বিপদে যদি কিছু করতে পারি...'

রাজেনবাবুর ভাব দেখে মনে হল তিনি সাহায্য পেলে খুশিই হবেন, কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই তিনকড়িবাবু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাঁপানোর বহর দেখে মনে হল বোধহয় বেড়িয়ে ফিরলেন। রাজেনবাবু আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার বিশেষ বন্ধু জ্ঞানেশ সেন অ্যাডভোকেট্ হচ্ছেন তিনকড়িবাবুর প্রতিবেশী। আমি ঘরভাড়া দেবো শুনে জ্ঞানেশই ওঁকে সাজেস্ট করে আমার এখানে আসতে। গোড়ায় উনি হোটেলের কথা ভেবেছিলেন।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'আমার ভয় ছিল আমার এই চুরুটের বাতিকটা নিয়ে। এমনও হতে পারত যে রাজেনবাবু হয়ত চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। তাই সেটা আমি আমার প্রথম চিঠিতেই লিখে জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কি বায়ুপরিবর্তনের জন্য এসেছেন?'

'তা বটে। তবে বায়ুর অভাবটাই যেন লক্ষ্য করছি বেশি। পাহাড়ে ঠান্ডাটা আরেকটু বেশি এক্সপেক্ট করে লোকে।'

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আপনার বোধহয় গানবাজনার শখ?'

তিনকড়িবাবু অবাক হাসি হেসে বললেন, 'সেটা জানলে কী করে হে?'

'আপনি যখন কথা বলছেন তখন লক্ষ্য করছি যে লাঠির উপর রাখা আপনার ডান হাতের তর্জনীটা রেডিওর গানটার সঙ্গে তাল রেখে যাচ্ছে।'

রাজেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'মোক্ষম ধরেছ। উনি ভালো শ্যামা সঙ্গীত গাইতে পারেন।'

ফেলুদা এবার বলল, 'চিঠিটা হাতের কাছে আছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হাতের কাছে কেন, একেবারে বুকের কাছে।'

রাজেনবাবু কোটের বুকপকেট থেকে চিঠিটা বার করে ফেলুদাকে দিলেন। এইবার সেটা দেখার সুযোগ পেলাম।

হাতে লেখা চিঠি নয়। নানান জায়গা থেকে ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে চিঠিটা লেখা হয়েছে। যা লেখা হয়েছে, তা হল এই—'তোমার অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করিতে প্রস্তুত হও।'

ফেলুদা বলল, 'এ চিঠি কি ডাকে এসেছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। লোক্যাল ডাক—বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় খামটা ফেলে দিয়েছি। দার্জিলিং-এরই পোস্টমার্ক ছিল। ঠিকানাটাও ছাপা বাংলা কথা কেটে কেটে লেখা।'

'আপনার নিজের কাউকে সন্দেহ হয়?'

'কী আর বলব বলো! কোনদিন কারুর প্রতি কোন অন্যায় বা অবিচার করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আপনার বাড়িতে যাতায়াত করেন এমন কয়েকজনের নাম করতে পারেন?'

'খুব সহজ। আমি লোকজনের সঙ্গে মিশি কমই। ডাক্তার ফণী মিত্তির আসেন অসুখ বিসুখ হলে...'

'কেমন লোক বলে মনে হয়?'

'ডাক্তার হিসেবে বোধহয় সাধারণ স্তরের। তবে তাতে আমার এসে যায় না, কারণ আমার ব্যারামও সাধারণ—সর্দি জ্বর ছাড়া আর কিছুই হয়নি দার্জিলিং এসে অবধি। তাই ভালো ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না।'

'চিকিৎসা করে পয়সা নেন?'

'তা নেন বইকি। আর আমারও তো পয়সার অভাব নেই। মিথ্যে অব্-লিগেশনে যাই কেন?'

'আর কে আসেন?'

'সম্প্রতি মিস্টার ঘোষাল বলে একটি ভদ্রলোক যাতায়াত...এই দ্যাখো!'

দরজার দিকে ফিরে দেখি একটি ফরসা, মাঝারি হাইটের, স্যুট পরা ভদ্রলোক হাসিমুখে ঘরে ঢুকছেন।

'আমার নাম শুনলুম বলে মনে হল যে!'

রাজেনবাবু বললেন, 'এই মাত্র আপনার নাম করা হয়েছে। আপনারও আমার মত পুরোনো জিনিসের শখ সেটাই এই ছেলেটিকে বলতে যাচ্ছিলুম। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—'

নমস্কার-টমস্কারের পর মিস্টার ঘোষাল—পুরো নাম অবনীমোহন ঘোষাল—রাজেনবাবুকে বললেন, 'আপনাকে আজ দোকানে দেখলুম না, তাই একবার ভাবলুম খোঁজ নিয়ে যাই।'

রাজেনবাবু বললেন, 'নাঃ—আজ শরীরটা ভালো ছিল না।'

বুঝলাম রাজেনবাবু চিঠিটার কথা মিস্টার ঘোষালকে বলতে চান না। ফেলুদা মিস্টার ঘোষাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা হাতের তেলোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে।

ঘোষাল বললেন, 'আপনি ব্যস্ত থাকলে আজ বরং...আসলে আপনার ওই তিব্বতী ঘণ্টাটা একবার দেখার ইচ্ছা ছিল।'

রাজেনবাবু বললেন, 'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। হাতের কাছেই আছে।'

রাজেনবাবু ঘণ্টা আনতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা ঘোষালকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এখানেই থাকেন?'

ভদ্রলোক দেয়াল থেকে একটা ভোজালি নামিয়ে সেটা দেখতে দেখতে বললেন, 'আমি কোন এক জায়গায় বেশি দিন থাকি না। আমার ব্যবসার জন্য প্রচুর ঘুরতে হয়। আমি কিউরিও সংগ্রহ করি।'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম 'কিউরিও' মানে

দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিস।

রাজেনবাবু ঘণ্টাটা নিয়ে এলেন। দারুণ দেখতে জিনিসটা। নিচের অংশটা রুপোর তৈরি, হাতলটা তামা আর পেতল মেশানো, আর তার উপরে লাল নীল সব পাথর বসানো।

অবনীবাবু চোখ-টোখ কুঁচকে বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টাটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

রাজেনবাবু বললেন, 'কী মনে হয়?'

'সত্যিই দাঁও মেরেছেন। একেবারে খাঁটি পুরোনো জিনিস।'

'আপনি বললে আমার আর কোনই সন্দেহ থাকে না। দোকানদার বলে এটা নাকি একেবারে খোদ লামার প্রাসাদের জিনিস।'

'কিছুই আশ্চর্য না।...আপনি বোধহয় এটা হাতছাড়া করতে রাজী নন? মানে, ভালো দাম পেলেও?'

রাজেনবাবু মিষ্টি করে হেসে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন? শখের জিনিস—ভালোবেসে কিনেছি। সেটাকে বেচে লাভ করব, বা এমন কি কেনা দরেও বেচব—এ ইচ্ছে আমার নেই।'

অবনীবাবু ঘণ্টাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজ আসি। কাল আশা করি বেরোতে পারবেন একবার।'

রাজেনবাবু বললেন, 'ইচ্ছে তো আছে।'

অবনীবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর ফেলুদা রাজেনবাবুকে বলল, 'ক'টা দিন একটু না বেরিয়ে টেরিয়ে সাবধানে থাকা উচিত নয় কি?'

'সেটাই বোধ হয় ঠিক। কিন্তু মুশকিল কী জান? সেই চিঠির ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে এটাকে ঠিক যেন সিরিয়াসলি নিতেই পারছি না। মনে হচ্ছে এটা যেন একটা ঠাট্টা—যাকে বলে প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক।'

'যদ্দিন না সেটা সম্বন্ধে ডেফিনিট হওয়া যাচ্ছে, তদ্দিন বাড়িতেই থাকুন না। আপনার নেপালি চাকরটা কদ্দিনের?'

'একেবারে গোড়া থেকেই আছে। কম্‌প্লীটলি রিলায়েব্‌ল।'

ফেলুদা এবার তিনকড়িবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আপনি কি বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন?'

'সকাল বিকেল ঘণ্টাখানেক একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসি আর কি। কিন্তু বিপদ যদি ঘটেই, আমি বুড়ো মানুষ খুব বেশি কিছু করতে পারি কি? আমার বয়স হল চৌষট্টি, রাজেনবাবুর চেয়ে এক বছর কম।'

রাজেনবাবু বললেন, 'উনি চেঞ্জে এসেছেন, ওঁকে আর বাড়িতে বন্দী করে রাখার ফন্দি করছ কেন তোমরা? আমি থাকব, আমার চাকর থাকবে, এই যথেষ্ট। তোমরা চাও তো দু'বেলা খোঁজ খবর নিয়ে যেও এখন।'

'বেশ তাই হবে।'

ফেলুদার দেখাদেখি আমিও উঠে পড়লাম।

আমরা যেখানে বসেছিলাম তার উল্টোদিকেই একটা ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেসের উপরেই একটা তাক, আর সেই তাকের উপর তিনটে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। ফেলুদা ছবিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথম ছবিটা দেখিয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'ইনি আমার স্ত্রী। বিয়ের চার বছর পরেই মারা গিয়েছিলেন।'

দ্বিতীয় ছবি, একজন আমার বয়সী ছেলের, গায়ে ভেলভেটের কোট।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'এটি কে?'

রাজেনবাবু হো হো করে হেসে বললেন! সময়ের প্রভাবে মানুষের চেহারার কী বিচিত্র পরিবর্তন ঘটতে পারে সেইটে বোঝানোর জন্য এই ছবি। উনি হচ্ছেন আমারই বাল্য সংস্করণ। বাঁকুড়া মিশনারি স্কুলে পড়তাম তখন। আমার বাবা ছিলেন বাঁকুড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট।'

সত্যি, ভারী ফুটফুটে চেহারা ছিল রাজেনবাবুর ছেলে বয়সে।

'অবিশ্যি, ছবি দেখে ভুলো না। দুরন্ত বলে ভারী বদনাম ছিল আমার। শুধু যে মাস্টারদের জ্বালিয়েছি তা নয়, ছাত্রদেরও। একবার স্পোর্টসের দিন হাণ্ড্রেড ইয়ার্ডস্-এ আমাদের বেস্ট্ রানারকে কাত করে দিয়েছিলাম ল্যাং মেরে।'

তৃতীয় ছবিটা একজন ফেলুদার বয়সী ছেলের। রাজেনবাবু বললেন সেটা তাঁর একমাত্র ছেলে প্রবীরের।

'উনি এখন কোথায়?'

রাজেনবাবু গলা খাঁক্‌রিয়ে বললেন, 'জানি না ঠিক। বহুকাল দেশ ছাড়া। প্রায় সিক্সটীন ইয়ার্স্।'

'আপনার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি নেই?'

'নাঃ।'

ফেলুদা দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'ভারি ইণ্টারেস্টিং কেস।'

আমি মনে মনে বললাম, ফেলুদা একেবারে বই-এর ডিটেকটিভের মত কথা বলছে।

বাইরেটা ছম্‌ছমে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জলাপাহাড়ের গায়ের বাড়ি-গুলোতে বাতি জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম রংগীত উপত্যকা থেকে কুয়াশা ওপর দিকে উঠছে।

রাজেনবাবু আর তিনকড়িবাবু আমাদের সঙ্গে গেট অবধি এলেন। রাজেন-বাবু গলা নামিয়ে ফেলুদাকে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তাও তোমাকে বলছি—একটু যে নারভাস বোধ করছি না তা নয়। এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে

এ-চিঠি যেন বিনামেঘে বজ্রপাত।'

ফেলুদা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। আমি এর সমাধান করবই। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

রাজেনবাবু 'গুডনাইট অ্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ' বলে চলে গেলেন।

এবার তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'তোমার—তোমাকে তুমি বলেই বলছি—তোমার অবজারভেসনের ক্ষমতা দেখে আমি সত্যিই ইম্‌প্রেসড হইচি। ডিকেট্‌টিভ গল্প আমিও অনেক পাড়চি। এই চিঠিটার ব্যাপারে আমি হয়ত তোমাকে কিছুটা সাহায্যও করতে পারি।'

'তাই নাকি?'

'এই যে টুক্‌রো টুক্‌রো ছাপা কথা কেটে চিঠিটা লেখা হয়েছে, এর থেকে কী বুঝলে বল তো?'

ফেলুদা কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, 'এক নম্বর—কথাগুলো কাটা হয়েচে খুব সম্ভব ব্লেড দিয়ে— কাঁচি দিয়ে নয়।'

'ভেরি গুড'।

'দুই নম্বর—কথাগুলো নানারকম বই থেকে নেওয়া হয়েছে—কারণ হরফ ও কাগজে তফাত রয়েছে।'

'ভেরি গুড। সেই সব বই সম্বন্ধে কোন আইডিয়া করেচ?'

'চিঠির দুটো শব্দ 'শাস্তি' আর 'প্রস্তুত'—মনে হচ্ছে খবরের কাগজ থেকে কাটা।'

'আনন্দ বাজার।'

'তাই বুঝি?'

'ইয়েস। ওই টাইপটা আনন্দ বাজারেই ব্যবহার হয়—অন্য বাংলা কাগজে নয়। আর অন্য কথাগুলোও কোনটাই পুরোন বই থেকে নেওয়া হয়নি, কারণ যে হরফে ওগুলো ছাপা, সেটা হয়েছে মাত্র পনর বিশ বছর হল।...আর যে আঠা দিয়ে আঁটকানো হয়েছে সেটা সম্বন্ধে কোন ধারণা করেছ?'

'গন্ধটা গ্রিপেক্স আঠার মত।'

'চমৎকার ধরেছ।'

'কিন্তু আপনিও তো ধরার ব্যাপারে কম যান না দেখছি।'

তিনকড়িবাবু হেসে বললেন, 'কিন্তু তোমার বয়সে আমি ডিটেক্‌টিভ কথাটার মানে জানতুম কিনা সন্দেহ!'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদা বলল, 'রাজেনবাবুর মিস্ট্রি সল্‌ভ করতে পারব কিনা জানি না—কিন্তু এই সূত্রে তিনকড়িবাবুর সঙ্গে আলাপটা বেশ ফাউ পাওয়া গেল।'

আমি বললাম, 'তাহলে উনিই ব্যাপারটা তদন্ত করুন না। তুমি আর মিথ্যে

মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

'আহা—বাংলা হরফের ব্যাপারটা জানা আছে বলে কি সবই জানবেন নাকি?'

ফেলুদার কথাটা শুনে ভালোই লাগল। ওর মত বুদ্ধি আশা করি তিনকড়িবাবুর নেই। মাঝে মাঝে ফোড়ন দিলে আপত্তি নেই, কিন্তু আসল কাজটা যেন ফেলুদাই করে।

'কাকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে ফেলুদা?'

'অপরা—'

কথাটার মাঝখানেই ফেলুদা থেমে গেল। তার দৃষ্টি দেখলাম একজন লোককে ফলো করে পিছন দিকে ঘুরছে।

'লোকটাকে দেখলি?'

'কই, না তো। মুখ দেখিনি তো।'

'ল্যাম্পের আলোটা পড়ল, আর ঠিক মনে হল'—ফেলুদা আবার থেমে গেল।

'কি মনে হল ফেলুদা?'

'নাঃ, বোধহয় চোখের ভুল। চ' পা চালিয়ে চ, খিদে পেয়েছে।'

ফেলুদা হল আমার মাসতুতো দাদা। ও আর আমি আমার বাবার সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে এসে শহরের নীচের দিকে স্যানাটোরিয়ামে উঠেছি। স্যানাটোরিয়াম ভর্তি বাঙালি; বাবা তাদেরই মধ্যে থেকে সমবয়সী বন্ধু জুটিয়ে নিয়ে তাসটাস খেলে গল্পটল্প করে সময় কাটাচ্ছেন। আমি আর ফেলুদা কোথায় যাই, কী করি, তাই নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না।

আজ সকালে আমার ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়েছে। উঠে দেখি বাবা রয়েছেন, কিন্তু ফেলুদার বিছানা খালি। কী ব্যাপার?

বাবাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'ও এসে অবধি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেনি। আজ দিনটা পরিস্কার দেখে বোধহয় আগেভাগে বেরিয়েছে।'

আমি কিন্তু মনে মনে আন্দাজ করছিলুম যে ফেলুদা তদন্তের কাজ শুরু করে দিয়েছে, আর সেই কাজেই বেরিয়েছে। কথাটা ভেবে ভারী রাগ হল। আমাকে বাদ দিয়ে কিছু করার কথা তো ফেলুদার নয়।

যাই হোক্, আমিও মুখটুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

লেডেন লা রোডে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডটার কাছাকাছি এসে ফেলুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি বললাম, 'বারে, তুমি আমায় ফেলে বেরিয়েছ কেন?'

'শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল—তাই ডাক্তার দেখাতে গেস্‌লাম।'

'ফণী ডাক্তার?'

'তোরও একটু একটু বুদ্ধি খুলেছে দেখছি।'

'দেখালে?'

'চারটাকা ভিজিট নিল, আর একটা ওষুধ লিখে দিল।'

'ভালো ডাক্তার?'

'অসুখ নেই তাও পরীক্ষা করে ওষুধ দিচ্ছে—কেমন ডাক্তার বুঝে দ্যাখ; তারপর বাড়ির যা চেহারা দেখলাম, তাতে পসার যে খুব বেশি তাও মনে হয় না।'

'তাহলে উনি কখনই চিঠিটা লেখেন নি।'

'কেন?'

'গরীব লোকের অত সাহস হয়?'

'তা টাকার দরকার হলে হয় বই কি।'

'কিন্তু চিঠিতে তো টাকা চায় নি।'

'ওই ভাবে খোলাখুলি বুঝি কেউ টাকা চায়?'

'তবে?'

'রাজেনবাবুর অবস্থা কাল কি রকম দেখলি বল তো?'

'কেমন যেন ভীতু ভীতু।'

'ভয় পেয়ে মনের অসুখ হতে পারে সেটা জানিস?'

'তা তো পারেই।'

'আর মনের অসুখ থেকে শরীরের অসুখ?'

'তাও হয় বুঝি?'

'ইয়েস্। আর শরীরের অসুখ হলে ডাক্তার ডাকতে হবে সেটা আশা করি তোর মত ক্যাবলারও জানা আছে।'

ফেলুদার বুদ্ধি দেখে আমার প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। অবিশ্যি ফণী ডাক্তার যদি সত্যিই এত সব ভেবে-টেবে চিঠিটা লিখে থাকে, তাহলে ওরও বুদ্ধি সাংঘাতিক বলতে হবে।

ম্যালের মুখে ফোয়ারার কাছাকাছি যখন এসেছি তখন ফেলুদা বলল, 'কিউরিও সম্বন্ধে একটা কিউরিয়সিটি বোধ করছি।'

'কিউরিও'র মানে আগেই শিখেছিলাম, আর কিউরিয়সিটি মানে যে কৌতূহল সেটা ইস্কুলেই শিখেছি।

আমাদের ঠিক পাশেই 'নেপাল কিউরিও শপ'। রাজেনবাবু আর অবনীবাবু এখানেই আসেন।

ফেলুদা সটান দোকানের ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

দোকানদারের গায়ে ছাই রং-এর কোট, গলায় মাফলার আর মাথায় সোনালি

কাজ করা কালো টুপি। ফেলুদাকে দেখে হাসি হাসি মুখ করে এগিয়ে এল। দোকানের ভেতরটা পুরোনো জিনিসপত্র গিজগিজ করছে, আলোও বেশি নেই, আর গন্ধটাও যেন সেকেলে।

ফেলুদা এদিক ওদিক দেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'ভালো পুরোনো থাংকা আছে?'

'এই পাশের ঘরে আসুন। ভালো জিনিস তো বিক্রী হয়ে গেছে সব। তবে নতুন মাল আবার কিছু আসছে।'

পাশের ঘরে যাবার সময় আমি ফেলুদার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, 'থাংকা কী জিনিস?'

ফেলুদা দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, 'দেখতেই তো পাবি।'

পাশের ঘরটা আরো ছোট—যাকে বলে একেবারে ঘুপ্‌চি।

দোকানদার দেয়ালে ঝোলানো সিল্কের উপর আঁকা একটা বুদ্ধের ছবি দেখিয়ে বলল, 'এই একটাই ভালো জিনিস আছে—তবে একটু ড্যামেজড্‌।'

একেই বলে থাংকা? এ জিনিস তো রাজেনবাবুর বাড়িতে অনেক আছে।

ফেলুদা ভীষণ বিজ্ঞের মত থাংকাটার গায়ের উপর চোখ ঠেকিয়ে উপর থেকে নীচে অবধি প্রায় তিন মিনিট ধরে দেখে বলল, 'এটার বয়স তো সত্তর বছরের বেশি বলে মনে হচ্ছে না। আমি অন্তত তিনশ বছরের পুরনো জিনিস চাইছি।'

দোকানদার বলল, 'আমরা আজ বিকালে কিন্তু এক লট মাল পাচ্ছি। তার মধ্যে ভালো থাংকা পাবেন।'

'আজই পাচ্ছেন?'

'আজই।'

'এ খবরটা তাহলে রাজেনবাবুকে জানাতে হয়।'

'মিস্টার মজুমদার? ওনার তো জানা আছে। রেগুলার খদ্দের যে দু-তিনজন আছেন, তাঁরা সকলেই নতুন মাল দেখতে বিকালে আসছেন।'

'অবনীবাবুও খবরটা পেয়ে গেছেন? মিস্টার ঘোষল?'

'জরুর!'

'আর বড় খদ্দের কে আছে আপনাদের?'

'আর আছেন মিস্টার গিলমোর—চা বাগানের ম্যানেজার। সপ্তাহে দুদিন বাগান থেকে আসেন। আর মিস্টার নাওলাখা। উনি এখন সিকিমে।'

'বাঙালী আর কেউ নেই?'

'না স্যার।'

'আচ্ছা দেখি, বিকেলে যদি একবার ঢুঁ মারতে পারি।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোপ্‌সে, তুই একটা মুখোশ চাস?'

তোপ্‌সে যদিও আমার আসল ডাকনাম নয়, তবু ফেলুদা তপেশ থেকে ওই নামটাই করে নিয়েছে।

মুখোশের লোভ কি সামলানো যায়? ফেলুদা নিজেই একটা বাছাই করে আমাকে কিনে দিয়ে বলল, 'এইটেই সবচেয়ে হরেনডাস্—কী বলিস?'

ফেলুদা বলে হরেনডাস্ বলে আসলে কোন কথা নেই। 'ট্রিমেনডাস্' মানে সাংঘাতিক, আর 'হরিব্‌ল' মানে বীভৎস। এই দুটো একসঙ্গে বোঝাতে নাকি কেউ কেউ হরেনডাস্ ব্যবহার করে। মুখোশটা সম্বন্ধে যে ওই কথাটা দারুণ খাটে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দোকান থেকে বেরিয়ে ফেলুদা আমার হাত ধরে কী একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। এবারও দেখি ফেলুদা একজন লোকের দিকে দেখছে। বোধ হয় কাল রাতে যাকে দেখেছিল সেই লোকটাই। বয়স আমার বাবার মত, মানে চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, গায়ের রং ফরসা, চোখে কালো চশমা। যে সুটটা পরে আছে সেটা দেখে মনে হয় খুব দামি। ভদ্রলোক ম্যালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরাচ্ছেন। আমার দেখেই কেমন জানি চেনা চেনা মনে হল, কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ফেলুদা সোজা লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে ভীষণ সাহেবি কায়দার উচ্চারণে বলল, 'এক্সকিউজ মী, আপনি মিস্‌ঠা ছ্যাঠার্ঝি?'

ভদ্রলোকও একটু গম্ভীর গলায় পাইপ কামড়ে বলল, 'নো, আই অ্যাম নঠ্।'

ফেলুদা খুবই অবাক হবার ভান করে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ—আপনি সেণ্ট্রাল হোটেলে উঠেছেন না?'

ভদ্রলোক একটু হেসে অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'না। মাউন্ট এভারেস্ট্। অ্যাণ্ড আই ডোণ্ট হ্যাভ এ টুইন ব্রাদার।'

এই বলে ভদ্রলোক গটগটিয়ে অবজারভেটরি হিলের দিকে চলে গেলেন। যাবার সময় লক্ষ্য করলাম যে তার কাছে একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেট, আর কাগজটার গায়ে লেখা 'নেপাল কিউরিও শপ'।

আমি চাপা গলায় বললাম, 'ফেলুদা, উনিও কি মুখোশ কিনেছেন নাকি?'

'তা কিনতে পারে। মুখোশটা তো আর তোর আমার একচেটিয়া নয়।...চ', কেভেন্‌টার্সে গিয়ে একটু কফি খাওয়া যাক।'

কেভেন্‌টার্সের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'লোকটাকে চিনলি?'

আমি বললাম, 'তুমিই চিনলে না, আর আমি কি করে চিনি বল। তবে চেনা চেনা লাগছিল।'

'আমি চিনলাম না?'

'বা রে। কোথায় চিনলে? ভুল নাম বললে যে?'

'তোর যদি এতটুকু সেন্স থাকে। ভুল নাম বলেছি হোটেলের নামটা বের করার জন্য, সেটাও বুঝলি না? লোকটার আসল নাম কী জানিস?'

'কী?'

'প্রবীর মজুমদার।'

'ও হো! হ্যাঁ ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ! রাজেনবাবুর ছেলে, তাই না? যার ছবি রয়েছে তাকের উপর? অবিশ্যি বয়সটা এখন অনেক বেড়ে গেছে তো।'

'শুধু যে চেহারায় মিল তা নয়—গালের আঁচিলটা নিশ্চয় তুইও লক্ষ্য করেছিস—আসল কথাটা হচ্ছে, ভদ্রলোকের জামা কাপড় সব বিলিতি। সুট লন্ডনের, টাই প্যারিসের, জুতো ইটালিয়ান, এমন কি রুমালটা পর্যন্ত বিলিতি। সদ্য বিলেত ফেরত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু ওঁর ছেলে এখানে রয়েছে সে খবর রাজেনবাবু জানেন না?'

'বাপ যে এখানে রয়েছে সেটা ছেলে জানে কিনা সেটাও খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার।'

রহস্য ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, এই কথাটা ভাবতে ভাবতে কেভেন্টারের দোকানে পেঁছিলাম।

দোকানের ছাতে যে বসার জায়গাটা আছে, সেটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। চারিদিকে দার্জিলিং শহরটা, আর ওই নীচে বাজারটা দারুণ ভালো দেখায়।

ছাতে উঠে দেখি কোণের টেবিলটায় চুরুট হাতে তিনকড়িবাবু বসে কফি খাচ্ছেন। ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে আমাদের তাঁর টেবিলে গিয়ে বসতে বললেন।

আমরা তিনকড়িবাবুর দুদিকে দুটো টিনের চেয়ারে বসলাম।

তিনকড়িবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'ডিটেক্‌শনে তোমার পারদর্শিতা দেখে খুশি হয়ে আমি তোমাদের দুজনকে দুটো হট্‌ চকলেট খাওয়াব—আপত্তি আছে?'

হট চকলেটের নাম শুনে আমার জিভে জল এসে গেল।

তিনকড়িবাবু তুড়ি মেরে একটা বেয়ারাকে ডাকলেন।

বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে গেলে পর তিনকড়িবাবু কোটের পকেট থেকে একটা বই বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। একটা এক্সট্রা কপি ছিল—আমার লেটেস্ট্‌ বই। তোমায় দিলুম।'

বইয়ের মলাটটা দেখে ফেলুদার মুখটা মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

'আপনার বই মানে? আপনার লেখা? আপনিই 'গুপ্তচর' নাম নিয়ে লেখেন?'

'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। রহস্য উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

ফেলুদা হাসতে হাসতে বলল, 'প্রবীর মজুমদার যে চিঠি লিখে থাকতে পারেন সেটা আপনার খেয়াল হয়নি তো?'

'এগজ্যাক্টলি। কিন্তু...'

তিনকড়িবাবু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বেয়ারা হট চকলেট এনে টেবিলে রাখতে তিনকড়িবাবু যেন একটু চাগিয়ে উঠলেন। ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'ফণী মিত্তিরকে কেমন দেখলে?'

ফেলুদা একটু যেন হকচকিয়ে গেল।

'সে কি, আপনি কী করে জানলেন আমি ওখানে গেস্‌লাম?'

'তুমি যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই আমিও গেস্‌লাম।'

'আমাকে রাস্তায় দেখেছিলেন বুঝি?'

'না।'

'তবে?'

ডাক্তারের ঘরের মেঝেতে একটি মরা সিগারেট দেখে জিজ্ঞেস করলাম কে খেয়েছে। ডাক্তার ধূমপান করেন না। ফণীবাবু তখন বর্ণনা দিলেন। তাতে তোমার কথা মনে হল, যদিও তোমাকে আমি সিগারেট খেতে দেখিনি। কিন্তু এখন তোমার আঙুলের গায়ে হল্‌দে রং দেখে বুঝেছি তুমি খাও।'

ফেলুদা তিনকড়িবাবুর বুদ্ধির তারিফ করে বলল, 'আপনারও কি ফণী মিত্তিরকে সন্দেহ হয়েছিল নাকি?'

'তা হবে না? লোকটাকে দেখলে অভক্তি হয় না কি?'

'তা হয়। রাজেনবাবু যে কেন ওকে আমল দেন জানি না।'

'তাও জান না বুঝি? দার্জিলিংএ আসার কিছুদিনের মধ্যে রাজেনবাবুর ধর্মকর্মের দিকে মন যায়। তখন ফণীবাবুই তাকে এক গুরুর সন্ধান দিয়েছিলেন। একই গুরুর শিষ্য হিসেবে ওদের যে প্রায় ভাই ভাই সম্পর্ক হে!'

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ফণী মিত্তিরের সঙ্গে কথা বলে কী বুঝলেন?'

'কথা তো ছুতো। আসলে বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলুম।'

'বাংলা উপন্যাস আছে কিনা দেখার জন্য?'

'ঠিক বলেছ।'

'আমিও দেখেছি, প্রায় নেই বললেই চলে। আর যা আছে তাও আদ্যিকালের।'

'ঠিক।'

তিনকড়িবাবু আধ-বোজা চোখে অল্প হাসি হেসে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

ফেলুদার অবাক ভাব আরো যেন বেড়ে গেল।

'সেকি! আপনার সব ক'টা রহস্য উপন্যাস যে আমার পড়া! বাংলায় আপনার ছাড়া আর কারুর রহস্য উপন্যাস আমার ভালো লাগে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ! ব্যাপারটা কী জান? এখানেও একটা প্লট মাথায় নিয়ে লেখার জন্যই এসেছিলাম। এখন দেখছি বাস্তব জীবনের রহস্য নিয়েই মাথা ঘামিয়ে ছুটিটা ফুরিয়ে গেল।'

'আমার সত্যিই দারুণ লাক্—আপনার সঙ্গে এভাবে আলাপ হয়ে গেল।'

'দুঃখের বিষয় আমার ছুটির মেয়াদ সত্যিই ফুরিয়ে এসেছে। কাল সকালে চলে যাচ্ছি আমি। আশা করছি যাবার আগে তোমাদের আরো কিছুটা হেল্প করে দিয়ে যেতে পারব।'

ফেলুদা এবার তার এক্সাইটিং খবরটা তিনকড়িবাবুকে দিয়ে দিল।

'রাজেনবাবুর ছেলেকে আজ দেখলাম।'

'বল কী হে?'

'এই দশ মিনিট আগে।'

'তুমি ঠিক বলছ? চিনতে পেরেছ তো ঠিক?'

'চোদ্দ আনা সিওর। মাউণ্ট এভারেস্ট্ হোটেলে গিয়ে খোঁজ করলে বাকি দু-আনাও পুরে যাবে বোধ হয়।'

তিনকড়িবাবু হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'রাজেনবাবুর মুখে তার ছেলের কথা শুনেছ?'

'কাল যা বললেন, তার বেশি শুনিনি।'

'আমি শুনেছি অনেক কথা। ছেলেটি অল্পবয়সে বখে গিয়েছিল। বাপের সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করে ধরা পড়েছিল। রাজেনবাবু তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। ছেলেটি গিয়েওছিল তাই। ২৪ বছর বয়স তখন তার। একেবারে নিখোঁজ। রাজেনবাবু অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন, কারণ পরে তাঁর অনুতাপ হয়। কিন্তু ছেলে কোন খোঁজখবর নেয়নি বা দেয়নি। বিলেতে তাকে দেখেছিলেন রাজেনবাবুরই এক বন্ধু। তাও সে দশ-বারো বছর আগে।'

'রাজেনবাবু তাহলে জানেন না যে তাঁর ছেলে এখানে আছে?'

'নিশ্চয়ই না। আমার মনে হয় ওঁকে না জানানই ভালো। একে এই চিঠির শক্, তার উপর...'

তিনকড়িবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন,

'তবে ফণী ডাক্তার অন্যের বাড়ির বই থেকেও কথা কেটে চিঠি তৈরি করতে পারে।'

'তা পারে। তবে লোকটাকে দেখে ভারী কুঁড়ে বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে অতটা কাঠখড় পোড়াবে, সেটা কেন জানি বিশ্বাস হয় না।'

ফেলুদা এবার বলল, 'অবনী ঘোষাল লোকটা সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?'

'বিশেষ সুবিধের লোক নয় বলেই আমার বিশ্বাস। ভারী ওপর-চালাক। আর ওসব প্রাচীন শিল্প-টিল্প কিছু না। ওর আসল লোভ হচ্ছে টাকার। এখন খরচ করে জিনিস কিনেছে, পরে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে পাঁচগুণ প্রফিট করবে।'

'ওর পক্ষে এই হুমকি চিঠি দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয় কি?'

'সেটা এখনও তলিয়ে দেখিনি।'

'আমি একটা কারণ আবিষ্কার করেছি।'

আমি অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলাম। ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'কী কারণ?'

ফেলুদা গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'যে দোকান থেকে ওঁরা জিনিস কেনেন, সেখানে কিছু ভালো নতুন মাল আজ বিকেলে আসছে।'

এবার তিনকড়িবাবুর চোখও জ্বলজ্বল করে উঠল।

'বুঝেছি। হুমকি চিঠি পেয়ে রাজেন মজুমদার ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন আর সেই ফাঁকতালে অবনী ঘোষাল দোকানে গিয়ে সব লুটেপুটে নিলেন।'

'এগজ্যাক্টলি!'

তিনকড়িবাবু চকলেটের পয়সা দিয়ে উঠে পড়লেন। আমরা দুজনেও উঠলাম।

উৎসাহে আর উত্তেজনায় আমার বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছিল।

অবনী ঘোষাল, প্রবীর মজুমদার আর ফণী মিত্তির—তিনজনকেই তাহলে সন্দেহ করার কারণ আছে!

পনর মিনিটের মধ্যেই মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেলে গিয়ে ফেলুদা সেই খবরটা জেনে নিল। প্রবীর মজুমদার বলে একজন ভদ্রলোক সেই হোটেলের ষোল নম্বর ঘরে পাঁচদিন হল এসে রয়েছেন।

বিকেলের দিকে রাজেনবাবুর বাড়িতে যাবার কথা ফেলুদা বলেছিল, কিন্তু

দুপুর থেকে মেঘলা করে চারটে নাগাদ তেড়ে বৃষ্টি নামল। আকাশের চেহারা দেখে মনে হল বৃষ্টি সহজে থামবে না।

ফেলুদা সারাটা সন্ধে খাতা পেনসিল নিয়ে কীসব যেন হিসেব করল। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল কী লিখছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। শেষটায় আমি তিনকড়িবাবুর বইটা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলাম। দারুণ থ্রিলিং গল্প। পড়তে পড়তে রাজেনবাবুর চিঠির ব্যাপারটা মন থেকে প্রায় মুছেই গেল।

আটটা নাগাত বৃষ্টি থামল। কিন্তু তখন এত শীত যে বাবা আমাদের বেরোতে দিলেন না।

পরদিন ভোরবেলা ফেলুদার ধাক্কার চোটে ঘুম ভাঙল। 'ওঠ্, ওঠ্—এই তোপ্সে—ওঠ্!'

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। ফেলুদা কানের কাছে মুখ এনে দাঁতে দাঁত চেপে এক নিশ্বাসে বলে গেল, 'রাজেনবাবুর নেপালি চাকরটা এসেছিল। বলল বাবু এখুনি যেতে বলেছেন—বিশেষ দরকার। তুই যদি যেতে চাস তো—'

'সে আর বলতে!'

পনের মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে রাজেনবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেখি তিনি ফ্যাকাশে মুখ করে খাটে শুয়ে আছেন। ফণী ডাক্তার তাঁর নাড়ি টিপে খাটের পাশটায় বসে, আর তিনকড়িবাবু এই শীতের মধ্যেও একটা হাতপাখা নিয়ে মাথার পিছনটায় দাঁড়িয়ে হাওয়া করছেন।

ফণীবাবুর নাড়ি দেখা হলে পর রাজেনবাবু যেন বেশ কষ্ট করেই জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বললেন, 'কাল রাত্রে—বারোটার কিছু পরে ঘুমটা ভাঙতে বিদ্যুতের আলোয় আমার মুখের ঠিক সামনে আই স এ মাস্ক্ড্ ফেস!'

মাস্ক্ড্ ফেস্! মুখোশ পরা মুখ!

রাজেনবাবু দম নিলেন। ফণী মিত্তির দেখলাম একটা প্রেস্ক্রিপ্শন লিখছেন।

রাজেনবাবু বললেন, 'দেখে এমন হল যে চীৎকারও বেরোল না গলা দিয়ে। রাতটা যে কী ভাবে কেটেছে—তা বলতে পারি না।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার জিনিসপত্তর কিছু চুরি যায়নি তো?'

রাজেনবাবু বললেন, 'নাঃ, তবে আমার বিশ্বাস, আমার বালিশের তলা থেকে আমার চাবির গোছাটা নিতেই সে আমার উপর ঝুঁকেছিল। ঘুম ভেঙে যাওয়াতে জানালা দিয়ে লাফিয়ে...ওঃ—হরিবল্, হরিবল্!'

ফণী ডাক্তার বললেন, 'আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। আপনার কম্প্লীট রেস্টের দরকার।'

ফণীবাবু উঠে পড়লেন!

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'ফণীবাবু কাল রাত্রে রুগী দেখতে গেস্‌লেন বুঝি? কোটের পিছনে কাদার ছিটে লাগল কী করে?'

ফণীবাবু তেমন কিছু না ঘাবড়িয়ে বললেন, 'ডাক্তারের লাইফ তো জানেনই—আর্তের সেবায় যখন জীবনটাই উৎসর্গ করিচি, তখন ডাক যখনই আসুক না কেন, বেরোতেই হবে। সে ঝড়ই হোক, আর বৃষ্টিই হোক, আর বরফই পড়ুক।'

ফণীবাবু তার পাওনা টাকা নিয়ে চলে গেলেন। রাজেনবাবু এবার সোজা হয়ে উঠে বসে বললেন, 'তোমরা আসাতে অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেস্‌লুম, জান। এখন বোধহয় বৈঠকখানায় গিয়ে একটু বসা চলতে পারে।'

ফেলুদা আর তিনকড়িবাবু হাত ধরাধরি করে রাজেনবাবুকে বৈঠকখানায় এনে বসালেন।

তিনকড়িবাবু বললেন, 'স্টেশনে ফোন করেছিলুম যদি যাওয়াটা দুদিন পেছনো যায়। রহস্যের সমাধান না করে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু ওরা বললে এ-টিকিট ক্যানসেল করলে দশদিনের আগে বুকিং পাওয়া যাবে না।'

এটা শুনে আমার ভালোই লাগল। আমি চাইছিলাম ফেলুদা একাই ডিটেক্‌টিভের কাজটা করুক। তিনকড়িবাবু যেন ফেলুদার অনেকটা কাজ আগে আগেই করে দিচ্ছিলেন।

রাজেনবাবু বললেন, 'আমার চাকরটার পাহারা দেবার কথা ছিল, কিন্তু আমি নিজেই কাল দশটার সময় তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। ওর বাড়িতে খুব অসুখ। বুড়ো বাপ আছে, তার এখন-তখন অবস্থা।'

ফেলুদা বলল, 'মাস্কটা কেমন ছিল মনে আছে?'

রাজেনবাবু বললেন, 'খুবই সাধারণ নেপালি মুখোশ, দার্জিলিং শহরেই অন্তত আরো তিন চার শ' খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। আমার এই ঘরেই তো আরো পাঁচখানা রয়েছে—ওই যে, দ্যাখোনা।'

রাজেনবাবু যে মুখোশটার দিকে আঙুল দেখালেন, ঠিক সেই জিনিসটা কাল ফেলুদা আমার জন্য কিনে দিয়েছে।

তিনকড়িবাবু এতক্ষণ বেশি কথা বলেন নি, এবার বললেন, 'আমার মতে এবার বোধহয় পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত। একটা প্রোটেক্‌শনেরও তো দরকার। কাল যা ঘটেছে তার পরে তো আর ব্যাপারটাকে ঠাট্টা বলে নেওয়া চলে না। ফেলুবাবু, তুমি তোমার নিজের ইচ্ছে মত তদন্ত চালিয়ে যেতে পার, তাতে তোমায় কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আমি সব দিক বিবেচনা করে বলছি, এবার পুলিশের সাহায্য নেওয়া দরকার। আমি বরং যাই, গিয়ে

একটা ডায়রি করে আসি। প্রাণের ভয় আছে বলে মনে হয় না, তবে রাজেন-বাবু, আপনার ঘণ্টাটা একটু সাবধানে রাখবেন।'

আমরা যখন উঠছি, তখন ফেলুদা রাজেনবাবুকে বলল, 'তিনকড়িবাবু তো চলে যাচ্ছেন। তার মানে আপনার একটি ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি আজ রাতটা ওঘরে এসে থাকি, তাহলে আপনার কোন আপত্তি আছে কী?'

রাজেনবাবু বললেন, 'মোটেই না। আপত্তি কী? তুমি তো হলে আমার প্রায় আত্মীয়েরই মত। আর সত্যি বলতে কি, যত বুড়ো হচ্ছি তত যেন সাহসটা কমে আসছে। ছেলেবয়সে দুরন্ত হলে নাকি বুড়ো বয়সে মানুষ ম্যাদা মেরে যায়।'

তিনকড়িবাবুকে ফেলুদা বলল স্টেশনে ওঁকে 'সী-অফ্' করতে যাবে।

ফেরার পথে যখন নেপাল কিউরিও শপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন আমাদের দুজনেরই চোখ চলে গেল দোকানের ভিতর।

দেখলাম দুজন ভদ্রলোক দোকানের ভিতর দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র দেখছে আর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। দেখে মনে হয় দুজনের অনেক দিনের আলাপ।

একজন অবনী ঘোষাল, আর একজন প্রবীর মজুমদার।

আমি ফেলুদার দিকে চাইলাম।

তার মুখের ভাব দেখে মনে হল না সে কোন আশ্চর্য জিনিস দেখেছে।

সাড়ে দশটার সময় স্টেশনে গেলাম তিনকড়িবাবুকে গুড বাই করতে। উনি এলেন আমাদেরও পাঁচ মিনিট পরে।

'চড়াই উঠে উঠে পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে তাই আস্তে হাঁটতে হল।' সত্যিই ভদ্রলোক একটু খোঁড়াচ্ছিলেন।

নীলরঙের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠে তিনকড়িবাবু তাঁর অ্যাটাচিকেস খুলে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট ফেলুদাকে দিলেন।

'এটা কিনতেও একটু সময় লাগল। রাজেনবাবু তো আর কিউরিওর দোকানে যেতে পারলেন না, অথচ কাল সত্যিই অনেক ভালো জিনিস এসেছে। তার থেকে একটি সামান্য জিনিস বাছাই করে ওঁর জন্যে এনেছি। তোমরা আমার নাম করে শুভেচ্ছা জানিয়ে ওঁকে দিয়ে দিও।'

ফেলুদা প্যাকেটটা নিয়ে বলল, 'আপনার ঠিকানা দিয়ে গেলেন না? মিস্ট্রিটা সল্‌ভ করে আপনাকে জানিয়ে দেবো ভাবছিলাম যে।'

তিনকড়িবাবু বললেন, 'আমার প্রকাশকের ঠিকানাটা আমার বইয়েতেই পাবে—তার কেয়ারে লিখলেই চিঠি আমার কাছে পৌঁছে যাবে।...গুডলাক্!'

ট্রেন ছেড়ে দিল। ফেলুদা আমাকে বলল, 'লোকটা বিদেশে জন্মালে দারুণ নাম আর পয়সা করত। পর পর এতগুলো ভালো রহস্য উপন্যাস খুব কম লোকেই লিখেছে।'

সারাদিন ধরে ফেলুদা রাজেনবাবুর ব্যাপারটা নিয়ে নানান জায়গায় ঘোরা-ফেরা করল। আমি অনেক করে বলতেও আমাকে সঙ্গে নিল না। সন্ধেবেলা যখন রাজেনবাবুর বাড়ি যাচ্ছি তখন ফেলুদাকে বললাম, 'কোথায় কোথায় গেলে অন্তত সেইটে বলবে তো!'

ফেলুদা বলল, 'দুবার মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল, একবার ফণী মিত্তিরের বাড়ি, একবার নেপাল কিওরিও শপ, একবার লাইব্রেরি, আর আরো কয়েকটা জায়গা।'

'ও।'

'আর কিছু জানতে চাস?'

'অপরাধী কে বুঝতে পেরেছ?'

'এখনও বলার সময় আসেনি।'

'কাউকে সন্দেহ করেছ?'

'ভালো ডিটেক্‌টিভ হলে প্রত্যেককেই সন্দেহ করতে হয়।'

'প্রত্যেককে মানে?'

'এই ধর—তুই।'

'আমি?'

'যার কাছে এই মুখোশ আছে, সে-ই সন্দেহের পাত্র, সে যে-লোকই হোক।'

'তাহলে তুমিই বা বাদ যাবে কেন?'

'বেশি বাজে বকিস্‌নি।'

'বারে—তুমি যে রাজেনবাবুকে আগে চিনতে সে কথা তো গোড়ায় বলনি। তার মানে সত্য গোপন করেছ। আর আমার মুখোশও ইচ্ছে করলে তুমিও ব্যবহার করতে পার—হাতের কাছেই থাকে।'

'শাটাপ্‌, শাটাপ্‌!'

রাজেনবাবুকে এ বেলা দেখে তবু অনেকটা ভালো লাগল। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'দুপুরের দিকটা বেশ ভালো বোধ করছিলাম। যত সন্ধে হয়ে আসছে ততই যেন কেমন অসোয়াস্তি লাগছে।'

ফেলুদা তিনকড়িবাবুর দেওয়া প্যাকেটটা রাজেনবাবুকে দিল। সেটা খুলে তার থেকে একটা চমৎকার বুদ্ধের মাথা বের হল। সেটা দেখে রাজেন-বাবুর চোখ ছলছল করে এল। ধরা গলায় বললেন, 'খাশা জিনিস, খাশা জিনিস!'

ফেলুদা বলল, 'পুলিশ থেকে লোক এসেছিল?'

'আর বোল না। এসে বত্রিশ রকম জেরা করলে। কদ্দুর কী হদিস পাবে জানি না, তবে আজ থেকে বাড়িটা ওয়াচ করার জন্য লোক থাকবে, সেই যা নিশ্চিন্তি। সত্যি বলতে কি, তোমরা হয়ত না এলেও চলত।'

ফেলুদা বলল, 'স্যানাটোরিয়ামে বড্ড গোলমাল। এখানে হয়ত চুপচাপ আপনার কেসটা নিয়ে একটু ভাবতে পারব।'

রাজেনবাবু হেসে বললেন, 'আর তাছাড়া আমার চাকরটা খুব ভালো রান্না করে। আজ মুরগীর মাংস রাঁধতে বলেছি। স্যানাটোরিয়ামে অমনটি খেতে পাবে না।'

রাজেনবাবু আমাদের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

ফেলুদা সটান খাটের উপর শুয়ে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাগ করে পর পর পাঁচটা ধোঁয়ার রিং ছাড়ল।

তারপর আধবোজা চোখে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ফণী মিত্তির কাল সত্যিই রুগী দেখতে গিয়েছিলেন। কার্টরোডে একজন ধনী পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী। আমি খোঁজ নিয়েছি। সাড়ে এগারটা থেকে সাড়ে বারোটা অবধি ওখানে ছিলেন।'

'তাহলে ফণী মিত্তির অপরাধী নন?'

ফেলুদা আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'প্রবীর মজুমদার ষোল বচ্ছর ইংলণ্ডে থেকে বাংলা প্রায় ভুলেই গেছেন।'

'তাহলে ওই চিঠি ওর পক্ষে লেখা সম্ভবই নয়?'

'আর ওর টাকার কোন অভাবই নেই। তাছাড়া দার্জিলিং-এ এসেও লেবঙে ঘোড়দৌড়ের বাজিতে উনি অনেক টাকা করেছেন।'

আমি দম আটকে বসে রইলাম। ফেলুদার আরো কিছু বলার আছে সেটা বুঝতে পারছিলাম।

আধখাওয়া জ্বলন্ত সিগারেটটা ক্যারমের ঘুঁটি মারার মত করে প্রায় দশ-হাত দূরের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আজ চা বাগানের গিলমোর সাহেব দার্জিলিং-এ এসেছে। প্লান্টারস ক্লাবে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। লামার প্রাসাদের আসল ঘণ্টা একটাই আছে, আর সেটা গিলমোরের কাছে। রাজেনবাবুরটা নকল। অবনী ঘোষাল সেটা জানে।'

'তাহলে রাজেনবাবুর ঘণ্টাটা তেমন মূল্যবান নয়?'

'না।...আর অবনী ঘোষাল কাল রাত্রে একটা পার্টিতে প্রবীর মজুমদারের সঙ্গে রাত ন'টা থেকে ভোর তিনটে অবধি মাতলামি করেছে।'

'ও। আর মুখোশ পরা লোকটা এসেছিল বারোটার কিছু পরেই।'

'হ্যাঁ।'

আমার বুকের ভেতরটা কেমন খালি খালি লাগছিল। বললাম, 'তাহলে?'

ফেলুদা কিছু না বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে খাট থেকে উঠে পড়ল। ওর ভুরু দুটো যে এতটা কুঁচকোতে পারে তা আমার জানাই ছিল না।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভেবে ফেলুদা বৈঠক-

খানার দিকে চলে গেল। যাবার সময় বলল, 'একটু একা থাকতে চাই। ডিস্‌টার্ব করিস না।'

কী আর করি। এবার ওর জায়গায় আমি বিছানায় শুলাম।

সন্ধে হয়ে আসছে। ঘরের বাতিটা আর জ্বালাতে ইচ্ছে করল না। খোলা জানালা দিয়ে অবজারভেটরি হিলের দিকটায় অন্যান্য বাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। বিকেলে ম্যাল থেকে একটা গোলমালের শব্দ পাওয়া যায়। এখন সেটা মিলিয়ে আসছে। একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলাম। দূর থেকে কাছে এসে আবার মিলিয়ে গেল।

সময় চলে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে শহরের আলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। বোধহয় কুয়াশা হচ্ছে। ঘরের ভিতরটা এখন আরো অন্ধকার। একটা ঘুম ঘুম ভাব আসছে মনে হল।

চোখের পাতা দুটো কাছাকাছি এসে গেছে, এমন সময় মনে হল কে যেন ঘরে ঢুকেছে।

মনে হতেই এমন ভয় হল যে, যেদিক থেকে লোকটা আসছে সেদিকে না তাকিয়ে আমি জোর করে নিশ্বাস বন্ধ করে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা যে আমার দিকেই আসছে—আর আমার সামনেই এসে দাঁড়ালো যে!

জানালার বাইরে শহরের দৃশ্যটা ঢেকে দিয়ে একটা অন্ধকার কী যেন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

তারপর সেই অন্ধকার জিনিসটা নিচু হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল।

এইবার তার মুখটা আমার মুখের সামনে, আর সেই মুখে একটা—মুখোশ!

আমি যেই চীৎকার করতে যাবো অমনি অন্ধকারে শরীরটার একটা হাত উঠে গিয়ে মুখোশটা খুলতেই দেখি—ফেলুদা!

'কি রে—ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?'

'ওঃ—ফেলুদা—তুমি?'

'তা আমি না তো কে? তুই কি ভেবেছিলি...?'

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝে একটা অট্টহাস্য করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর খাটের পাশটায় বসে বলল, 'রাজেনবাবুর মুখোশগুলো সবক'টা পরে দেখছিলাম। তুই এইটে একবার পর তো।'

ফেলুদা আমাকে মুখোশটা পরিয়ে দিল।

'অস্বাভাবিক কিছু লাগছে কি?'

'কই না তো। আমার পক্ষে একটু বড়, এই যা।'

'আর কিচ্ছু না? ভালো করে ভেবে দেখ তো।'

'একটু...একটু যেন...গন্ধ।'

'কিসের গন্ধ?'

'চুরুট।'

ফেলুদা মুখোশটা খুলে নিয়ে বলল, 'এগজ্যাক্টলি।'

আমার বুকের ভিতরটা আবার ঢিপ ঢিপ করছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তি-তিনকড়িবাবু?'

ফেলুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সুযোগের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ছিল এঁরই। বাংলা উপন্যাস, খবরের কাগজ, ব্লেড, আঠা কোনটারই অভাব নেই। আর তুই লক্ষ্য করেছিলি নিশ্চয়ই—স্টেশনে আজ যেন একটু খোঁড়াচ্ছিলেন। সেটা বোধহয় কাল জানালার বাইরে লাফিয়ে পড়ার দরুন। কিন্তু আসল যেটা রহস্য, সেটা হল—কারণটা কী? রাজেনবাবুকে তো মনে হয় রীতিমত সমীহ করতেন ভদ্রলোক। তাহলে কী কারণে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই চিঠি লিখেছিলেন? এটার উত্তর বোধ হয় আর জানা যাবে না...কোনদিনও না।'

রাত্রে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

সকালে খাবার ঘরে বসে রাজেনবাবুর সঙ্গে চা খাচ্ছি, এমন সময় নেপালি চাকরটা একটা চিঠি নিয়ে এল। আবার সেই নীল কাগজ—আর খামের উপর দার্জিলিং পোস্ট মার্ক।

রাজেনবাবু ফ্যাকাশে মুখ করে কাঁপতে কাঁপতে চিঠির ভাঁজ খুলে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'তুমিই পড়। আমার সাহস হচ্ছে না।'

ফেলুদা চিঠিটা নিয়ে জোরে জোরে পড়ল। তাতে লেখা আছে—

'প্রিয় রাজু, কলকাতায় জ্ঞানেশের কাছ থেকে তোমার ঘরের খবর পেয়ে যখন তোমায় চিঠি লিখি তখনও জানতাম না আসলে তুমি কে। তোমার বাড়িতে এসে তোমার ছেলেবয়সের ছবিখানা দেখেই চিনেছি তুমি সেই পঞ্চাশ বছর আগের বাঁকুড়া মিশনারি স্কুলের আমারই সহপাঠী রাজু!

এতকাল পরেও যে পুরোন আক্রোশ চাগিয়ে উঠতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না। অন্যায় ভাবে ল্যাং মেরে তুমি যে শুধু আমায় হাণ্ড্রেড ইয়ার্ডস-এর নিশ্চিত পুরস্কার ও রেকর্ড থেকে বঞ্চিত করেছিলে তা নয়—আমাকে রীতিমত জখমও করেছিলে। বাবা বদলি হলেন তখনই, তাই তোমার সঙ্গে বোঝাপড়াও হয়নি, আর তুমিও আমার মন আর শরীরের কষ্টের কথা জানতে পারনি। তিনমাস পায়ে প্লাস্টার লাগিয়ে হাসপাতালে পড়ে ছিলাম।

এখানে এসে তোমার জীবনের শান্তিময় পরিপূর্ণতার ছবি আমাকে অশান্ত করেছিল। তাই তোমার মনে খানিকটা সাময়িক উদ্বেগের সঞ্চার করে তোমার সেই প্রাচীন অপরাধের শাস্তি দিলাম। শুভেচ্ছা নিও। ইতি—তিনু (শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়)'

সত্যজিৎ রায়

কৈলাস চৌধুরীর পাথর

'কার্ডটা কিরকম হয়েছে দ্যাখ তো।'

ফেলুদা ওর মানিব্যাগের ভিতর থেকে সড়াৎ করে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে আমায় দেখতে দিল। দেখি তাতে ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে Prodosh C. Mitter, Private Investigator । বুঝতে পারলাম ফেলুদা এবার তার গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা বেশ ফলাও করে জাহির করছে। আর তা করবে নাই বা কেন। বাদশাহী আংটির শয়তানকে ফেলুদা যে-ভাবে সায়েস্তা করেছিল, সে কথা ও ইচ্ছে করলে সকলকে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতে পারত। তার বদলে ও শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়েছে—এইতো!

ফেলুদার নাম আপনা থেকেই বেশ রটে গিয়েছিল। আমি জানি ও এর মধ্যে দু'তিনটে রহস্যের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরির অফার পেয়েছে, কিন্তু কোনটাই ওর মনের মত হয়নি বলে না করে দিয়েছে।

কার্ডটা ব্যাগের মধ্যে পুরে রেখে পা দুটো টেবিলের উপর তুলে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'বড়দিনের ছুটিতে কিছুটা মাথা খাটানোর প্রয়োজন হবে বলে মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'নতুন কোন রহস্য বুঝি?'

ফেলুদার কথাটা শুনে ভীষণ এক্সাইটেড লাগছিল—কিন্তু বাইরে সেটা একদম দেখালাম না।

ফেলুদা তার প্যাণ্টের পাশের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বার করে তার থেকে খানিকটা মাদ্রাজী সুপুরি নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'তোর খুব উত্তেজিত লাগছে বলে মনে হচ্ছে?'

সে কী, ফেলুদা বুঝল কী করে?

ফেলুদা নিজেই আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল। 'কী করে বুঝলাম ভাবছিস? মানুষ তার মনের ভাব যতই গোপন করার চেষ্টা করুক না কেন, তার বাইরের ছোটখাটো হাবভাব থেকেই সেটা ধরা পড়ে যায়। কথাটা যখন তোকে বললাম, ঠিক সেই সময়টা তোর একটা হাই আসছিল। কিন্তু কথাটা শুনে মুখটা খানিকটা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। তুই যদি আমার কথায় উত্তেজিত না হতিস, তাহলে কিন্তু যথারীতি হাইটা তুলতিস—মাঝপথে

থেমে যেতিস না।'

ফেলুদার এই ব্যাপারগুলো সত্যিই আমাকে অবাক করে দিত। ও বলত, 'পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা না থাকলে ডিটেক্‌টিভ হবার কোন মানে হয় না। এ ব্যাপারে যা খাঁটি কথা বলার সবই শার্লক হোম্‌স বলে গেছেন। আমাদের কাজ শুধু তাঁকে ফলো করা।'

আমি বললাম, 'কী কাজে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে বললে না?'

ফেলুদা বলল, 'কৈলাস চৌধুরীর নাম শুনেছিস? শ্যামপুকুরের কৈলাস চৌধুরী?'

আমি বললাম, 'না, শুনিনি। কত বিখ্যাত লোক আছে কলকাতা শহরে—তার ক'জনের নামই বা আমি শুনেছি। আর আমার তো সবেমাত্র পনের বছর বয়স।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এরা রাজসাহীতে বড় জমিদার ছিল। কলকাতায় বাড়ি ছিল; পাকিস্তান হবার পর এখানে চলে আসে। কৈলাসবাবুর পেশা হচ্ছে ওকালতি। তাছাড়া শিকারী হিসেবে নামডাক আছে। দুখানা শিকারের বই লিখেছেন। এই কিছুদিন আগে জলদাপাড়া রিজার্ভ ফরেস্টে একটা হাতি পাগলা হয়ে গিয়ে উৎপাত আরম্ভ করেছিল—উনি গিয়ে সেটাকে মেরে এলেন। কাগজে নামটাম বেরিয়েছিল।'

'কিন্তু তোমার মাথা খাটাতে হচ্ছে কেন? ভদ্রলোকের জীবনে কোন রহস্য আছে নাকি?'

ফেলুদা জবাব না দিয়ে, তার কোটের বুক পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে আমাকে দিল।

'পড়ে দ্যাখ্‌।'

আমি চিঠির ভাঁজ খুলে পড়ে দেখলাম। তাতে এই লেখা ছিল—

'শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মিত্র সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতবাজার পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া আপনাকে এই পত্র দেওয়া স্থির করিলাম। আপনি উপরোক্ত ঠিকানায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাত করিলে বাধিত হইব। কারণ সাক্ষাতে বলিব। আমি এক্সপ্রেস ডেলিভারি যোগে এই পত্র পাঠাইতেছি, সুতরাং আগামীকল্য ইহা আপনার হস্তগত হইবে। আমি পরশু অর্থাৎ শনিবার, সকাল ১০টায় আপনার আগমন প্রত্যাশা করিব। ইতি।—ভবদীয় শ্রীকৈলাসচন্দ্র চৌধুরী।'

চিঠিটা পড়ামাত্র আমি বললাম, 'শনিবার সকাল দশটা মানে তো আজই, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই।'

ফেলুদা বলল, 'তোর দেখছি বেশ ইম্‌প্রুভমেণ্ট হয়েছে। তারিখ-

টারিখগুলো বেশ খেয়াল রাখছিস।'

আমার মনে এর মধ্যেই একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। বললাম, 'তোমাকেই যখন ডেকেছে, তখন কি আর সঙ্গে অন্য কেউ...'

ফেলুদা চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলল, 'তোর বয়সটা কম বলেই হয়ত তোকে সঙ্গে নেওয়া চলতে পারে। কারণ তোকে হয়ত মানুষ বলেই ধরবেন না ভদ্রলোক। কাজেই তোর সামনে কথাবার্তা বলতে আপত্তি করবেন না। যদি করেন, তাহলে তুই না হয় পাশের ঘরে-টরে কোথাও অপেক্ষা করিস, সেই ফাঁকে আমরা কথা সেরে নেবো।'

আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ শুরু হয়ে গিয়েছে। ছুটিটা কি করব কি করব ভাবছিলাম। এখন মনে হচ্ছে হয়ত দারুণ ইণ্টারেস্টিং ভাবেই কেটে যাবে।

দশটা বাজতে পাঁচ মিনিটে আমরা ট্রামে করে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট আর শ্যামপুকুর স্ট্রীটের মোড়ে পেঁছলাম। পথে একবার ট্রাম থেকে নেমে ফেলুদা দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি থেকে কৈলাস চৌধুরীর লেখা একটা শিকারের বই কিনেছিল, সেটার নাম 'শিকারের নেশা'। বাকি পথটা বইটা উল্টেপাল্টে দেখল। ট্রাম থেকে নামার সময় সেটা কাঁধে ঝোলানো থলির মধ্যে রেখে বলল, 'এমন সাহসী লোকের কেন ডিটেকটিভের দরকার পড়েছে কে জানে।'

একান্ন নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রীট, একটা মস্ত পুরোন আমলের ফটক-ওয়ালা বাড়ি—যাকে বলে অট্টালিকা। সামনের দিকের বাগান, ফোয়ারা, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি পেরিয়ে বাড়ির দরজায় কলিং বেল টেপার আধ মিনিটের মধ্যেই ভিতর থেকে পায়ের আওয়াজ পেলাম। দরজা খুলতে দেখি একজন ভদ্রলোক, যাকে দেখে কেন জানি মনে হল, তিনি কখনই কৈলাসবাবু ন'ন, কারণ বাঘ মারা মানুষের এমন গোবেচারা চেহারা হতেই পারে না। মাঝারি সাইজের মোটা-সোটা ফর্সা ভদ্রলোক—বয়স ত্রিশের বেশি বলে মনে হয় না। চোখের চাহনিতে কেমন জানি একটা সরল, ছেলেমানুষী ভাব। লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোকের হাতে একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস রয়েছে।

'কাকে চান আপনারা?' গলার আওয়াজ দেখলাম মানানসই রকমের মিহি ও নরম।

ফেলুদা একটা কার্ড বার করে ভদ্রলোককে দিয়ে বলল, 'কৈলাসবাবুর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। উনি চিঠি দিয়েছিলেন।'

ভদ্রলোক কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আসুন ভিতরে।'

দরজা দিয়ে ঢুকে একটা সিঁড়ি পেরিয়ে ভদ্রলোক একটা আপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন।

'আপনারা একটু বসুন—আমি মামাবাবুকে খবর দিচ্ছি।'

বহুদিনের পুরোন একটা কালো টেবিলের সামনে দুটো পুরোন হাতল-ওয়ালা চেয়ারে আমরা বসলাম। ঘরের তিনদিকে আলমারি বোঝাই পুরোন বই। সামনের টেবিলের উপর নজর যেতে একটা মজার জিনিস দেখলাম। তিনখানা মোটা স্ট্যাম্প অ্যালবাম একটার উপর আরেকটা স্তূপ করে রাখা রয়েছে, আর আরেকটা অ্যালবাম খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, যাতে সারি সারি স্ট্যাম্প যত্ন করে আটকানো রয়েছে। কয়েকটা সেলোফেনের মধ্যে কিছু আলগা স্ট্যাম্পও রয়েছে, আর তাছাড়া রয়েছে স্ট্যাম্প কালেক্টারদের অত্যন্ত দরকারী ও আমার খুব চেনা কয়েকটা জিনিস—যেমন, হিঞ্জ, চিমটে, স্ট্যাম্পের ক্যাটালগ ইত্যাদি। এখন বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকের হাতের ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসটাও এই কাজেই ব্যবহার হয়, আর তিনিই এই সব স্ট্যাম্পের কালেক্‌টর।

ফেলুদাও ওই সবের দিকেই দেখছিল, কিন্তু ও নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু কথা হবার আগেই ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, 'আপনারা বৈঠকখানায় এসে বসুন, মামা এক্ষুনি আসছেন।'

মাথার উপর বিরাট ঝাড়লণ্ঠনওয়ালা বৈঠকখানায় গিয়ে আমরা দুজনে সাদা খোলস দিয়ে ঢাকা একটা প্রকাণ্ড সোফার উপর বসলাম। ঘরের চারি-দিকে পুরোন বড়লোকী ছাপ। একবার বাবার সঙ্গে বেলেঘাটার মল্লিকদের বাড়িতে ঠিক এইরকমই সব আসবাব, পেন্টিং, মূর্তি আর ফুলদানির ছড়াছড়ি দেখেছিলাম। এছাড়া রয়েছে মেঝের উপর একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছাল, আর দেয়ালে চারটে হরিণ, দুটো চিতাবাঘ আর একটা মহিষের মাথা।

প্রায় দশ মিনিট বসে থাকার পর একজন মাঝবয়সী কিন্তু বেশ জোয়ান গোছের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁর রং ফরসা, নাকের তলায় সরু গোঁফ আর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন।

আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। ভদ্রলোক আমাকে দেখে যেন ভুরুটা একটু কপালে তুললেন। ফেলুদা বলল, 'এটি আমার খুড়তুতো ভাই।'

ভদ্রলোক আমাদের পাশের সোফাতে বসে বললেন, 'আপনারা কি দুজনে একসঙ্গে ডিটেকটিভগিরি করেন?'

ফেলুদা হেসে বলল, 'আজ্ঞে না। তবে ঘটনাচক্রে আমার সব ক'টা কেসের সঙ্গেই তপেশ জড়িত ছিল। ও কোন অসুবিধা করেনি কখনো।'

'বেশ।...অবনীশ, তুমি যেতে পারো। এদের জন্যে একটু জলযোগের ব্যবস্থা দেখো।'

স্ট্যাম্প-জমানো ভদ্রলোকটি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি তাঁর

মামার আদেশ শুনে চলে গেলেন। কৈলাস চৌধুরী ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না—আমার চিঠিটা কি আপনি সঙ্গে এনেছেন?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আমিই যে প্রদোষ মিত্তির সেটার প্রমাণ চাইছেন তো? এই যে আপনার চিঠি?

ফেলুদা পকেট থেকে কৈলাসবাবুর চিঠিটা বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিল। উনি সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

'এ সব প্রিকশন নিতেই হয়, বুঝতেই পারছেন। যাই হোক্—শিকারী বলে আমার একটা নামডাক আছে জানেন বোধ হয়।'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ঘরের দেয়ালে জানোয়ারের মাথাগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'এগুলো সব আমারই শিকার। সতেরো বছর বয়সে বন্দুক চালাতে শিখি। তার আগে অবিশ্যি এয়ার গান দিয়ে পাখি-টাখি মেরেছি। সম্মুখ সমরে জানোয়ার কোনদিন আমার সঙ্গে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না। কিন্তু...যে শত্রু অদৃশ্য ও অজ্ঞাত—সে আমাকে বড় ভাবিয়ে তোলে।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। আমার বুকের ভিতরটায় আবার ঢিপ্ ঢিপ্ শুরু হয়েছে। জানি এক্ষুনি ভদ্রলোক রহস্যের কথাটা বলবেন, কিন্তু এত কায়দা করে আস্তে আস্তে আসল কথাটায় যাচ্ছেন যে তাতে যেন সাস্পেন্স আরো বেড়ে যায়।

কৈলাসবাবু আবার কথা শুরু করলেন।

'আপনার বয়স যে এত কম তা জানা ছিল না। কত হবে বলুন তো?'

ফেলুদা বলল, 'টুয়েণ্টি এইট।'

'কাজেই, যে কাজের ভার আপনাকে দিতে যাচ্ছি সেটা আপনার পক্ষে কতদূর সম্ভব তা জানি না। পুলিশকে আমি এ ব্যাপারে জড়াতে চাই না, কারণ এর আগে আরেকটা ব্যাপারে তাদের সাহায্য নিয়ে ঠকেছি। ওরা অনেক সময় কাজের চেয়ে অকাজটা করে বেশি, আর এটাও ঠিক যে আমি তরুণদের অশ্রদ্ধা করি না মোটেই। কাঁচা বয়সের সঙ্গে পাকা বুদ্ধির সমাবেশটা খুব জোরালো হয় বলেই আমার বিশ্বাস।'

এবারে কৈলাসবাবুর থামার সুযোগ নিয়ে ফেলুদা গলা খাঁক্‌রিয়ে বলল, 'ঘটনাটা কি সেটা যদি বলেন...।'

কৈলাসবাবু এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো এটা পড়ে কি বোঝেন।'

ফেলুদা কাগজটা খুলে ধরতে আমি পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে সেটায়

চোখ বুলিয়ে নিলাম। তাতে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার মানে হয় এই—'পাপের বোঝা বাড়িও না। যে জিনিসে তোমার অধিকার নেই, সে-জিনিস তুমি আগামী সোমবার বিকাল চারটার মধ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটের বিশ হাত ভিতর দিকে, রাস্তার বাঁ ধারে লিলি ফুলের প্রথম সারির প্রথম গাছটার নিচে রেখে আসবে। আদেশ অমান্য করার, বা পুলিশ-গোয়েন্দার সাহায্য নেওয়ার ফল ভালো হবে না—তোমার অনেক শিকারের মতোই তুমিও শিকারে পরিণত হবে একথা জেনে রেখো।'

'কী মনে হয়?' গম্ভীর গলায় কৈলাসবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা দেখে বলল, 'হাতের লেখা ভাঁড়ানো হয়েছে, কারণ একই অক্ষর দু'তিন জায়গায় দু'তিন রকম ভাবে লেখা হয়েছে। আর, নতুন প্যাডের প্রথম কাগজে লেখা।'

'সেটা কী করে বুঝলেন?'

'প্যাডের কাগজে লেখা হলে তার পরের কাগজে সে লেখার কিছুটা ছাপ থেকেই যায়। এ কাগজ একেবারে মসৃণ।'

'ভেরি গুড। আর কিছু?'

'আর কিছু এ থেকে বলা অসম্ভব। এ চিঠি ডাকে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। পোস্টমার্ক পার্ক স্ট্রীট। তিনদিন আগে এ চিঠি পেয়েছি। আজ শনিবার ২০শে।'

ফেলুদা চিঠিটা ফেরত দিয়ে বলল, 'এবার আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কারণ আপনার শিকারের কাহিনী ছাড়া আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই আমার।'

'বেশ তো। করুন না। মিষ্টি মুখে পুরে খেতে খেতে করুন।'

চাকর রুপোর প্লেটে রসগোল্লা আর অমৃতি রেখে গেছে। ফেলুদাকে খাবার কথা বলতে হয় না। সে টপ্ করে একটা আস্ত রসগোল্লা মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'চিঠিতে যে জিনিসটার কথা লেখা হয়েছে সেটা কি জানতে পারি?'

কৈলাসবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা কি জানেন—যাতে আমার অধিকার নেই, এমন কোন জিনিস আমার কাছে আছে বলে আমার জানা নেই। এ বাড়িতে যা কিছু আছে তা সবই হয় আমার নিজের কেনা, না হয় পৈতৃক সম্পত্তি। আর তার মধ্যে এমন কোন জিনিস নেই যেটা আদায় করার জন্য কেউ আমাকে এমন চিঠি দিতে পারে। তবে একটিমাত্র জিনিস আছে যেটা বলতে পারেন মূল্যবান ও লোভনীয়।'

'সেটা কী?'

'একটা পাথর।'

'পাথর?'

'প্রেশাস স্টোন।'

'আপনার কেনা?'

'না, কেনা নয়।'

'পৈতৃক সম্পত্তি?'

'তাও না। পাথরটা পাই আমি মধ্যপ্রদেশে চাঁদার কাছে একটা জংগলে। একটা বাঘকে ধাওয়া করে আমরা তিন চার জন একটা জংগলে ঢুকেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেটাকে মারা হয়। কাছেই একটা বহু পুরোন ভাঙা পরিত্যক্ত মন্দিরে একটা দেবমূর্তির কপালে পাথরটা লাগানো ছিল। ওটার অস্তিত্ব বোধহয় আমাদের আগে কেউই জানত না।'

'ওটা কি আপনার চোখেই প্রথম পড়ে?'

'মন্দিরটা সকলেই দেখেছিল, তবে পাথরটা প্রথম আমিই দেখি।'

'সঙ্গে আর কে ছিল সেবার?'

'রাইট বলে এক মার্কিন ছোক্‌রা, কিশোরীলাল বলে এক পাঞ্জাবী, আর আমার ভাই কেদার।'

'আপনার ভাইও শিকার করেন?'

'করত। এখন করে কিনা জানি না। বছর চারেক হল ও বিদেশে।'

'বিদেশ মানে?'

'সুইজারল্যান্ড! ঘড়ির ব্যবসার ধান্দায়।'

'যখন পাথরটা পেলেন তখন ওটা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়নি?'

'না। তার কারণ ওটার যে এত দাম সেটা কলকাতায় এসে জহুরীকে দেখাবার পর জানতে পারি।'

'তারপর সে খবরটা আর কে জেনেছে?'

'খুব বেশি লোককে বলিনি। এমনিতে আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ নেই। দু'একজন উকীল বন্ধুকে বলেছি, কেদার জানত, আর বোধহয় আমার ভাগনে অবনীশ জানে।'

'পাথরটা বাড়িতেই আছে?'

'হ্যাঁ। আমার ঘরেই থাকে।'

'এত দামী জিনিস ব্যাঙ্কে রাখেন না যে?'

'একবার রেখেছিলাম। যেদিন রেখেছিলাম তার পরের দিনই একটা মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট হয়—প্রায় মরতে মরতে বেঁচে যাই। তারপর থেকে ধারণা হয় ওটা কাছে না রাখলে ব্যাড লাক্ আসবে, তাই ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে নিই।'

'হুঁ...।'

ফেলুদার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ওর ভ্রূকুটি দেখে বুঝলাম ও ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে। জল খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?'

'আমি, আমার ভাগ্নে অবনীশ, আর তিনটি পুরোন চাকর। আর আমার বাবাও আছেন, তবে তিনি একেবারে অথর্ব, জরাগ্রস্ত। একটি চাকর তার পিছনেই লেগে থাকে সারাক্ষণ।'

'অবনীশবাবু কী করেন?'

'বিশেষ কিছুই না। ওর নেশা ডাকটিকিট সংগ্রহ করা। বলছে একটা টিকিটের দোকান করবে।'

ফেলুদা একটু ভেবে মনে মনে কী জানি হিসাব করে বলল, 'আপনি কি চাইছেন আমি এই পত্রলেখকের অনুসন্ধান করি?'

কৈলাসবাবু যেন একটু জোর করেই হেসে বললেন, 'বুঝতেই তো পারছেন এই বয়সে এ ধরনের অশান্তি কি ভালো লাগে? আর শুধু যে চিঠি লিখছে তা নয়—কাল রাত্রে একটা টেলিফোনও করেছিল। ইংরিজিতে ওই একই কথা বলল। গলা শুনে চিনতে পারলাম না। কী বলল জানেন? বলল, নির্দিষ্ট জায়গায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জিনিসটা রেখে না এলে একেবারে আমার বাড়িতে এসে আমাকে ঘায়েল করে দিয়ে যাবে। অথচ এ পাথর হাতছাড়া করতে আমি মোটেই রাজী নই। তা ছাড়া লোকটার যখন কোন ন্যায্য দাবী নেই, অথচ হুমকী দিচ্ছে—তখন বুঝতে হবে সে বদমাইস, সুতরাং তার শাস্তি হওয়া দরকার। সেটা কি করে সম্ভব সেটাই আপনি একটু ভেবে দেখুন।'

'উপায় তো একটাই। বাইশ তারিখে সন্ধ্যাবেলা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকা। তাকে তো আসতেই হবে।'

'সে নিজে নাও আসতে পারে।'

'তাতে ক্ষতি নেই। যে-ই এসে লিলি গাছের পাশে ঘুরঘুর করুক না কেন, সে যদি আসল লোক নাও হয়, তাকে ধরতে পারলে আসল লোকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হবে না।'

'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না। লোকটা ডেন্‌জারাস্‌ হতে পারে। সে যখন দেখবে লিলি গাছের তলায় পাথরটা নেই, তখন যে কী করতে পারে তা বলা যায় না। তার চেয়ে বাইশ তারিখের আগে—অর্থাৎ আজ আর কালের মধ্যে—এই লোকটি কে তা যদি জানা সম্ভব হত তাহলে খুবই ভালো হত। এই চিঠি, আর ওই একটা টেলিফোন কল—এই দুটো থেকে কিছু বার করা যায় না?'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। ও বলল, 'দেখুন

কৈলাসবাবু, চিঠিতে সে লিখেছে যে, গোয়েন্দার সাহায্য নিলে ফল ভালো হবে না—সুতরাং আমি কিছু করি বা না করি, আপনি যে আমাকে ডেকেছেন, এতেই আপনার বিপদের একটা আশঙ্কা আছে। সুতরাং আপনি বরঞ্চ ভেবে দেখুন যে আমাদের সাহায্য চান কিনা।'

কৈলাসবাবু ঠান্ডার মধ্যেও রুমাল দিয়ে তাঁর কপাল মুছে বললেন, 'আপনি, এবং আপনার সঙ্গে আপনার ভাইটি—এ দুজনকে দেখলে কেউ মনে করবে না যে আপনাদের সঙ্গে গোয়েন্দার কোন সম্পর্ক আছে। এটা একটা অ্যাডভানটেজ। আপনার নাম লোকে জেনে থাকলেও, আপনার চেহারা জানে কি? মনে তো হয় না। সুতরাং সেদিকে আমার বিশেষ ভয় নেই। আপনি রাজী হলে কাজটা নিন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি দেবো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। তবে যাবার আগে একবার পাথরটা দেখে যেতে চাই।'

'নিশ্চয়ই।'

কৈলাসবাবুর পাথর ওঁর শোবার ঘরে আলমারির ভিতর থাকে। আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন একটা শানবাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় পৌঁছলাম। সিঁড়িটা গিয়ে পড়েছে একটা লম্বা, অন্ধকার বারান্দায়। তার দুদিকে সারি দিয়ে প্রায় দশ বারোটা ঘর, তার অনেকগুলো আবার তালা বন্ধ। চারিদিকে একটা থম্‌থমে ভাব, আর লোকজন নেই বলেই বোধ হয় সামান্য একটু আওয়াজ হলেই তার প্রতিধ্বনি হয়।

বারান্দার শেষ মাথায় ডানদিকের ঘর হল কৈলাসবাবুর শোবার ঘর। আমরা যখন বারান্দার মাঝামাঝি এসেছি, তখন দেখি পাশের একটা ঘরের দরজা অর্ধেক খোলা, আর তার ভিতর দিয়ে একজন ভীষণ বুড়ো লোক গলা বাড়িয়ে ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে দেখছে। আমার তো দেখেই কিরকম ভয় ভয় করতে লাগল। কৈলাসবাবু বললেন, 'উনিই আমার বাবা। মাথার ঠিক নেই। সব সময়েই এখান দিয়ে ওখান দিয়ে উঁকি মারেন।'

কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন বুড়োর চাহনি দেখে সত্যিই আমার রক্ত জল হয়ে গেল। আর সেই ভয়াবহ চাহনি দিয়ে উনি তাকিয়ে রয়েছেন কৈলাসবাবুর দিকে।

বাবার ঘর পেরিয়ে কিছুদূর গেলে পর কৈলাসবাবু বললেন, 'বাবার সকলের উপরেই আক্রোশ। ওঁর ধারণা সকলেই ওঁকে নেগ্‌লেক্ট করে। আসলে কিন্তু ওঁর দেখাশোনার কোন ত্রুটি হয় না।'

কৈলাসবাবুর ঘরে দেখলাম প্রকাণ্ড উঁচু খাট, আর তার মাথার দিকে ঘরের কোণায় আলমারি। সেটা খুলে তার দেরাজ থেকে একটা নীল ভেলভেটের বাক্স বার করে বললেন, 'সাতরামদাসের দোকান থেকে এই বাক্সটা কিনে নিয়েছিলুম এই পাথরটা রাখার জন্য।'

বাক্সটা খুলে নীল আর সবুজ রং মেশানো লিচুর সাইজের একটা ঝলমলে পাথর বার করে কৈলাসবাবু ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন—

'একে বলে ব্লু বেরিল। ব্রেজিল দেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যে খুব বেশি আছে তা নয়। অন্তত এত বড় সাইজের বেশি নেই সে-বিষয় আমি নিঃসন্দেহ।'

ফেলুদা পাথরটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক নাড়িয়ে দেখে ফেরত দিয়ে দিল। এবার কৈলাসবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বার করলেন। তারপর তার থেকে পাঁচটা দশটাকার নোট বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইটে আগাম। কাজটা ভালোয় ভালোয় উতরে গেলে বাকিটা দেবো, কেমন?'

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফেলুদা নোটগুলো পকেটে পুরে নিল। চোখের সামনে ওকে রোজগার করতে এই প্রথম দেখলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, 'আপনার ওই চিঠিখানা আমাকে দিতে হবে, আর অবনীশবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলব।'

নিচে যখন পৌঁছলাম, ঠিক সেই সময় বৈঠকখানা থেকে টেলিফোন বাজতে আরম্ভ করেছে। কৈলাসবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরলেন।

'হ্যালো।'

তারপর আর কোন কথা নেই। আমরা বৈঠকখানায় ঢুকতেই কৈলাসবাবু ফ্যাকাশে মুখ করে ধপ্ করে টেলিফোনটা রেখে দিয়ে বললেন, 'আবার সেই লোক, সেই হুম্‌কি।'

'কি বলল?'

'এবার আর কোন সন্দেহ রাখেনি।'

'তার মানে?'

'বলল—কোন জিনিসটা চাইছি বুঝতে পারছ বোধহয়। চাঁদার জঙ্গলের মন্দিরে যেটা ছিল সেইটে।'

'আর কী বলল?'

'আর কিছু না।'

'গলা চিনলেন?'

'না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে গলাটা শুনতে ভালো লাগে না। আপনি বরং আরেকবার ভেবে দেখুন।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আমার ভাবা হয়ে গিয়েছে।'

কৈলাসবাবুর কাছ থেকে অবনীশবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি ম্যাগনি-ফাইং গ্লাস দিয়ে টেবিলের উপর রাখা কি একটা জিনিস খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করছেন। আমরা ঢুকতেই টেবিলের উপর হাতটা চাপা দিয়ে উঠে

দাঁড়ালেন।

'আসুন, আসুন!'

ফেলুদা বলল, 'আপনার ডাকটিকিটের খুব শখ দেখছি।'

অবনীশবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই আমার একমাত্র নেশা। বলতে গেলে আমার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা।'

'আপনি কি কোনো দেশ নিয়ে স্পেশালাইজ করেন, না সারা পৃথিবীর টিকিট জমান?'

'আগে সারা পৃথিবীই জমাতুম, কিন্তু কিছুদিন হল ইণ্ডিয়াতে স্পেশালাইজ করছি। আমাদের এই বাড়ির দপ্তরে যে কি আশ্চর্য সব পুরোন টিকিট রয়েছে তা বলতে পারি না। অবিশ্যি বেশির ভাগই ইণ্ডিয়ার। গত দু'মাস ধরে হাজার হাজার পুরোন চিঠির গাদা ঘেঁটে টিকিট সংগ্রহ করছি।'

'ভালো কিছু পেয়েছেন?'

'ভালো? ভালো?' ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আপনাকে বললে বুঝবেন? আপনার এ ব্যাপারে ইণ্টারেস্ট আছে?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'একটা বয়সে তো সকলেই ওদিকটায় ঝোঁকে—তাই নয় কি? কেপ-অফ্-গুড-হোপের এক পেনি, মরিশাসের দু পেনি আর বৃটিশ গায়ানার ১৮৫৬ সনের সেই বিখ্যাত স্ট্যাম্পগুলো পাবার স্বপ্ন আমিও দেখেছি। বছর দশেক আগে লাখ খানেক টাকা দাম ছিল ওগুলোর। এখন আরো বেড়েছে।'

অবনীশবাবু উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

'তাহলে মশাই আপনি বুঝবেন। আপনাকে দেখাই। এই দেখুন!'

ভদ্রলোক তার চাপা হাতের তলা থেকে একটা ছোট্ট রঙীন কাগজ ফেলুদাকে দিলেন। দেখি খাম থেকে খোলা রঙ প্রায় মিলিয়ে যাওয়া একটা টিকিট।

'কী দেখলেন?' অবনীশবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'শ'খানেক বছরের পুরোন ভারতবর্ষের টিকিট। ভিক্টোরিয়ার ছবি। এ টিকিট আগে দেখেছি।'

'দেখেছেন তো? এবার এই গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেখুন।'

ফেলুদা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস চোখে লাগাল।

'এবার কী দেখছেন?' ভদ্রলোকের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'এতে তো ছাপার ভুল রয়েছে।'

'এগ্‌জ্যাক্টলি!'

'POSTAGE কথাটার G এর জায়গায় C ছাপা হয়েছে।'

অবনীশবাবু টিকিট ফেরত নিয়ে বললেন, 'তার ফলে এটার দাম কত হচ্ছে

জানেন?'

'কত?'

'বিশ হাজার টাকা।'

'বলেন কী?'

'আমি বিলেত থেকে চিঠি লিখে খোঁজ নিয়েছি। এই ভুলটার উল্লেখ স্ট্যাম্প ক্যাটালগে নেই। আমিই প্রথম এটার অস্তিত্ব আবিষ্কার করলাম।'

ফেলুদা বলল, 'কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স। কিন্তু আপনার সঙ্গে টিকিট ছাড়াও অন্য ব্যাপারে একটু আলোচনা ছিল।'

'বলুন।'

'আপনার মামা—কৈলাসবাবু—তাঁর যে একটা দামী পাথর আছে সেটা আপনি জানেন?'

অবনীশবাবুকে যেন কয়েক সেকেন্ড ভাবতে হল। তারপর বললেন, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। শুনেছিলাম বটে। দামী কিনা জানি না—তবে 'লাকি' পাথর সেটা একবার বলেছিলেন বটে। কিছু মনে করবেন না। আমার মাথায় এখন ডাক-টিকিট ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।'

'আপনি এ বাড়িতে কদ্দিন আছেন?'

'বাবা মারা যাবার পর থেকেই। প্রায় পাঁচ বছর।'

'মামার সঙ্গে আপনার গোলমাল নেই তো?'

'কোন মামা? এক মামা তো বিদেশে।'

'আমি কৈলাসবাবুর কথা বলছি।'

'ও। ইনি অত্যন্ত ভালো লোক, তবে...'

'তবে কী?'

অবনীশবাবু ভুরু কুঁচকোলেন।

'ক'দিন থেকে—কোনো একটা কারণে—ওঁকে যেন একটু অন্যরকম দেখছি।'

'কবে থেকে?'

'এই দু-তিন দিন হল। কাল ওঁকে আমার এই স্ট্যাম্পটার কথা বললাম—উনি যেন শুনেও শুনলেন না। অথচ এমনিতে রীতিমত ইণ্টারেস্ট নেন। আর তাছাড়া, ওঁর কতগুলো অভ্যেস কিরকম যেন বদলে যাচ্ছে।'

'উদাহরণ দিতে পারেন?'

'এই যেমন, এমনিতে রোজ সকালে উঠে বাগানে পায়চারি করেন, গত দুদিন করেননি। ঘুম থেকে উঠেইছেন দেরীতে। বোধহয় রাত জাগছেন বেশি।'

'সেটার কোন ইঙ্গিত পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তো একতলায় শুই। আমার ঠিক উপরের ঘরটাই মামার।

পায়চারি করার শব্দ পেয়েছি মাঝ রাত্রে। গলার স্বরও পেয়েছি। বেশ জোরে। মনে হল ঝগড়া করছেন।'

'কার সঙ্গে?'

'বোধহয় দাদু। দাদু ছাড়া আর কে হবেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করারও শব্দ পেয়েছি। একদিন তো সন্দেহ করে সিঁড়ির নিচটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম মামা ছাত থেকে দোতলায় নামলেন, হাতে বন্দুক।'

'তখন ক'টা।'

'রাত দুটো হবে।'

'ছাতে কী আছে?'

'কিছুই নেই। কেবল একটা ঘর আছে—চিলেকোঠা যাকে বলে। পুরোন চিঠিপত্র কিছু ছিল ওটায়, সেসব আমি মাস খানেক হল বের করে এনেছি।'

ফেলুদা উঠে পড়ল। বুঝলাম তার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।

অবনীশবাবু বললেন, 'এসব কেন জিজ্ঞেস করলেন বলুন তো।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আপনার মামা কোনো কারণে একটু উদ্বিগ্ন আছেন। তবে সে নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনি স্ট্যাম্প নিয়েই থাকুন। এদিকের ঝামেলা মিটলে একদিন এসে আপনার কালেকশন দেখব'খন।'

কৈলাসবাবুর সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে ফেলুদা বলল, 'আপনাকে ষোল আনা ভরসা দিতে পারছি না, তবু এটুকু বলছি যে আপনার ভাবনাটা আমায় ভাবতে দিন। রাত্রে ঘুমোতে চেষ্টা করুন, দরকার হলে ওষুধ খেয়ে। আর ছাতে যাবেন না দয়া করে। এ পাড়ার বাড়িগুলো যেরকম ঘেঁষাঘেঁষি, আপনার শত্রু পাশের কোনো বাড়িতে এসে আস্তানা গেড়ে থাকলে বিপদ হতে পারে।'

কৈলাসবাবু বললেন, 'ছাতে গিয়েছিলাম বটে, তবে সঙ্গে বন্দুক ছিল। একটা আওয়াজ পেয়েই গিয়েছিলাম, যদিও গিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি।'

'বন্দুকটা সব সময়ই কাছে রাখেন তো?'

'তা রাখি। তবে মানুষের মনের উদ্বেগ অনেক সময় তার হাতের আঙুলে সঞ্চারিত হয় সেটা জানেন তো? বেশিদিন এইভাবে চললে আমার টিপের কি হবে জানি না।'

* * *

পরের দিন ছিল রবিবার। সারা দিনের মধ্যে বেশির ভাগটা সময় ফেলুদা ওর ঘরে পায়চারি করেছে। বিকেল চারটে নাগাত ওকে পায়জামা ছেড়ে প্যাণ্ট পরতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বেরোচ্ছ?'

ফেলুদা বলল, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লিলি গাছগুলো একবার দেখে আসব ভাবছি। যাবি তো চ।'

ট্রামে করে গিয়ে লোয়ার সারকুলার রোডের মোড়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে পাঁচটা নাগাত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটটায় পৌঁছলাম। এদিকটায় লোকজন একটু কম আসে। বিশেষ করে সন্ধের দিকটায় যা লোক আসে সবই সামনের দিকে—মানে, উত্তরে—গড়ের মাঠের দিকে।

গেট দিয়ে ঢুকে বিশ হাত আন্দাজ করে এগিয়ে গিয়ে দেখি বাঁ দিকে সত্যিই লিলি গাছের কেয়ারি। তার প্রথম সারির প্রথম গাছটার নিচেই পাথরটা রাখার কথা।

লিলি গাছের মত এত সুন্দর জিনিস দেখেও গাটা কেমন জানি ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। ফেলুদা বলল, 'কাকার একটা বাইনোকুলার ছিল না—যেটা সেবার দার্জিলিং নিয়ে গেছিলেন?'

আমি বললাম, 'আছে।'

মিনিট পনের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঘুরে আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গেলাম লাইটহাউসের সামনে। ফেলুদার কি সিনেমা দেখার শখ হল নাকি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিনেমায় না ঢুকে ও গেল উল্টোদিকের একটা বইয়ের দোকানে। এ বই সে বই ঘেঁটে ফেলুদা দেখি একটা বিরাট মোটা স্ট্যাম্প ক্যাটালগ নিয়ে তার পাতা উল্টোতে আরম্ভ করল। আমি পাশ থেকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম, 'তুমি কি অবনীশবাবুকে সন্দেহ করছ নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'এত যার স্ট্যাম্পের শখ, তার কিছুটা কাঁচা টাকা হাতে পেলে সুবিধে হয় বই কি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা যখন দোতলা থেকে একতলায় এলাম, তখন যে টেলিফোনটা এল, সেটা তো আর অবনীশবাবু করেন নি।'

'না। সেটা করেছিল মস্‌লন্দপুরের আদিত্যনারায়ণ সিংহ।'

বুঝলাম ফেলুদা এখন ঠাট্টার মেজাজে রয়েছে, ওর সঙ্গে আপাতত আর এ-বিষয় কথা বলা চলবে না।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন আটটা বেজে গেছে। ফেলুদা কোটটা খুলে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'আমি যতক্ষণ হাতমুখ ধুচ্ছি, তুই ডিরেক্টরি থেকে কৈলাসবাবুর টেলিফোন নাম্বারটা বার কর তো।'

ডিরেক্টরি হাতে নিয়ে টেলিফোনের সামনে বসা মাত্র ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠে আমায় বেশ চমকে দিল। আমাকেই ধরতে হয়। তুলে নিলাম রিসীভারটা।

'হ্যালো।'

'কে কথা বলছেন?'

এ কি অদ্ভুত গলা! এ গলা তো চিনি না! বললাম, 'কাকে চাই?'

কর্কশ গম্ভীর গলায় উত্তর এল, 'ছেলেমানুষ বয়সে গোয়েন্দার সঙ্গে ঘোরাফেরা করা হয় কেন? প্রাণের ভয় নেই?'

আমি ফেলুদার নাম ধরে ডাকতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার আগে শুনতে পেলাম লোকটা বলল, 'সাবধান করে দিচ্ছি—তোমাকেও, তোমার দাদাকেও। ফল ভালো হবে না!'

আমি কাঠ হয়ে চেয়ারে বসে রইলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, 'ও কি—ওরকম থুম মেরে বসে আছিস কেন? কার ফোন এসেছিল?'

কোনমতে ঘটনাটা ফেলুদাকে বললাম। দেখলাম ও-ও গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, 'ঘাবড়াস না। লোক থাকবে—পুলিশের লোক। বিপদের কোন ভয় নেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একবার যেতেই হবে কালকে।'

রাত্রে ভালো ঘুম হল না। শুধু যে টেলিফোনটার জন্য তা নয়; কৈলাস-বাবুর বাড়ির ভিতরের অনেক কিছুই বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সেই লোহার রেলিং দেওয়া ছাদ পর্যন্ত উঠে যাওয়া সিঁড়ি, দোতলার মার্বেল-বাঁধানো অন্ধকার লম্বা বারান্দা, আর তার দরজার ফাঁক দিয়ে বার করা কৈলাসবাবুর বাবার মুখ। কৈলাসবাবুর দিকে ওরকম ভাবে চেয়েছিলেন কেন তিনি? আর কৈলাসবাবু বন্দুক হাতে ছাতে গিয়েছিলেন কেন? কিসের শব্দ পেয়েছিলেন উনি?

ঘুমোতে যাবার আগে ফেলুদা একটা কথা বলেছিল—'জানিস, তোপসে—যারা চিঠি লিখে আর টেলিফোন করে হুম্‌কি দেয়—তারা বেশির ভাগ সময়ই আসলে কাওয়ার্ড হয়।' এই কথাটার জন্যই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ঘুমটা এসে গেল।

*　　　*　　　*

পরদিন সকালে ফেলুদা কৈলাসবাবুকে ফোন করে বলল তিনি যেন নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে থাকেন; যা করবার ফেলুদাই করবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন যাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে?'

ফেলুদা বলল, 'কাল যে সময় গিয়েছিলাম, সেই সময়। ভালো কথা, তোর স্কুলের ড্রইং-এর খাতা পেনসিল-টেনসিল আছে তো?'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম।

'কেন, তা দিয়ে কি হবে?'

'আছে কিনা বল না।'

'তা তো থাকতে হবেই।'

'সঙ্গে নিয়ে নিবি। লিলি গাছের উল্টো দিকে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে তুই ছবি আঁকবি—গাছপালা মেমোরিয়াল বিল্ডিং—যা হয় একটা কিছু। আমি হব তোর মাস্টার।'

ফেলুদার আঁকার হাত রীতিমত ভালো। বিশেষ করে, মাত্র একবার যে-মানুষকে দেখেছে, পেনসিল দিয়ে খস্‌খস্‌ করে মোটামুটি তার একটা পোর্ট্রেট আঁকার আশ্চর্য ক্ষমতা ফেলুদার আছে। কাজেই ড্রইংমাস্টারের কাজটা তার পক্ষে বেমানান হবে না।

শীতকালের দিন ছোট হয়, তাই আমরা চারটের কিছু আগেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে পেঁছে গেলাম। সোমবার ভীড়টা আরো কম। তিনটে পেরাম-বুলেটারে সাহেবের বাচ্চাদের নিয়ে নেপালী আয়ারা ঘোরাফেরা করছে; একটা পরিবারকে দেখে মাড়োয়ারি বলে মনে হল; আর তাছাড়া দু'একজন বুড়ো ভদ্রলোক। এদিকটায় আর বিশেষ কেউ নেই। কম্পাউণ্ডের মধ্যেই, কিন্তু গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে চৌরঙ্গীর দিকটায় একটা বড় গাছের তলায় দুজন প্যাণ্টপরা লোককে দেখলাম, যাদের দিকে দেখিয়ে ফেলুদা আস্তে করে আমায় কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিল। বুঝলাম ওরাই হচ্ছে পুলিশের লোক। ওদের কাছে নিশ্চয়ই লুকোন রিভলভার আছে। ফেলুদার সঙ্গে পুলিশের কিছু লোকের বেশ খাতির আছে এটা জানতাম।

লিলি ফুলের সারির উল্টো দিকে কিছুটা দূরে খাতা পেনসিল বার করে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিলাম। এ অবস্থায় কি আঁকায় মন বসে? চোখ আর মন দুটোই অন্য দিকে চলে যায়, আর ফেলুদা মাঝে মাঝে এসে ধমক দেয়, আর পেনসিল দিয়ে খস্‌খস্‌ করে হিজিবিজি এঁকে দেয়—যেন কতই না কারেক্ট করছে! আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেই ফেলুদা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে এদিক ওদিক দেখে।

সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। কাছেই গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। লোকজন কমে আসছে, কারণ একটু পরেই বেশ ঠাণ্ডা পড়বে। মারোয়াড়িরা একটা বিরাট গাড়িতে উঠে চলে গেল। আয়াগুলোও পেরামবুলেটার ঠেলতে ঠেলতে রওনা দিল। লোয়ার সারকুলার রোড দিয়ে আপিস ফেরতা গাড়ির ভীড় আরম্ভ হয়েছে, ঘন ঘন হর্নের শব্দ কানে আসছে। ফেলুদা আমার পাশে এসে ঘাসের উপর বসতে গিয়েও বসল না। দেখলাম তার চোখ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের দিকে। আমি সেইদিকে চেয়ে গেটের বেশ কিছুটা বাইরে রাস্তার ধারে একজন ব্রাউন চাদর জড়ানো লোক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। ফেলুদা চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে কিছুক্ষণ ওই দিকে দেখে বাইনোকুলারটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'দ্যাখ্‌।'

'ওই চাদর গায়ে দেওয়া লোকটাকে?'

'হুঁ।'

বাইনোকুলার চোখে লাগাতেই লোকটা যেন দশ হাতের মধ্যে চলে এল, আর আমিও চমকে উঠে বললাম, 'একি—এ যে কৈলাসবাবু নিজে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!'

'হ্যাঁ। চল—নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে এসেছেন।'

কিন্তু আমরা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম ভদ্রলোক হাঁটতে আরম্ভ করলেন। গেটের বাইরে এসে কৈলাসবাবুকে আর দেখা গেল না।

ফেলুদা বলল, 'চল শ্যামপুকুর। ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের দেখতে পাননি, আর না দেখে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।'

ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সিই নিতাম, কিন্তু আপিস টাইমে সেটা সম্ভব নয়, তাই ট্রাম ধরার মতলবে চৌরঙ্গীর দিকে রওনা দিলাম। রাস্তা দিয়ে পর পর লাইন করে গাড়ি চলেছে। হঠাৎ ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে এসে এমন একটা কান্ড হয়ে গেল যেটা ভাবলে এখনো আমার ঘাম ছুটে যায়। কথা নেই বার্তা নেই, ফেলুদা হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান মেরে প্রায় আমাকে ছুঁড়ে রাস্তার একেবারে কিনারে ফেলে দিল। আর সেই সঙ্গে নিজেও একটা লাফ দিল। পরমুহূর্তে, দারুণ স্পীডে আর দারুণ শব্দ করে একটা গাড়ি আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল।

'হোয়াট দ্য ডেভিল!' ফেলুদা বলে উঠল। 'গাড়ির নম্বরটা...'

কিন্তু সেটার আর কোন উপায় নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্য গাড়ির ভীড়ের মধ্যে সে গাড়ি মিলিয়ে গেছে। আমার হাতের খাতা পেনসিল কোথায় ছিটকে পড়েছে তার ঠিক নেই, তাই সেটা খুঁজে আর সময় নষ্ট করলাম না। এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ফেলুদা ঠিক সময় বুঝতে না পারলে আমরা দুজনেই নির্ঘাত গাড়ির চাকার তলায় চলে যেতাম।

ট্রামে ফেলুদা সারা রাস্তা ভীষণ গম্ভীর মুখ করে রইল। কৈলাসবাবুর বাড়িতে পেঁছে সোজা বৈঠকখানায় গিয়ে সোফায় বসা কৈলাসবাবুকে ফেলুদা প্রথম কথা বলল, 'আপনি দেখতে পেলেন না আমাদের?'

ভদ্রলোক কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, 'কোথায় দেখতে পেলাম না? কী বলছেন আপনি?'

'কেন, আপনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাননি?'

'আমি? সে কী কথা! আমি তো এতক্ষণ শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে ভাবনায় ছটফট করছিলুম—এই সবে মাত্র নীচে এসেছি।'

'তাহলে কি আপনার কোন যমজ ভাই আছে নাকি?'

কৈলাসবাবু কিরকম যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'সে কি, আপনাকে সেদিন বলিনি?'

'কী বলেননি?'

'কেদারের কথা? কেদার যে আমার যমজ ভাই।'

ফেলুদা সোফার উপর বসে পড়ল। কৈলাসবাবুরও মুখটা যেন কেমন শুকিয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি কেদারকে দেখেছেন? সে ওখানে ছিল?'

'উনি ছাড়া আর কেউ হতেই পারেন না।'

'সর্বনাশ!'

'কেন বলুন তো? কেদারবাবুর কি ওই পাথরটার উপর কোন অধিকার ছিল?'

কৈলাসবাবু হঠাৎ কেমন যেন নেতিয়ে পড়লেন। সোফার হাতলে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা ছিল...তা ছিল। কেদারই প্রথম পাথরটা দেখে। আমি মন্দিরটা দেখি, কিন্তু দেবমূর্তির কপালে পাথর কেদারই প্রথম দেখে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী। একরকম আবদার করেই পাথরটা আমি নিই। অবিশ্যি মনে জানতুম ওটা আমার কাছে থাকলে থাকবে, কেদার নিলে ওটা বেচে দেবে, দিয়ে টাকাটা নষ্ট করবে। আর ওটার যে এত দাম সেটা আমি জেনেও কেদারকে জানাইনি। সত্যি বলতে কি, কেদার যখন বিদেশে চলে গেল, তখন আমার মনে একটা নিশ্চিন্ত ভাব এল! কিন্তু ওখানে হয়ত ও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, তাই ফিরে এসেছে। হয়ত পাথরটাকে নিয়ে বিক্রী করে সেই টাকায় নতুন কিছু ব্যবসা ফাঁদবে।'

একটুক্ষণ চুপ থেকে ফেলুদা বলল, 'এখন উনি কী করতে পারেন সেটা বলতে পারেন?'

কৈলাসবাবু বললেন, 'জানি না। তবে আমার মুখোমুখি তো একবার তাকে আসতেই হবে। বাড়ি থেকে যখন বেরোই না, আর লিলি গাছের নিচে পাথর যখন রাখিনি, তখন সে আসবেই।'

'আপনি কি চান আমি এখানে থেকে একটা কোন ব্যবস্থা করি?'

'না। তার কোন প্রয়োজন হবে না। সে আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কিছু করবে বলে মনে হয় না। আর কথাই যদি বলতে আসে, তাহলে ভাবছি পাথরটা দিয়েই দেব। আপনার কর্তব্য এখানেই শেষ। আপনি যে লাইফ রিস্‌ক করে আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়েছিলেন, তার জন্যে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। আপনি বিলটা পাঠিয়ে দেবেন, একটা চেক আমি দিয়ে দেবো।'

ফেলুদা বলল, 'লাইফ রিস্‌কই বটে। একটা গাড়ি তো পিছন থেকে এসে

প্রায় আমাদের শেষ করে দিয়েছিল!'

আমার কনুইটা খানিকটা ছড়ে গিয়েছিল, আমি সেটা এতক্ষণ হাত দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় ফেলুদা সেটা দেখে ফেলল।

'ওকি রে, তোর হাতে যে রক্ত!' তারপর কৈলাসবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন—আপনার এখানে একটু ডেটল বা আয়োডিন হবে কি? এই সব ঘাগুলো আবার বড্ড চট্ করে সেপ্‌টিক হয়ে যায়।'

কৈলাসবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ইস্—যা হয়েছে কলকাতার রাস্তাঘাট! দেখি, অবনীশকে জিজ্ঞেস করি।'

অবনীশবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে ডেটলের কথা জিজ্ঞেস করতেই উনি কেমন যেন একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি যে এই দিন সাতেক আগেই আনলে। সে কি এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল?'

কৈলাসবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ওহো, তাই তো! এই দ্যাখ-খেয়ালই নেই। আমার কি আর মাথার ঠিক আছে?'

ডেটল লাগিয়ে কৈলাসবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ফেলুদা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে ট্র্যামের দিকে না গিয়ে যাচ্ছে উল্টো দিকে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল, 'গণপতিদা'র কাছে একবার টেস্টম্যাচের টিকিটের কথাটা বলে যাই। এত কাছেই যখন এসেছি...'

কৈলাসবাবুর দুটো বাড়ি পরেই গণপতি চ্যাটার্জি'র বাড়ি। আমি ওর নাম শুনেছি ফেলুদার কাছে, কিন্তু দেখিনি কখনো। রাস্তার উপরেই সামনের ঘর, টোকা মারতেই গেঞ্জীর উপর পুলোভার পরা একজন নাদুসনুদুস ভদ্রলোক দরজা খুলল।

'আরে, ফেলু মাস্টার যে—কী খবর?'

'একটা খবর তো বুঝতেই পারছেন।'

'তা তো বুঝছি, তবে সশরীরে তাগাদা না দিতে এলেও চলত। তোমার রিকোয়েস্ট কি ভুলি? যখন বলিচি দোবো তখন দোবোই।'

'আসার কারণ অবিশ্যি আরেকটা আছে। তোমার বাড়ির ছাত থেকে শুনিচি উত্তর কলকাতার একটা খুব ভালো ভিউ পাওয়া যায়। একটা ফিল্ম কোম্পানির জন্য সেইটে একবার দেখতে চাইছিলাম।'

'স্বচ্ছন্দে! সটান সিঁড়ি দিয়ে চলে যাও। আমি এদিকে চায়ের আয়োজন করছি।'

চারতলার ছাতে উঠে পুব দিকে চাইতেই দেখি—কৈলাসবাবুদের বাড়ি। একতলার বাগান থেকে ছাত অবধি দেখা যাচ্ছে। দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে—আর তার ভিতরে একজন লোক খুট্‌খুট্ করে এদিক ওদিক ঘুরে

বেড়াচ্ছে। খালি চোখেই বুঝতে পারলাম সেটা কৈলাসবাবুর বাবা। ছাতের উপর ওই যে চিলেকোঠা—তার জানালার দিকের দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। দরজাটা বোধহয় উল্টো দিকে।

দোতলার একটা বাতি জ্বলে উঠল। বুঝলাম সেটা সিঁড়ির বাতি। ফেলুদা বাইনোকুলার চোখে লাগাল। একজন লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কে? কৈলাস-বাবু। এতদূর থেকেও তার লাল সিল্কের ড্রেসিং গাউনটা দেখেই বোঝা যায়। কয়েক সেকেন্ডের জন্য কৈলাসবাবুকে দেখা গেল না। তারপর হঠাৎ দেখি উনি ছাতে উঠে এসেছেন। আমরা দুজনেই চট্ করে একসঙ্গে নিচু হয়ে শুধু চোখদুটো পাঁচিলের উপর দিয়ে বার করে রাখলাম।

কৈলাসবাবু এদিক ওদিক দেখে চিলেকোঠার উল্টোদিকে চলে গেলেন। তারপর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। কৈলাসবাবুকে জানালায় দেখা গেল। উনি আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বুকের ভিতরে ভীষণ জোরে ঢিপ্ ঢিপ্ আরম্ভ হয়ে গেছে। কৈলাসবাবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাটিতে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর কৈলাসবাবু আবার ঘরের বাতি নিভিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে চলে গেলেন।

ফেলুদা শুধু বলল, 'গোলমাল, গোলমাল।'

ফেলুদার এরকম অবস্থায় আমি ওকে বিশেষ কিছু বলতে সাহস পাই না। অন্য সময় মাথায় চিন্তা থাকলে ও পায়চারি করে, কিন্তু আজ দেখলাম ও সটান বিছানায় শুয়ে সীলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে। রাত সাড়ে নটায় দেখলাম ও নোট বইয়ে কী যেন হিজিবিজি লিখছে। ও আবার এসব লেখা ইংরিজি ভাষায় কিন্তু গ্রীক অক্ষরে লেখে, আর সে অক্ষর আমার জানা নেই। এইটুকুই শুধু বুঝতে পারছিলাম যে, কৈলাসবাবুর বারণ সত্ত্বেও ও এই পাথরের ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমোতে রাত হয়েছিল বলেই বোধহয় সকালে নিজে থেকে ঘুমটা ভাঙেনি—ভাঙল ফেলুদার ঠেলাতে।

'এই তোপ্‌সে—ওঠ্ ওঠ্—শ্যামপুকুর যেতে হবে।'

'কিসের জন্য?'

'ফোন করেছিলাম। কেউ ধরছে না। গণ্ডগোল মনে হচ্ছে।'

দশ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিতে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম শ্যামপুকুরের দিকে। গাড়িতে ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল, 'কী সাংঘাতিক লোক রে বাবা! আরেকটু আগে বুঝতে পারলে বোধহয় গণ্ডগোলটা হতো না।'

কৈলাসবাবুর বাড়িতে পেঁছে ফেলুদা বেল-টেল না টিপেই ভেতরে চলে গেল। অবিশ্যি দরজাটা যে খোলাই ছিল সেটাও আমাদের ভাগ্য। সিঁড়ি পেরিয়ে অবনীশবাবুর ঘরের সামনে পেঁছতেই চক্ষুস্থির! টেবিলের সামনে একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে, আর তার ঠিক পাশেই মেঝেতে হাত দুটো পিছনে জড়ো করে বাঁধা আর মুখে রুমাল বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন অবনীশবাবু। ফেলুদা হুম্ড়ি দিয়ে পড়ে আধ মিনিটের মধ্যে দড়ি রুমাল খুলে দিতেই ভদ্রলোক বললেন, 'উঃ—থ্যাঙ্ক গড!'

ফেলুদা বলল, 'কে করেছে এই দশা আপনার?'

ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসে বললেন, 'মামা! কৈলাসমামা! মামার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—সেদিন বলছিলাম না আপনাকে? ভোরে এসে বসেছি ঘরে—বাতি জ্বালিয়ে কাজ করছিলাম। মামা ঘরে ঢুকেই আগে বাতি নিভিয়েছেন। তারপর মাথায় একটা বাড়ি। তারপর আর কিচ্ছু জানি না। কিছুক্ষণ হল জ্ঞান ফিরেছে—কিন্তু নড়তে পারি না, মুখে শব্দ করতে পারি না—উঃ!'

'আর কৈলাসবাবু?' ফেলুদা প্রায় চীৎকার করে উঠল।

'জানি না!'

ফেলুদা এক লাফে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও ছুটলাম তার পিছনে।

একবার বৈঠকখানায় ঢুকে কাউকে না দেখে, তিন ধাপ সিঁড়ি এক এক লাফে উঠে দোতলায় পেঁছে ফেলুদা সটান কৈলাসবাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। খাটের চেহারা দেখে মনে হল সেখানে লোক শুয়েছিল, কিন্তু ঘর এখন খালি। আলমারির দরজা দেখি হাঁ করে খোলা। ফেলুদা দৌড়ে গিয়ে দেরাজ খুলে যে জিনিসটা বার করল সেটা মখমলের সেই নীল বাক্স। খুলে দেখা গেল ভিতরে সেই পাথর যেমন ছিল তেমনিই আছে।

এতক্ষণে দেখি অবনীশবাবু এসে হাজির হয়েছেন, তার মুখের অবস্থা শোচনীয়। তাকে দেখেই ফেলুদা বলল, 'ছাতের ঘরের চাবি কার কাছে?'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, 'সে-সে-সেতো মামার কাছে।'

'তবে চলুন ছাতে'—বলে ফেলুদা তাকে হিড়হিড় করে টেনে বার করে নিয়ে গেল।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তিনজনে ছাতে উঠে দেখি—চিলেকোঠার দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ। এইবারে দেখলাম ফেলুদার গায়ের জোর। দরজা থেকে তিন হাত পিছিয়ে কাঁধটা আগিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে চার বার ধাক্কা দিতেই কড়াগুলো পেরেক সুদ্ধ উপড়ে বেরিয়ে এসে দরজাটা ঝটাং করে খুলে গেল।

ভিতরে অন্ধকার। তিনজনেই ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ক্রমে চোখটা সয়ে আসতে দেখলাম—এক কোণে অবনীশবাবুরই মত দড়ি বাঁধা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন—ইনি কি? কৈলাস চৌধুরী, না কেদার চৌধুরী?

দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে কোলপাঁজা করে নিয়ে ফেলুদা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নেমে কৈলাসবাবুর ঘরে নিয়ে বিছানার উপর শোয়াল। ভদ্রলোক তখন ফেলুদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আপনিই কি...?'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমারই নাম প্রদোষ মিত্তির। চিঠিটা বোধ হয় আপনিই আমাকে লিখেছিলেন—কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয় নি।...অবনীশবাবু, এঁর জন্য একটু গরম দুধের ব্যবস্থা দেখুন তো।'

আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আছি। ইনিই তাহলে কৈলাস চৌধুরী! ভদ্রলোক বালিশের উপর ভর দিয়ে খানিকটা সোজা হয়ে বসে বললেন, 'শরীরে জোর ছিল, তাই টিকে আছি। অন্য কেউ হলে...এই চার দিনে...।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি বেশি স্ট্রেন করবেন না।'

কৈলাসবাবু বললেন, 'কিছু কথা তো বলতেই হবে—নইলে ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হবে না। আপনার সঙ্গে আর সাক্ষাত হবে কী করে—যেদিন চিঠি দিলুম আপনাকে, সেইদিনই তো ও আমাকে বন্দী করে ফেলল। তাও চায়ের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে—নইলে গায়ের জোরে পারত না।'

'আর সেদিন থেকেই উনি কৈলাস চৌধুরী সেজে বসেছিলেন?'

কৈলাসবাবু দুঃখের ভাব করে মাথা নেড়ে বললেন, 'দোষটা আমারই, জানেন। বানিয়ে বানিয়ে বড়াই করাটা বোধহয় আমাদের রক্তে একেবারে মিশে আছে। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা পাথর কিনেছিলুম জব্বলপুরের বাজার থেকে। কী দুর্মতি হল, ফিরে এসে চাঁদার জঙ্গলের এক দেবমন্দিরের গল্প ফেঁদে কেদারকে তাক লাগিয়ে দিলুম। সেই থেকেই ওর ওইটের উপর লোভ। আমার ভাগ্যটা ও সহ্য করতে পারেনি। অনেক কিছুই সহ্য করতে পারেনি। বোধহয় ভাবত—দুজনে যমজ ভাই—চোখে দেখে কোন তফাত করা যায় না, অথচ আমার গুণ, আমার রোজগার, আমার ভাগ্য—এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে এত তফাত হবে কেন? ও নিজে ছিল বেপরোয়া রেক্‌লেস। একবার তো নোট জাল করার কেসে পড়েছিল। আমিই কোন রকমে ওকে বাঁচাই। বিলেত গেল আমারই কাছ থেকে টাকা ধার করে। ভাবলুম আপদ গেল। এই সাতদিন আগে—গত মঙ্গলবার—বাড়ি ফিরে দেখি পাথরটা নেই। তার কথা মনেই হয়নি। চাকর-দের উপর চোটপাট করলুম—কোন ফল হল না। বিষ্যুদবার সকালে আপনাকে

চিঠি দিলাম। সেইদিনই রাত্রে ও এল। বাজারে যাচাই করে জেনেছে ও পাথরের কোন দাম নেই, অথচ ও দেখেছিল লাখ টাকার স্বপ্ন। ক্ষেপে একেবারে লাল। টাকার দরকার—অন্ততঃ বিশ হাজার। চাইল—রিফিউজ করলুম। তাতে ও আমাকে অজ্ঞান করে বন্দী করল। বলল যতদিন না টাকা দিই তদ্দিন ছাড়বে না—আর সে ক'দিন ও কৈলাস চৌধুরী সেজে বসে থাকবে—কেবল আদালতে যাবে না—অসুখ বলে ছুটি নেবে।'

ফেলুদা বলল, 'আমি যখন আপনার চিঠি পেয়ে এসে পড়লাম, তখন ভদ্রলোক একটু মুশকিলে পড়েছিলেন, তাই আমাদের দশ মিনিট বসিয়ে রেখে একটা হুমকি চিঠি, আর একজন কাল্পনিক শত্রু খাড়া করলেন। এইটে না করলে আমাদের সন্দেহ হত। অথচ আমি থাকলেও বিপদ—তাই আবার টেলিফোনে হুমকি দিয়ে আর গাড়ি চাপা দিয়ে আমাদের হটাতেও চেষ্টা করলেন!'

কৈলাস ভ্রূকুটি করে বললেন, 'কিন্তু, আমি ভাবছি, কেদার এ ভাবে হঠাৎ আমাকে রেহাই দিয়ে চলে গেল কেন। আমি তো কাল রাত অবধি ওকে টাকা দিতে রাজী হইনি। ও কি শুধু হাতেই চলে গেল?'

অবনীশবাবু যে কখন দুধ নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন তা লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ ভদ্রলোকের চীৎকার শুনে চমকে উঠলাম।

'খালি হাতে যাবেন কেন তিনি? আমার টিকিট—আমার মহামূল্য ভিক্টোরিয়ার টিকিট নিয়ে গেছেন তিনি!'

ফেলুদা অবনীশবাবুর দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, 'সেকি—সেটা গেছে নাকি?'

'গেছে বই কি! আমাকে শেষ করে দিয়ে গেছেন কেদার মামা।'

'কত দাম যেন বলেছিলেন টিকিটটার?'

'বিশ হাজার!'

'কিন্তু—' ফেলুদা অবনীশবাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ে গলাটা নামিয়ে বলল, 'ক্যাটালগে যে বলছে ওটার দাম পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়!'

অবনীশবাবুর মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার মধ্যেও তো চৌধুরী বংশের রক্ত রয়েছে—তাই না? আপনিও বোধহয় একটু রং চড়িয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন?'

ভদ্রলোক এবার একেবারে ছেলেমানুষের মত কাঁদো কাঁদো মুখ করে বললেন, 'কী করি বলুন! তিন বছর ধরে চার হাজার ধুলোমাখা চিঠি ঘেঁটেও যে একটা ভালো টিকিট পেলাম না! তাও তো মিথ্যে বলে লোককে অবাক করে কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায়।'

ফেলুদা হো হো করে হেসে উঠে অবনীশবাবুর পিঠ চাপড়ে বললেন,

'কুছ পরোয়া নেই। আপনার কেদার মামাকে আপনি যে টাইটটি দিলেন, সেটার কথা ভাবলেই দেখবেন প্রচুর আনন্দ পাবেন।...যাক্ গে, এবার দমদম এয়ার পোর্টে একটা টেলিফোন করে দেখি। কেদারবাবু পালাবেন আন্দাজ করে আজ সকালে এয়ার ইণ্ডিয়াতে ফোন করে জেনেছি আজই একটা বোম্বাই-এর প্লেনে ওঁর বুকিং আছে। পুলিশ থাকবে ওখানে, তাই পালাবার কোন রাস্তা নেই। ভাগ্যে তপেশের কনুই ছড়েছিল! ডেটলের ব্যাপারটাতেই আমার ওর উপর প্রথম সন্দেহ হয়।'

কেদার বাবুকে গ্রেপ্তার করতে কোন বেগ পেতে হয় নি, আর অবনীশবাবুও তার পঞ্চাশ টাকার টিকিটটা ফেরত পেয়েছিলেন। ফেলুদা যা টাকা পেল, তাই দিয়ে আমাদের তিনদিন রেস্টুর‍্যাণ্টে খাওয়া আর দুটো সিনেমা দেখার পরও ওর পকেটে বেশ কিছু বাকি রইল।

আজ বিকেলে বাড়িতে বসে চা খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'ফেলুদা, একটা জিনিস আমি ভেবে বের করেছি, সেটা ঠিক কিনা বলবে?'

'কী ভেবেছিস শুনি।'

'আমার মনে হয় কৈলাসবাবুর বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে কেদারবাবু কৈলাসবাবু সেজে বসে আছেন, আর সেই জন্যেই সেদিন ওর দিকে কটমট করে চাইছিলেন। বাবারা নিশ্চয়ই নিজেদের যমজ ছেলেদের মধ্যে তফাত ধরতে পারে—তাই না?'

'এক্ষেত্রে তা যদি নাও হয়, তাহলেও, তোর ভাবনাটা আমার ভাবনার সঙ্গে মিলে গেছে বলে আমি তোকে সম্মানিত করছি'—এই বলে ফেলুদা আমার প্লেট থেকে একটা জিলিপি তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

———